নিবেদিতা

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

"বসুমতী" সাহিত্য-মন্দির হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ;
"বসুমতী" মেসিন-যন্ত্র।
মুদ্রাকর—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রথম মুদ্রণ ;
১৩২৫,
১১ই মাঘ।

গ্রন্থকারের অন্যান্য উপন্যাস

১। পুনরাগমন * * *

সম্পূর্ণ নূতন ধরণের অলৌকিক উপন্যাস;
বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাস-জগতের নূতন সৃষ্টি।

মূল্য ১॥০ মাত্র।

* * * *

২। নারায়ণী * * *

বাঙ্গলার সেই যুগান্তরকারী উপন্যাস, সচিত্র।

তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য ২৲ মাত্র।

* * * * *

৩। গুহামুখে * * *

রোমাঞ্চকর ঘটনা-সমাকুল উপন্যাস।

শীঘ্রই বাহির হইবে।

"বসুমতী"-সাহিত্য-মন্দির - - - - - -
১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিবেদিতা

(১)

আমার বয়স যখন তিন বৎসর, তখন ছয়মাসের একটী স্তন্যপায়িনী বালিকার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। পিতামহীর মুখে আমি এ কথা শুনিয়াছিলাম। এবং আমার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, সেই সময়ে ভাবীশ্বশুরের গৃহ হইতে একটা বড় গোছের 'তত্ত্ব' আসাতে, সেই বয়সে বিবাহসম্বন্ধে যতটা বুঝিবার বুঝিয়া লইয়াছিলাম। 'তত্ত্বে'র মিষ্টান্নাদি উদরস্থ করিবার সময়ে, মিষ্টান্নের মধুরতার মধ্য দিয়া, আমার 'কনে'র অস্তিত্ব-মাধুর্য্যও যেন কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলাম।

আমার মনে আছে, একখানা চন্দ্রপুলি মুখে পূরিয়াই আমি পিতামহীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"ঠাকুরমা! কবে আমার কনের সঙ্গে বিয়ে হবে?" তখন চন্দ্রপুলিটার অধিকাংশ আমার মুখের ভিতরে ছিল! প্রশ্ন করিতে গিয়া আমি এমন 'বিষম' খাইয়াছিলাম যে, আমাকে সুস্থ করিতে পিতামহীর অনেকগুলা মৃদু চপেটাঘাত ও তীব্র ফুৎকার আমার মাথার উপরে পড়িয়াছিল। এই বিষম-খাওয়ার রহস্যও আমি পিতামহীর নিকটে

বিদিত হইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন,—"তুই যেমন "'কনে'কে স্মরণ করিতেছিস্. 'কনে'ও তেম্‌নি তোকে স্মরণ করিতেছে।"

পিতামহীর সমবয়সী এক প্রতিবেশিনী ঠানদিদিও সে সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও পূর্ব্বোক্ত ঘটনায়-যে সমস্ত মিষ্ট রহস্যে আমাকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন, একালে তাহা আর আপনাদের শুনাইবার উপায় নাই।

এইমাত্র বলিয়া রাখি, 'সম্বন্ধে'র বিষয় এই আমি সর্ব্বপ্রথমে জানিয়াছি। তিন বৎসর বয়সে কি হইয়াছিল, তাহার কিছুমাত্র আমার স্মরণে ছিল না। অথচ শুনিয়াছি এই 'সম্বন্ধ' ব্যাপার অনেকটা সমারোহের সহিতই নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

অষ্টমবর্ষ বয়সে আমার উপনয়ন হইল। নবম বৎসরে আমার বিবাহের আয়োজন সমস্ত ঠিক হইয়াছে, এমন সময় সহসা হৃদ্‌রোগে আমার পিতামহের মৃত্যু হইল। ঘটনা এতই আকস্মিক যে, তিনি মৃত্যুকালে কাহাকেও কিছু বলিবার অবকাশ পান নাই। পিতাও সে সময় গৃহে ছিলেন না। বি, এ পাসের পর একটা মাষ্টারি চাকুরী লইয়া তিনি কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন।

পিতার অবর্ত্তমানে পিতামহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আমাকেই করিতে হইয়াছিল।

শ্মশানে আমাদের প্রতিবেশী-আত্মীয় অনেকেই উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু আমি কেবল এক কমনীয়-কান্তি অপরিচিত ব্রাহ্মণের মধুর আপ্যায়নে ও আশ্বাসবাক্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আত্মীয়গণও পিতামহের মৃত্যুতে যথেষ্ট সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাহারও কথা সেই

ব্রাহ্মণের কথার মত মিষ্ট লাগে নাই। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার বোধ হইতেছিল, আমার পিতামহের মৃত্যুতে আমাদের অপেক্ষাও বুঝি তাঁহার শোক অধিক হইয়াছে।

(২)

কলিকাতার চৌদ্দ-পনেরো ক্রোশ দক্ষিণে, একটী মাঝারী গোছের গণ্ডগ্রাম—আমার জন্মভূমি। আমাদের গ্রাম হইতে কলিকাতা যাতায়াত এখন যতটা সুগম হইয়াছে, তখন সেরূপ ছিল না।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সোণারপুর পর্য্যন্ত রেল হইয়াছে। দেশের চতুর্দ্দিকেই জলাভূমি, মাঠের মধ্যে কোথাও সরু সরু খাল। এই সকলের মধ্য দিয়া 'শাল্‌তি'র সাহায্যে, আমরা তখন সোণারপুরে গিয়া রেল ধরিতাম। কলিকাতা পৌছিতে, প্রায় পূরা একদিন লাগিত।

পিতাকে সংবাদ দিতে এবং সংবাদ পাইয়া তাঁহার বাটীতে আসিতে সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়াছিল। যাই হ'ক, অবস্থাযোগ্য সমারোহের সহিত তিনি পিতামহের শ্রাদ্ধকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসকল হইতে বহুলোক নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছিল। কিন্তু সেই লোক-সমাগমমধ্যে আমি যাহাকে দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, সেই ব্রাহ্মণকে কেবল দেখিতে পাই নাই।

সমারোহের উল্লাসে দিনান্তে তাঁহার কথা ভুলিয়া গেলাম।—কতক উল্লাসের নেশায়, কতকটা পিতামহের অদর্শনে, অন্তরে অন্তরে অনুভূত অপরিস্ফুট বেদনায় বিবাহের কথাও বিস্মৃত হইলাম। পিতামহের আকস্মিক মৃত্যুতে পিতামহী এতই শোকার্ত্তা হইয়াছিলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণের জন্য

গমন লক্ষ্য করেন নাই। যখন তাঁহার কথা পিতামহীর মনে উদয় হইল, তখন পিতা আবার কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। সেইদিন, তাঁহারই মুখে, ব্রাহ্মণের পরিচয় পাইলাম। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে, আবার আমার মনে 'কনে' দেখিবার সাধ জাগিয়া উঠিল।

কিন্তু সাধ মিটিবার আর অবসর হইল না। পিতামহের আকস্মিক মৃত্যু ও সেই সঙ্গে পিতার আকস্মিক ডেপুটীগিরি পদপ্রাপ্তি—এই দুয়ে মিলিয়া আমার ও আমার ভাবীবধূর মিলনপথে বাধা হইয়া দাঁড়াইল।

পিতার কলিকাতা যাইবার তিনদিন পরে প্রাতঃকালে, বাহিরের চণ্ডী-মণ্ডপে আমি বৈকুণ্ঠ পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে বসিয়া স্কুলের পড়া পড়িতেছি এমন সময়ে, সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর ব্রাহ্মণ আমাদের বাড়ীতে আগমন করিলেন। পণ্ডিতমহাশয় পড়ান বন্ধ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং আমাকে বলিলেন—"শীঘ্র বাড়ীর ভিতর হইতে একখানা আসন লইয়া আইস। এবং তোমার ঠাকুরমাকে গিয়া বল যে, 'সাভ্যোম' মশায় আসিয়াছেন।"

আমি তাঁহাকে দেখিয়া, কি জানি কেন, যেন হতভম্ব হইয়া গেলাম। পণ্ডিতমহাশয়ের কথা আমার কাণে প্রবেশ করিয়াও করিল না!

আমি উঠিলাম না দেখিয়া, পণ্ডিতমহাশয় কিঞ্চিৎ কঠোরতার সহিত আমাকে বলিলেন, "আমার কথা কি শুনিতে পাইলে না? শীঘ্র তোমার পিতামহীকে সংবাদ দাও, আর একখানা আসন লইয়া আইস।"

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "থাক্; আর বালককে উৎপীড়িত করিবার প্রয়োজন নাই। আমি বসিব না। একস্থানে আমাকে যাইতে

হইবে। যাইবার পথে বলিয়া আমি একবার বালকের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।”

পণ্ডিতমহাশয় উত্তর করিতে যাইতেছেন, এমন সময় পিতামহী সেখানে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ব্রাহ্মণের আগমন, বোধ হয় তিনি দূর হইতে অগ্রেই দেখিতে পাইয়াছিলেন; কেননা, বাক্যের সম্বর্দ্ধনার সঙ্গে সঙ্গে, তিনি চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়াই একখানি আসন পাতিয়া দিলেন এবং ব্রাহ্মণকে তদুপরি বসিতে অনুরোধ করিলেন।

ব্রাহ্মণ, পিতামহীর অনুরোধ সত্ত্বেও, আসনে বসিতে চাহিলেন না। তিনি বলিলেন—“সেকি মা! তোমার দত্ত আসনে আমি বসিব!”

পিতামহী বলিলেন—“সেকি! আপনি সর্ব্বপূজ্য। আমার বংশের ভাগ্য, আপনার কন্যা আমার গৃহে আসিবে। আপনি নিঃসঙ্কোচে উপবেশন করুন।”

তথাপি ব্রাহ্মণ সে আসনে বসিলেন না। তখন সেই আসন, পূর্ব্বরক্ষিত স্থান হইতে উঠাইয়া, অন্যত্র রাখিবার জন্য পিতামহী কর্তৃক আমি আদিষ্ট হইলাম।

এইবারে আমি উঠিলাম এবং পিতামহীর ইচ্ছামত আসন স্থানান্তরিত করিলাম। ব্রাহ্মণ তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন।

ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট হইলে, পিতামহী আমাকে বলিলেন,—“হরিহর! তোমার শ্বশুরমহাশয়কে তুমি প্রণাম করিয়াছ ত?”

আমি আসনই ত্যাগ করি নাই, তা প্রণাম করিব! সুতরাং পিতামহীর প্রশ্নে আমি উত্তর দিলাম না।

পিতামহী আমার অবস্থা দেখিয়া সমস্ত বুঝিতে পারিলেন; এবং

তন্মুহূর্ত্তেই ব্রাহ্মণের চরণে প্রণত হইতে আমাকে আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন—"থাক, বালক—প্রণাম না করিল, তাহাতে দোষ কি?"

পিতামহী বলিলেন, "সেকি ঠাকুর, এই বয়স হইতে যদি সদাচরণ না শিখে, ত আর কবে শিখিবে! যদি গুরুজনের মর্য্যাদা রাখিতে না শিখিল, ত ব্রাহ্মণগৃহে জন্মিয়া লাভ কি হইল!"

পিতামহী, আমাকে প্রণাম করাইয়া, পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলেন—"বৈকুণ্ঠ! বালক না হয় ভুল করিয়াছে। তুমি বুড়ো মিন্‌সে, ছেলেকে পড়াইতেছ, তুমি কি বালককে এটা বলিয়া দিতে পার নাই?"

পিতা, পিতামহ উভয়েই বাড়ীতে থাকিতে পারিতেন না বলিয়া পিতামহ বাড়ীতে আমার জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী আমাদেরই গ্রামে—আমাদেরই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। যে স্কুলে আমি পড়ি, তিনি সেই স্কুলেই শিক্ষকতার কাজ করিতেন।

এক গ্রামে বাড়ী, তাহার উপর শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী—সবার উপর সে সময়ে গ্রামে স্কুলের পড়া পড়াইবার যোগ্য লোক ছিল না বলিয়া, পিতামহ বৈকুণ্ঠ পণ্ডিতকেই আমার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশের অসংখ্য বালক তাঁহার কাছে পড়িয়াছিল। পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই পণ্ডিতমহাশয়ের নির্ব্বুদ্ধিতা দেশমধ্যে প্রচার করিত। ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রার্থনা' নামক কবিতার প্রারম্ভেই লেখা আছে;—"না মাগি সুন্দরকায়, অর্থে মন নাহি ধায়, ভোগ সুখে চিত রত নহে।" কোনও সময়ে পণ্ডিতমহাশয় নাকি কবিতার অর্থ করিয়াছিলেন—"মাগী সুন্দর কায় নয়।" এই জন্য সময়ে সময়ে, বালকেরা তাঁহাকে 'নামাগি' পণ্ডিত বলিত। অবশ্য, পণ্ডিতমহাশয়ের বেত্র

পৃষ্ঠদেশে পতিত হইবার ভয়ে, কেহ তাঁহার সম্মুখে একথা বলিতে সাহস করিত না। বালকদের মধ্যে যা কিছু বলা-কওয়া তা তাঁহার অন্তরালেই হইত। পণ্ডিতমহাশয় কিন্তু নিজের এ সুখ্যাতির বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাঁহারই মুখে আমরা শুনিতাম, তদানীন্তন বাংলা ভাষায় রুচি-বিরুদ্ধ যতপ্রকার বাক্য আছে তাহাদের মধ্যে, তাঁর উপাধিব্যঞ্জক কথাটাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

পিতামহীর প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন—"বলি নাই? বার বার বলিয়াছি! তোমার নাতী আমার কথায় কাণ দিল না—যতই উঠিতে আদেশ করি, ততই বালক, যেন দমভারী হইয়া, আরও জোর করিয়া বসিয়া রহিল!"

ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়াই বলিলেন—"কই, বৈকুণ্ঠ তোমার মুখে ত একটিবারও সে কথা শুনি নাই! আমি এইজন্য তোমারই উপর বিরক্ত হইতেছিলাম। তোমরা বালককে গুরুজনের প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহা শিখাও নাই, বালকের অপরাধ কি?"

পণ্ডিতমহাশয় তথাপি বলিলেন, "আমি বলিয়াছি আপনি শুনিতে পান নাই।"

ব্রাহ্মণ একথায় আর কোনও উত্তর দিলেন না। একবার পণ্ডিত-মহাশয়ের মুখের পানে চাহিলেন—এই মাত্র। কিন্তু সেই দৃষ্টিই তাঁহার পক্ষে উত্তরের অপেক্ষা অধিক হইল। পিতামহী যে সময় ব্রাহ্মণের গৃহের কুশলাদির পরিচয় লইতে আরম্ভ করিলেন, সেই সময় তিনি অতি নিম্নস্বরে আমাকে পড়িতে আদেশ করিয়া, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পণ্ডিতমহাশয় চলিয়া গেলে, ব্রাহ্মণ বলিলেন—"সামান্য ক্রটীস্বীকারে যাহার মীমাংসা হইত, এমন কার্য্যেও সত্য বলিতে যাহার সাহস নাই,—এমন লোকের কাছে বালক কি শিক্ষা করিবে ?"

পিতামহী বলিলেন—"কি করি !—গ্রামে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। অথচ স্কুলের পড়া তইরি করিবার জন্য একজন লোকের প্রয়োজন। অঘোরনাথ ত বাড়ীতে থাকিতে পারে না।"

তখন পণ্ডিতসম্বন্ধে কথা পরিত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মণ আমার পিতৃসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। পিতামহীর মুখে যখন তিনি শুনিলেন,—শ্রাদ্ধান্তে পিতা কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি পিতামহীকে নমস্কার এবং আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। বলিলেন,—"অঘোরনাথ যখন ঘরে নাই, তখন আমার আগমনের প্রয়োজন সিদ্ধ হইল না।"

পিতামহী জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিবাহসম্বন্ধে কি জানিবার কিছু ইচ্ছা ছিল ?"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—"তাই। বিবাহের দিন স্থির করিবার একান্ত প্রয়োজন। শিরোমণি মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে আমার সমস্ত আয়োজন পণ্ড হইল। বুঝিতেই ত পারিতেছ, যজমানের গৃহে ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু পাইব, তাহাতেই যোগেযাগে আমাকে কন্যাটী পাত্রস্থা করিতে হইবে। দিনটা স্থির হইয়া গেলে, আমি আগে হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সংগ্রহ করিতে পারি।"

পিতামহী বলিলেন—"আমারও ইচ্ছা তাই। এ শুভকার্য্য যত শীঘ্র নিষ্পন্ন হয়, ততই উভয়পক্ষের মঙ্গল। নিষ্পন্ন হইয়া গেলে, আমিও নিশ্চিন্ত হই।"

এই বলিয়াই তিনি পিতামহের উল্লেখ করিয়া একবার চক্ষে অঞ্চল দিলেন। বলিলেন,—"তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল, পৌত্র-বধূর মুখদর্শন করেন। তাঁহার ভাগ্যে এ আনন্দ ভোগ হইল না বলিয়া, আমার দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। এখন আমি যাহাতে হরিহরের বউকে দুই চারিদিন নিজ হাতে খাওয়াইতে পারি, তাহার ব্যবস্থা করুন। কেন না আমার মনে হয়, আমি অধিক দিন বাঁচিব না। আর বাঁচিতেও আমার সাধ নাই। অঘোর-হরিহরকে রাখিয়া শীঘ্র শীঘ্র যাইতে পারিলেই আমার মঙ্গল।"

"বিবাহ দিতে পারিলে আমিও নিশ্চিন্ত হই। ব্রাহ্মণীরও একান্ত ইচ্ছা,—কন্যাকে যত শীঘ্র পারেন, গোত্রান্তরিতা করেন।"

"তা হইলে অঘোর আসুক। আসিলেই আপনাকে সংবাদ দিব। আপনারা উভয়ে মিলিয়া একটা দিন স্থির করিবেন। কিন্তু কালাশৌচের ভিতর কি বিবাহ হইতে পারে?"

"হইতেই হইবে। অঘোরনাথের কালাশৌচ, তাতে হরিহরের কি? ইহাতে তাহার ও তাহার পিতার সত্যরক্ষা হইবে।"

"বাধা না থাকিলেই ত আমি নিশ্চিন্ত হই। আমি জানি না বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি বিজ্ঞ পণ্ডিত—আপনি যখন 'হইবে' বলিতেছেন, তখন না হইবে কেন? তাহ'লে আপনি কিয়ৎক্ষণের জন্য অপেক্ষা করুন, আমি পাঁজি লইয়া আসিতেছি। আপনি—এমাসে আর হইবে না—আগামী মাসে একটা দিন স্থির করুন। অঘোর আসিলেই তাহাকে বলিব এবং আপনাকে সংবাদ পাঠাইব।"

পিতামহী ও ব্রাহ্মণের কথোপকথন আমি তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলাম।

বিবাহের কথা শুনিয়া নবমবর্ষীয় বালক সে সময় হৃদয়ে কি আনন্দ অনুভব করিয়াছিল, তাহা এই বৃদ্ধের "আমি"র পক্ষে অনুমানে আনা একেবারেই অসম্ভব। তবে আনন্দের যে অবধি ছিল না, এটা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। কেন না, পাঁজি আনিবার কথা শুনিয়াই, আমি বলিয়া উঠিলাম— "আমি ছুটিয়া পাঁজি লইয়া আসিতেছি।".

আমার কথা শুনিয়া পিতামহী হাস্যসংবরণ করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণেরও গম্ভীর মুখে হাসি আসিল।

পিতামহী বলিলেন—"দেখিতেছেন, আপনার জামাতারই আর বধূর অদর্শন সহ্য হইতেছে না!"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"বিবাহ যে কি বস্তু,তাহা ত বালকের বোধ নাই!— কাজেই উহার লজ্জা-সঙ্কোচও কিছু নাই।"

পড়া ছাড়িয়া উঠিলে মায়ের কাছে তিরস্কৃত হইব, এই ভয় দেখাইয়া পিতামহী পাঁজি আনিতে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন। মায়ের নামের সঙ্গে সঙ্গে, আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। আমি তাড়াতাড়ি মাদুরে বসিয়া, আবার পড়িতে আরম্ভ করিলাম। ব্রাহ্মণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি পড় ?"

আমি তখন মধ্য-ইংরাজী তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছি। কি কি পুস্তক পাঠ করি, তাঁহাকে বলিলাম। পাঠ্যপুস্তকের নাম শুনিয়া তিনি যে প্রশ্ন করিলেন, তাহাতে বুঝিলাম, স্কুলের কার্য্যকলাপসম্বন্ধে ব্রাহ্মণের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ একেবারে গণ্ডমূর্খ।

ব্রাহ্মণ ও আমার মধ্যে যে সকল প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল, তাহার মধ্যে যতগুলা আমার স্মরণ আছে, আমি বলিতেছি।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইংরাজী পুস্তকখানার নাম কি?

প্যারীচরণ সরকারের সেকেণ্ড বুক্ শেষ করিয়া ডগ্‌লাস্ রীডার তৃতীয় ভাগ তখন সবেমাত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। আমি পুস্তকের নাম বলিলাম।

"নামের মানে কি?"

"নামের আবার মানে কি?"

"সেকি? পুস্তকের নাম থাকিলে, সে নামের একটা অর্থ থাকিবে না?"

স্কুলে আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছেলের মধ্যে গণ্য। সুতরাং ভাবীশ্বশুরের কাছে পরাভবটা আমার তেমন মনোমত হইল না। আমি কথার অর্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; বলিলাম—"ডগ্' মানে কুকুর, আর 'লাস্' মানে বালিকা, 'রীডার্' মানে পাঠক।"—এক সঙ্গে মানে হইল কি? "কুকুর-বালিকা-পাঠক—নম্বর তিন।"

আমার মানে করা শুনিয়াই শ্বশুরঠাকুরের চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল। তিনি কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দ জড়বৎ বসিয়া রহিলেন। তারপর, একটী দীর্ঘ-শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"হুঁ! পুস্তকের ভিতর আছে কি?"

"ঈগল পক্ষীর গল্প আছে।"

"ঈগল পক্ষী!—সে আবার কি রকম?"

"সে এক প্রকাণ্ড পক্ষী—পণ্ডিতমহাশয় বলেন, সে ছাগল-ভেড়া ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া যায়।"

এই বলিয়াই, আমি বই খুলিয়া ঈগল পক্ষীর ছবি ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া দিলাম। একটা ঈগল পক্ষী মেষশিশু নখে বিঁধিয়া আকাশে উড়িতেছে; পুস্তকে তাহারই চিত্র অঙ্কিত ছিল।

ব্রাহ্মণ ছবিটীকে দেখিলেন—বেশ করিয়া দেখিলেন। একটী শ্যামল তৃণক্ষেত্র—তৃণক্ষেত্রের একস্থানে দলবদ্ধ মেষ ও মেষশিশু; পার্শ্বে যষ্টিহস্তে, ঊর্দ্ধমুখে, ঈগলের প্রতি চাহিয়া, বিলাতী এক মেষপালক। দূরে নীলবর্ণ পাহাড়; সেই পাহাড়ের শৃঙ্গে ঈগলের বাসা। ঈগল, মেষশিশু পায়ে ধরিয়া, বিশাল পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া, সেই পাহাড়ের দিকে চলিয়াছে।

ব্রাহ্মণ নিবিষ্টচিত্তে সেই ছবি দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন,—"এ পক্ষী কোন্ দেশে থাকে?"

"এ বিলাতী পক্ষী। এদেশে কখন আসে নাই।"

"ছবিতে আসিয়াছে; আসে নাই কি হরিহর? জীবন্ত পক্ষী সেদেশে কেবল ছাগল ভেড়া ছোঁ মারিয়া লইয়া যায়; এই ছবির পক্ষী দুগ্ধপোষ্য বালকগুলির মাথায় ছোঁ মারিতে এইদেশে আসিয়াছে।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ পুস্তকখানা মুড়িয়া ফেলিলেন। তাহার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি?"

"আমরা মানুষ। আমাদের দুই হাত, দুই পা। আমরা বানরের মত চতুর্হস্ত নই; অথবা পশুর মত চতুষ্পদ নই; কিংবা বাদুড়ের মত কর-পক্ষ নই। আমাদের মাথা আছে, সে মাথায় বুদ্ধি আছে। পণ্ডিত-মহাশয় বলেন—'মানুষ আর কিছু নহে,—এক বাক্‌পটু জন্তু।"

"তা নয়—কি জাতি?"

"আমরা ককেসিয়ান্।"

ঠিক এই সময়ে পিতামহী পাঁজি লইয়া উপস্থিত হইলেন। পাঁজি ব্রাহ্মণের হাতে দিতে দিতে বলিলেন—"আগামী বৈশাখে যে কয়টা ভাল

দিন আছে, আপনি দেখিয়া রাখুন। অঘোর আসিলে, তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, যে দিন সুবিধা বোধ করিব, সেই দিনেই বিবাহ দিব।

ব্রাহ্মণ পাঁজি হস্তে লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"পাঁজি ত লইয়া আসিলে, অঘোরের মা; কিন্তু কাহাকে কন্যা দিব?"

পিতামহী এই কথায় বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"এ কথা বলিলেন কেন?"

"তোমার পৌত্রকে কি জাতি জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল—'আমরা ককেসিয়ান্।' এতকাল পূজা-আহ্নিক যোগযাগ করিয়া, শেষকালে মেয়েটাকে একটা ককেসিয়ানের হাতে দিব?"

পিতামহী তখন আমার পানে চাহিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"সে কি রে! কি জাত বলিয়াছিস্?"

"কেন মাষ্টারমশায় বলিয়াছেন, আমরা ককেসিয়ান্।"

"আরে ছিঃ! ওকথা বলিতে নাই।"

"না, বলিতে নাই! না বলিলে যে, মাষ্টারমশায় বেঞ্চির উপর দাঁড় করাইয়া দিবেন!"

ব্রাহ্মণ, পিতামহীকে বলিলেন—"শিরোমণি কি বালককে এসব শিখান নাই?"

"শিখাইয়াছিলেন বই কি! আমি নিজেও শিখাইয়াছি।"

এই বলিয়াই পিতামহী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা ব্রাহ্মণ কতকাল?" এই কথা শুনিবামাত্র, পিতামহী আমাকে, শৈশবে গল্প শুনাইবার সঙ্গে সঙ্গে, যে শ্লোক শিখাইতেন, সেই শ্লোক আমার মনে পড়িল। যেমন পিতামহী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা ব্রাহ্মণ কত-

কাল ?” অমনি আমি অভ্যাসবশে বলিয়া উঠিলাম—“চন্দর-সুয্যি যত-কাল। চন্দর্-সুয্যি গগনে, আমি জান্‌ব কেমনে ? যাবৎ মেরৌ স্থিতা দেবাঃ, যাবৎ গঙ্গা মহীতলে, চন্দ্রার্কৌ গগনে যাবৎ,তাবৎ বিপ্রকুলে বয়ং।” উভয়েই আমার উত্তর শুনিয়া যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। পিতামহী বলিলেন—“সেকি ! নিজেই বালককে এ সমস্ত শিখাইয়াছি, সে ককেসিয়ান্ বলিবে কি !—আর ওকথা বলিয়ো না, ভাই !”

“না বলিলে, মাষ্টারমশায় যখন বেত মারিবে ? তখন তুমি কি আমার হইয়া মার খাইবে ?”

“তাহ’ক ; স্কুলে তুমি যা ইচ্ছা বলিয়ো। বাড়ীতে কখনও অমন কথা মুখে আনিয়ো না। যখনি কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, ‘তুমি কি ?’ তুমি অমনি জোরের সহিত বলিবে, ‘আমি ব্রাহ্মণ’। ও নাস্তিক-গুলার কথা শুনিয়ো না।”

স্কুলে আমার বুদ্ধির একটা বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। আমাদের যিনি ইংরাজী শিক্ষক ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাঁহার উপাধি ছিল ‘বিশ্বাস।’ তবে তিনি জাতিতে কি ছিলেন, তাহা আমি বলিব না। তিনিই আমাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলিতেন—‘আমরা —অর্থাৎ, তিনি ও বালকবৃন্দ—সকলে ককেসিয়ান্ জাতির ইণ্ডো-এরিয়ান্ শাখা।’ যদিও ‘জাতি’ শব্দটা বর্ণের একটা নামান্তর নহে, তথাপি আমরা জাতি বলিতে তখন,ব্রাহ্মণ-কায়স্থ কিংবা শূদ্র– এইমাত্র বুঝিতাম। মাষ্টারমহাশয় আমাদের সে ভ্রম দূর করিয়া দিয়াছিলেন। এখন আবার সেই ভ্রমে পড়িতে হইবে ? ‘ব্রাহ্মণ’ বলিলে মাষ্টারের কাছে মার খাইতে হইবে ; ‘ককেসিয়ান্’ বলিলে বিয়ে হইবে না !—কি করি ? অনেক

ভাবিয়া পিতামহীকে বলিলাম—"আমি স্কুলে ককেসিয়ান্, আর বাড়ীতে ব্রাহ্মণ।"

উত্তর শুনিবামাত্র ব্রাহ্মণ উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন—"শিরোমণির পৌত্র বটে! বালকের বুদ্ধির প্রশংসা করি। সাহেব-পড়ান পণ্ডিতের-নাতী—মা! কথায় তুমি তাহাকে ঠকাইতে পারিবে না।"

পিতামহী এই মন্তব্যে উৎসাহিত হইয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি ব্রাহ্মণ?"

"কুলীন ব্রাহ্মণ।"

"কুলের লক্ষণ কি?"

"স্কুলের 'কুল' হইলে, কুল দুই প্রকার—দেশী কুল, আর নারকুলে কুল। প্রথমের লক্ষণ গোল, দ্বিতীয়ের লম্বা; প্রথম টক্, দ্বিতীয় না-টক না-মিষ্ট, তবে দুয়েরই শাঁস আছে ইত্যাদি। আর ঘরের 'কুল' হইলে—

'আচারো বিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠাতীর্থদর্শনং।

নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধাকুললক্ষণং॥"

এই তিন প্রকার কুলের লক্ষণ শুনিয়া, ব্রাহ্মণ আবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন এবং আমার মস্তক-আঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিলেন। তখনও স্নেহ-প্রদর্শনে মস্তক-আঘ্রাণের প্রথা প্রচলিত ছিল। ধীরে ধীরে, লোকের অজ্ঞাতসারে, সে প্রথার এখন বিলোপ হইয়াছে। আমার মনে হয়, আমার বংশের মধ্যে এই প্রকারের স্নেহাভিব্যক্তি আমিই শেষ দেখিতে পাইয়াছিলাম।

ব্রাহ্মণের স্নেহাভিনয় পিতামহী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া স্থিরনেত্রে দেখিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ তাহা দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া বলিলেন—"কি

দেখিতেছ অঘোরের মা ?—কাল বড় বিষম আসিতেছে !—বুঝিতে পারিতেছ না ? এই অপূর্ব্ব বুদ্ধিমান্ সন্তান ইহার পরে ব্রাহ্মণ্য-প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে কি না সন্দেহ।”

স্কুলে যাইবার সময় হইতেছে বুঝিয়া, পিতামহী আমাকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ পাঁজি লইয়া, বিবাহের দিন দেখিতে বসিলেন—আমিও সেলেট্-বই বগলে করিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া আসিলাম। ব্রাহ্মণের কথায় তিনি যে কি উত্তর দিলেন, তাহা আর আমি জানিতে পারিলাম না।

(৩)

আমার এই সম্বন্ধের কথা শুনিয়া এখন অনেকেরই মুখে হাসি আসিবে। কিন্তু কুল-প্রথানুযায়ী আমাদের সমাজে কুলীনদিগের মধ্যে প্রায় ওইরূপ বয়সেই বর-কন্যার মধ্যে ‘সম্বন্ধ’ স্থাপিত হইত। অবশ্য বিবাহ যে তখন হইত না, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে বিবাহ হইতে চারি পাঁচ বৎসরের অধিক বিলম্ব হইত না। বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ—উভয়েই কেবল বালকের উপনয়ন সংস্কারের অপেক্ষা করিত।

আমরা দাক্ষিণাত্য-শ্রেণীর বৈদিক ব্রাহ্মণ—কুলীন। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ আমাদের সমাজের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ কুলীন। আমার পিতামহ এরূপ বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ-স্থাপন গৌরবের বিষয় মনে করিয়াই আগ্রহের সহিত ওরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

আমাদের শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র। আমার ভাবী

শ্বশুরও অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। যাজনক্রিয়ায় যাহা কিছু উপার্জ্জন হইত, তাহাতেই কোনও রকমে তাঁহার দিনপাত হইত।

দরিদ্র হইলেও ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্যের একটা বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। আমাদের প্রদেশে তাঁহার তুল্য পণ্ডিত আর কেহ ছিল না। শুনিয়াছি, ষড়্দর্শনেই তিনি সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, সকলেই তাঁহাকে একজন তেজস্বী ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানিত। আমাদের দেশের অধিকাংশ জমিদারই কায়স্থ। তাঁহারা সে সময়ে তাঁহাকে অনেক সম্পত্তি দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তিনি গ্রহণ করেন নাই। সংস্কৃত-কলেজে চাকরী লইবার জন্য কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে একবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, তিনি অনুরোধ রাখেন নাই—"ম্লেচ্ছের" চাকরী স্বীকার করেন নাই।

তাঁহার নাম ছিল শিবরাম সার্ব্বভৌম। কিন্তু "সাভ্যোম" মহাশয় বলিয়া দেশের মধ্যে তাঁহার এরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে, তাঁহার পরিচয়ের জন্য তাঁহার নামের আর বড় একটা প্রয়োজন হইত না।

আমার পিতামহ রামসেবক শিরোমণিও একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু পাণ্ডিত্যে তিনি 'সাভ্যোম' ম'শায়ের সমকক্ষ ছিলেন না। তবে 'সাভ্যোম' অপেক্ষা তাঁহার বুদ্ধি বেশী ছিল। দেশের ভবিষ্যৎ অবস্থা তিনি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়া সাহেবের চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তদানীন্তন অনেক সিবিলিয়ানকে সংস্কৃত ও বাংলা পড়াইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন হইয়াছিল ও ইংরাজ মহলে প্রতিষ্ঠা-লাভ ঘটিয়াছিল। দেশে বাগান-

বাগিচা,* দুই দশ বিঘা জমি প্রভৃতি সম্পত্তি করিয়া তিনি পরিবার-বর্গকে অন্নচিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন। পিতারও ভবিষ্যৎ তাঁহা হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতায় রাখিয়া তিনি পিতাকে সংস্কৃতকলেজে পড়াইতেন, এবং যে বৎসর পিতা বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাহার পর-বৎসরেই তাঁহার এক ছাত্র উচ্চপদস্থ কোনও ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীকে ধরিয়া পিতার ডেপুটিগিরি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

তবে ভাগ্যবশে পিতার হাকিমী দেখা পিতামহের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। নিয়োগপত্র আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার দেহান্তর ঘটিল।

পিতার হাকিমী-প্রাপ্তির চেষ্টা পিতামহ এতই গোপনে করিয়া-ছিলেন, এবং পিতাকেও একথা এমন গোপনে রাখিতে বলিয়াছিলেন যে, প্রতিবেশীদের মধ্যে কাহারও জানা দূরে থাক, বাড়ীর কেহ তাহা জানিতে পারেন নাই। পিতামহী পর্য্যন্ত এ কথার বিন্দুবিসর্গ জানিতেন না। মা বোধ হয়, পিতার কাছে কিছু আভাস পাইয়াছিলেন। পিতামহের মৃত্যুর পর পিতার চাকরী হওয়া পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে মায়ের কথাবার্ত্তায় ও আচরণে কতকটা তাহা অনুমান করিতে পারি; কিন্তু ঠিক বলিতে পারি না।

চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বাড়ীর ভিতরে আসিয়া দেখি, মা রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। অন্য অন্য দিন যখন পড়া শেষ করিয়া ভিতরে আসি, তখন মায়েরও রান্না একরূপ শেষ হইয়া যায়। আজ আর পড়া হয় নাই, সেই জন্য সকাল সকাল উঠিয়াছি।

যেখানে স্কুল, সে স্থান আমাদের গ্রাম হইতে পাকা এক ক্রোশ দূরে। আমাদের গ্রাম হইতে আরও পাঁচ ছয় জন বালক সেই স্কুলে পড়িতে

যাইত। আমরা এই কয়জন প্রায় প্রত্যহ স্কুল বসিবার এক ঘণ্টা আগে গ্রাম হইতে যাত্রা করিতাম। যাইবার সময় দলবদ্ধ হইয়া চলিতাম। ইহাদের মধ্যে একটি প্রতিবেশী সমবয়স্ক বালক, আমাকে বাড়ী হইতে ডাকিয়া লইয়া যাইত। আমি কোনও দিন তাহার আগে প্রস্তুত হইতে পারি নাই। সে দিন মনে করিলাম, আমি আগে প্রস্তুত হইয়া আমার সহচরকে ডাকিতে যাইব।

এই মনে করিয়া আমি রন্ধনশালার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম ; এবং মাকে বলিলাম—"মা! আমাকে ভাত দে। আমি আজ রামপদকে ডাকিয়া যাইব।"

মা উনান হইতে হাঁড়ি নামাইতেছিলেন। তিনি আমার কথার কোনও উত্তর দিলেন না। আমি আবার বলিলাম, "আমার কথা শুনতে পেলিনি?" মা এবারও কোন উত্তর দিলেন না। আপনার মনে কি বলিতে বলিতে হাঁড়ির ভিতর কাঠি ঘুরাইতে লাগিলেন।

দুইবার উত্তর না পাইয়া আমার রাগ হইল। আমি রান্নাঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া একটু জোর করিয়া বলিলাম,—"ভাত দিবি ত দে। নইলে আমি না খেয়ে স্কুলে চলিয়া যাইব।"

এইবারে মা উত্তর করিলেন। তাঁহার উত্তর শুনিয়া বুঝিলাম, তিনি আমার কথা শুনিয়াছেন। কেবল ক্রোধের বশে আমার কথার উত্তর করেন নাই। মা বলিলেন,—"স্কুলে যাইয়া কি করিবি? পড়াশুনা তো কিছু হইল না।"

এইরূপে কথা আরম্ভ করিয়া মা ব্রাহ্মণ ও পিতামহীর ব্যবহারের উপর অনেক তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেন এবং পিতার সঙ্গে আমাকে

কলিকাতায় পাঠাইবার ভয় দেখাইলেন, এবং বলিলেন,—"একবার সেখানে পাঠাইলে আর দশবছরের মত তোকে এ-মুখো হইতে দিব না।"

আমি শৈশব হইতে পিতামহীর আশ্রয়েই পালিত। আমার শাসনে মায়ের কোনও অধিকার ছিল না। সুতরাং মায়ের এই সকল কথা শুনিয়াও আমাতে বিন্দুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইল না। আমি অন্নের জন্য বারংবার মাকে পীড়ন করিতে লাগিলাম। স্কুলে যাইবার সময় একান্ত উপস্থিত হইল দেখিয়া অগত্যা তিনি আমাকে ভাত বাড়িয়া দিলেন। সবে মাত্র একটি গ্রাস অন্ন মুখে তুলিয়াছি, এমন সময়ে পিতামহী রান্নাঘরের দ্বারে আসিয়া মাকে ডাকিলেন,—"বৌমা!"

আমার বেলায় যেমন মা প্রথমে কোনও উত্তর দেন নাই, এবারেও তিনি তাই করিলেন। পিতামহীর ডাকে উত্তর দিলেন না।

পিতামহী আবার বলিলেন,—"বৌমা!"

মা এবারে উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। মুখ না ফিরাইয়াই কিঞ্চিৎ গম্ভীরস্বরে তিনি বলিলেন,—"কেন?"

"মুখ তুলিতেছ না কেন?"

"কি বলিবে বল না।"

"তুমি হাঁড়ীর দিকে মুখ করিয়া থাকিলে কি বলিব!"

"হাঁড়ীমুখটা কিসে দেখিলে?" এই বলিয়া মাতা মুখ ফিরাইলেন।

হাঁড়ীমুখ ত বলি নাই মা, হাঁড়ীর দিকে মুখ বলিয়াছিলাম। তবে এখন দেখিতেছি তাই, মুখ হাঁড়ীর মতন হইয়াছে। কেন মা, এরূপ হইবার কারণ? কেহ কি তোমাকে কিছু বলিয়াছে?"

"কা'র কি করিয়াছি, তা বলিবে?"

"তবে মুখ গম্ভীর হইল কেন ?"

"তুমি নিজেই যখন নাতীর পরকাল নষ্ট করিতে কোমর বাঁধিয়াছ, তখন মুখে হাসি আনি কেমন করিয়া ?"

"আমি পরকাল নষ্ট করিলাম !"

"তা নয় ত কি ? ও বামুন সকাল বেলায় কি করিতে আসিয়াছিল ? ছেলের পড়া হইল না। বৈকুণ্ঠ পণ্ডিত বাড়ী যাইবার সময় বলিয়া গেল— 'সাভ্যোম আসিয়া হরিহরের পড়ার ব্যাঘাত জন্মাইল। আমি আর কথা-শেষের অপেক্ষা করিতে পারিলাম না—ঘরে চলিলাম। আজ যদি হরিহর স্কুলে পড়া বলিতে না পারে, তার জন্য আমাকে যেন দায়ী করিবেন না'।"

"কই এ কথা সে আমাদের বলিল না কেন ? আমরা জানি, সে পড়ানো শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আর আমাদের কথায় তাহার পড়ানো বন্ধ করিবার ত কিছু প্রয়োজন ছিল না।"

তোমাদের মতন তোমরা বুঝিলে, সে তাহার মতন বুঝিয়াছে। এই কচিবালকের কাছে বিবাহের কথা লইয়া তোমরা কিচকিচি করিবে, বালকের কি তাতে মনঃস্থির থাকিতে পারে, না, পণ্ডিতই মনোযোগ দিয়া পড়াইতে পারে ?"

"না মা, আসল কথা তা নয়।" এই বলিয়া পিতামহী ঘটনাটা বিশদ-রূপে মায়ের কাছে বিবৃত করিলেন। শেষে বলিলেন,—"সে মিথ্যাবাদী। আর মিথ্যাবাদীর কাছে কচিছেলেকে পড়াইতে দিলে তাহার শিক্ষার কিছুই ফল হইবে না।"

তা কচিছেলেকে যার তার কাছে মাথা নোয়াইলেই বা ছেলের কি

শিক্ষা হইবে? পণ্ডিতকে বামুন যা ইচ্ছে তাই বলিয়াছে। সে কেমন করিয়া সেখানে থাকিবে? তাহাকে ছেলে নমস্কার করে নাই, তাহাতেই একেবারে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে?"

মা এই সকল কথা বলিতেছেন, পিতামহী বিস্ময়বিস্ফারিত-নেত্রে মায়ের মুখের পানে চাহিয়া আছেন, আর আমি এক-ডেলা-ভাত-হাতে তাঁহাদের উভয়েরই পানে চাহিয়া আছি। তাঁহাদের এ বাদানুবাদ আমার কেমন ভাল লাগিতেছে না।

পিতামহের জীবদ্দশায় ঠাকুরমার সঙ্গে মায়ের এরূপ কথাবার্ত্তা কখন শুনি নাই। তখন কার্য্যের দোষ উপলক্ষ্য করিয়া পিতামহীই মাঝে মাঝে মাকে মৃদু তিরস্কার করিতেন। আজ প্রথম আমি পিতামহীকে মায়ের কাছে কৈফিয়ত দিতে দেখিলাম। মায়ের এ ভাব দেখা আমার অভ্যাস ছিল না, সুতরাং এ ভাব আমার ভাল লাগিল না। পিতামহীর মুখ বিষণ্ন দেখিলাম। দেখিয়া বোধ হইল, অন্তর হইতে বিষাদ যেন সবেগে ফুটিয়া উঠিতেছে। পিতামহী প্রাণপণ চেষ্টায় ভাব-সংবরণ করিতেছেন, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও ভাব গোপন করিতে পারিতেছেন না।

মা পিতামহীর মুখের ভাব দেখিয়া, মাথা অবনত করিলেন। চোখের পানে চাহিয়া কথা কহিতে, আর বোধ হয়, তাঁহার সাহস হইল না।

তখন আমার দিকে চাহিয়া, আমাকে পূর্ব্বোক্ত অবস্থাপন্ন দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"বলি, পড়ার দফাতো রফা হইয়াছে। স্কুলেও কি আজ যাইতে হইবে না? বাবু আসিলে তাঁর সঙ্গে তোকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিব। এখানে পাঁচ জনের দৌরাত্ম্যে তোর পরকাল ঝরঝরে হইয়া যাইবে।"

পিতাকে বাবু নামে অভিহিত হইতে দেখিয়া পিতামহী বলিলেন,—“বাবু কে গো ?”

মা এ কথার আর কোন উত্তর দিলেন না। পিতামহী বলিতে লাগিলেন,—“কা’ল পর্য্যন্ত কর্ত্তা ভিক্ষায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তিনি না মরিতে মরিতেই তাঁর ছেলে বাবু হইয়া গেল! এখনও যে ঘরের চালে খড় ঘুচে নাই। গরীব বামুনের ছেলেকে বাবু বলিতে শুনিলে, পাড়ার লোকে যে গায়ে ধূলো দিবে!”

মা তথাপি নিরুত্তর। আমিও নিঃশব্দে আহারে নিযুক্ত। আহার প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় রামপদ আসিয়া আমাকে ডাকিল,—“হরিহর!”

মা ও পিতামহীর বৃথা বাদানুবাদে সেদিন আমার আর আসল কথা শুনা হইল না।

(৪)

সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই পিতা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। পিতামহী তখন বাড়ীতে ছিলেন না। বেলা অপরাহ্ণ। মা ঘর-দোর ঝাঁট দিয়া, কাপড় কাচিয়া, ঘরের দাওয়ায় চুল বাঁধিতে বসিয়াছেন। প্রতিবাসিনী, সেই পূর্ব্বোক্ত ঠানদিদি, মায়ের চুল বাঁধিয়া দিতেছেন। আমি স্কুল হইতে আসিয়া হাত-মুখ ধুইয়া ‘জল খাবার’ খাইতে বসিয়াছি। উপনয়ন হইবার আগে আমি বিকালে দুধ-মাখা ভাত খাইতাম। এখন একস্থয্যিতে দুইবার অন্নাহার নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ উপনয়নের পর এখনও এক বৎসর অতীত হয় নাই। সুতরাং আচমনীয় কোনও বস্তু অর্থাৎ মুড়ি

অথবা অপর কোনও ভাজা জিনিষও বিকালে খাইতে আমার অধিকার ছিল না। পিতামহী সেই জন্য ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি, নারিকেল-নাড়ু প্রভৃতি অনাচমনীয় মিষ্টান্ন আমার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন।

আমি তাই খাইতেছি, আর চুল বাঁধিতে বাঁধিতে মা ও ঠানদিদিতে যে কথোপকথন হইতেছিল, তাহাই শুনিতেছি।

ঠানদিদি বলিতেছিলেন,—"হাঁ বৌমা, হরিহরের বিবাহের কি হইল?"

মা বলিলেন,—"চুলো জানে। ও সব কথা গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়ো। আমি বাড়ীর ঝি বই ত নয়!"

ঠানদিদি। সে কি মা,—তুমি ঘরণী গৃহিনী—বউ, তুমি ঝি হ'তে যাবে কেন?"

মা। সে তোমরা দূর থেকে দেখ্‌ছ। ভিতরের মর্ম্ম ত জান না।

ঠানদিদি। কেন, দিদি তোমাকে কিছু বলিয়াছেন নাকি?

মা। বল্‌বে আবার কি? বল্‌বার আমি কার ধার ধারি?

ঠানদিদি। কেন, দিদি ত সে রকম লোক নয়!

মা। এই যে বল্লুম, বাইরে থেকেই ওই রকম দেখতে। ঘর-জ্বালানি পাড়া-ভোলানি। মুখের বচন ত শোননি খুড়ীমা! তবু যদি আমার গতর না থাক্‌তো। সারাদিন মুখে-রক্ত-ওঠা খাটুনি। কোথায় দু'টো মিষ্টি কথা শুন্‌বো, তাও আমার বরাতে নেই। একটা ঝি নেই, চাকর নেই--ইনিও ঠাকুর মরবার পর থেকে একেবারে হাত-পা এলিয়ে দিয়েছেন। কেবল বাক্যিটি বেড়েছে।

ঠানদিদি। তা হ'লে ত দিদির বড় অন্যায়! তবু তো তোমাদের বাসন মাজবার, গরুর সেবা কর্‌বার, লোক আছে। আমার আবার তাও

নেই। ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে ঠাকুর-পূজো পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ নিজে হাতে কর্‌তে হয়। বউটি একটি কুটো পর্য্যন্ত নাড়্‌বে না। তবু আমি তাকে কিছু বলি না।

মা। তোমার মতন শাশুড়ী ক'জনের হয়! আমার বাবা আমার পিছনে তিনটা ঝি রাখিয়াছিলেন। বাড়ীর একটিও কাজ তিনি আমাকে করিতে দিতেন না। পেয়াদারা ছেলেবেলায় মাটীতে আমাকে পা দিতে দিত না।

ঠানদিদি। তা কি আর বুঝি না মা! হাকিমের পেশকারী—সে কত বড় চাকরী! আমার বাপের বাড়ীর দেশে নবীন চৌধুরী পেশকারী ক'রে জমীদারী ক'রে গেছে।

মা। খেটে খেটে গতর চূর্ণ কর্‌ছি, তাতেও দুঃখ নেই—যদি মুখের একটুও মিষ্টতা পেতুম।

ঠানদিদি। পরের মেয়ে। তাকে নিয়ে ঘর কর্‌তে হবে। খিট্‌খিটে হ'লে চলবে কেন?

মা। এই যে বললুম খুড়ীমা, অনেক তপস্যা করলে, তবে তোমার মতন শাশুড়ী পাওয়া যায়। সেদিন সকাল বেলায়—পণ্ডিত ছেলেটাকে পড়াচ্ছে, এমন সময় সেই বামুনটা—

ঠানদিদি। কোন্ বামুন?

মা। ওই যে গো—শ্বশুর যার মেয়ের সঙ্গে নাতীর সম্বন্ধ করেছেন।

ঠানদিদি। কে—সাভ্যোম ম'শায়?

মা। হাঁ—ওই তোমাদের সাভ্যোম। মিন্‌সের কি একটু আক্কেল নেই গা! কচিছেলে পড়ছে, তার কাছে ব'সে বিয়ের কথা পেড়ে বসল!

শ্বাশুড়ীও তেমনি—এক পাঁজী নিয়ে নাতীর সামনে দিন দেখাতে ব'সে গেল। ছেলেটার পড়া হ'ল না। এই কথা বলেছি ব'লে শ্বাশুড়ী তিন দিন আমার সঙ্গে কথা কয় নি।

ঠানদিদি। না, এ ভাল কথা নয়। নাতীর বিয়ের দিন দেখতে হয়, অন্য সময় দেখ। ছেলের পড়া বন্ধ হবে, এ কি কথা! তাই কি বিয়ের কথা তোলবার এই সময় পড়ল! কা'ল অমন সোয়ামী গেল, আমরা হ'লে ত একবছর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতুম। তা বিয়ের কি ঠিক হ'ল ?

মা। কে জানে! আমি আর কথা কইনি। যার ছেলে, সে আসুক —সে বুঝবে।

এবারেও আসল কথা আমার শোনা হইল না। কেবল বসিয়া বসিয়া মায়ের কতকগুলা মিথ্যা উক্তি শুনিতেছিলাম, এমন সময়ে পিতা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই আমাকে ডাকিলেন,—"হরিহর!" মাতা ঠাকুরাণী অমনি অবগুণ্ঠনে মস্তক আবৃত করিলেন।

ঠানদিদি বলিলেন,—"তুমি অনেক কাল বাঁচিবে অঘোরনাথ! আমরা সবে মাত্র তোমার নাম করিয়াছি, আর অমনি তুমি উপস্থিত হইয়াছ।"

আমি তাড়াতাড়ি ভোজন সাঙ্গ করিয়া পিতার সমীপে উপস্থিত হইলাম।

সে দিন পিতার বাড়ী আসিবার দিন নয়। মা সেইজন্য তাঁহার অত শীঘ্র আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতা বলিলেন,—"তুমি আগে কেশ-বিন্যাস সারিয়া লও, আমি পরে বলিতেছি।" এই বলিয়া তিনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। আমিও তাঁহার হাত হইতে ব্যাগ লইয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলাম।

ব্যাগ যথাস্থানে রক্ষা করিলে তিনি আমাকে বলিলেন,—"তোমার ঠাকুর-মা কোথায় ?"

আমিও স্কুল হইতে আসিয়া ঠাকুরমাকে দেখি নাই। বৈকালে প্রায়ই প্রত্যহ তিনি প্রতিবেশী গোবিন্দ-ঠাকুরদার বাড়ীতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ-পাঠ শুনিতে যাইতেন। সেইখানেই তাঁর থাকা বিশেষ সম্ভব মনে করিয়া আমি পিতাকে বলিলাম,—"ঠাকুরমাকে ডাকিয়া আনিব ?" পিতা বলিলেন,—"আন।"

আমি পিতামহীকে ডাকিতে গোবিন্দ-ঠাকুরদার গৃহাভিমুখে চলিলাম।

(৫)

সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি, গোবিন্দ-ঠাকুরদা' একখানা ছোট চৌকীতে পাতা আসনের উপর একখানা বটতলার রামায়ণ রাখিয়া চোখে চারিদিকে-সূতা-বাঁধা এক চসমা লাগাইয়া সুরের সহিত পাঠ করিতেছেন।

যেখানে বসিয়া তিনি পড়িতেছিলেন, সেটা তাঁহাদের সাধারণের চণ্ডী-মণ্ডপ। তাঁহারা জ্ঞাতিতে অনেক ঘর। সাধারণের পূজাদি কার্য্য উক্ত চণ্ডীমণ্ডপে হইয়া থাকে। গ্রামের ব্রাহ্মণদের মধ্যে তাঁহারাই সে সময়ে শ্রীমান্ ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেক জ্ঞাতিরই জমিজমা ও নগদ সম্পত্তি যথেষ্ট ছিল। ইহা ছাড়া দেবকার্য্যের জন্য সাধারণের একটা দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল। তাহারই আয় হইতে দুর্গাপূজাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইত। তাঁহারা শাক্ত ছিলেন। বৈষ্ণবসম্মত দোল প্রভৃতি ক্রিয়া-কলাপের যদিও তাঁহারা অনুষ্ঠান করিতেন, কিন্তু দুর্গাপূজা ও কালীপূজা-তেই ঘটাটা বিশেষ রকমে হইত। দুর্গোৎসবে নবমী-পূজার দিনে এবং

কালীপূজায় রাত্রিতে দশ বারোটা মহিষ ও শতাধিক ছাগ বলি হইত। এ কয়দিন গ্রামের ব্রাহ্মণ-শূদ্র কাহাকেও ঘরে হাঁড়ী চড়াইতে হইত না। দেশের অনেক ধনী কায়স্থ জমিদার তাঁহাদের শিষ্য ছিল। এই কারণেই তাঁহারা উক্তরূপ ধনী ছিলেন।

ইঁহাদের মধ্যে গোবিন্দ-ঠাকুরদা' আবার ধনে মানে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পাণ্ডিত্যের কিঞ্চিৎ অভাব এবং কার্পণ্যের কিঞ্চিৎ দুর্নাম ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন দোষের কথা আমরা শুনি নাই। বরং অতি সজ্জন বলিয়াই গ্রামমধ্যে তাঁহার খ্যাতি ছিল।

গোবিন্দ-ঠাকুরদা', আমার পিতামহের সমবয়স্ক ছিলেন। দুইজনে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। বাল্যাবস্থায় পিতামহ দরিদ্র ছিলেন। শুদ্ধ মাত্র পুরুষকারে তিনি অবস্থার উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন। উপার্জ্জনের জন্য বৎসরের অধিকাংশ সময়ই তাঁহাকে কলিকাতায় থাকিতে হইত। এই জন্য সম্পত্তি ক্রয় করিতে তিনি উপার্জ্জনের টাকা গোবিন্দ-ঠাকুরদা'র কাছে পাঠাইতেন। সেই টাকা হইতে তিনি পিতামহের নামে লাভবান্ সম্পত্তি ক্রয় করিয়া দিতেন, এবং পিতামহের অনুপস্থিতিতে আমাদের গৃহের তত্ত্বাবধান করিতেন।

পরবর্ত্তী কালে গ্রামবাসীদের ভিতরে যেমন ঈর্ষাদ্বেষের প্রাবল্য হইয়াছিল—গ্রামের মধ্যে কেহ কাহারও উন্নতি দেখিতে পারিত না,—তখন ততটা হয় নাই—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের মধ্যে এ ভাবটা ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখনও চন্দ্র-সূর্য্যকে সাক্ষী রাখিয়া বিষয়াদির আদান-প্রদান চলিত।

ব্রাহ্মণ—বিশেষতঃ আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ—তখনও জানিত না যে,

তাহাকে চাকরী করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে হইবে। অর্থ না থাকিলেও যজমান ও বর্দ্ধিষ্ণু কায়স্থ-জমীদারদিগের কল্যাণে কাহারও বড় একটা অন্নাভাব ঘটিত না। অনেকেরই পিতৃ-পিতামহের প্রাপ্ত ব্রহ্মোত্তর জমী ছিল। ব্রাহ্মণের চাকরী-স্বীকার তখন একটা বড় লজ্জার কথাই ছিল। চাকরী করিবে কায়স্থ। ব্রাহ্মণ তাহাকে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া পেট পূরাইবে। আর অবকাশে যথাশক্তি শাস্ত্রচর্চ্চা করিবে। ব্রাহ্মণ-সমাজে এই বিধি প্রচলিত ছিল। কাজেই চাকরী-স্বীকারকারী পিতামহের অর্থোপার্জ্জনে কাহারও তখনও কুটিল দৃষ্টি পড়ে নাই। পিতামহও এদিকে বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন। লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা করিয়া গ্রামবাসিগণের সঙ্গে তিনি সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেন। লোকের মনে বিন্দুমাত্রও ঈর্ষা জন্মিবার তিনি অবকাশ দিতেন না। এই এই জন্য সামর্থ্য সত্ত্বেও তিনি কোঠা-বাড়ী প্রস্তুত করান নাই। খোড়ো-ঘরগুলির একটু শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন—এই মাত্র।

চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া দেখি, গোবিন্দ ঠাকুরদা' পূর্ব্বোক্তভাবে সুর করিয়া রামায়ণ পড়িতেছেন, আর পাড়ার অনেকগুলি বর্ষীয়সী মহিলা তাঁহাকে ঘেরিয়া তন্ময় হইয়া সেই পাঠ শুনিতেছেন।

যেখানে হনুমানের অশোকবনস্থা সীতার অন্বেষণের কথা আছে, ঠাকুরদা' সেইখানটা পড়িতেছিলেন। আর স্ত্রীলোকেরা পাছে বুঝিতে না পারে, এই জন্য স্থানে স্থানে দুই একটা দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা করিতে-ছিলেন।

হনুমান্ লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াও সীতার সন্ধান পাইতেছেন না। অগত্যা তাঁহার অবস্থিতিস্থান নির্ণয়ের জন্য তিনি যে কোন উচ্চবৃক্ষের অন্বেষণ

করিতেছিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি দেখিলেন, একটা শিমূলগাছ শূন্যে সবার উপর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

"শিংশপার বৃক্ষ বীর দেখি উচ্চতর।
লম্ফ দিয়া উঠিলেন তাহার উপর॥"

এই দুইটি কবিতার চরণ তিনি পাঠ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—"মহাবীর শংসপার গাছে উঠলেন মেনে।"

শ্রোত্রীবর্গের মধ্যে জনৈক মহিলা প্রশ্ন করিলেন,—"শংসপার গাছটা কি?" অপর এক মহিলা ঠাকুরদা'র হইয়া উত্তর করিলেন,—"এ আর বুঝতে পার্‌লিনি। যে গাছে খুব শাঁস আছে,—মানে কি না, খুব শাঁসালো গাছ।"

ঠাকুরদা' চসমাখানা চোক হইতে খুলিয়া বইএর উপর রাখিলেন। তার পর প্রশ্নকারিণী মহিলার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন,—"হাঁ, শাঁসালো গাছ বটে। তবে শাঁসটা মাথার দিকে নয়, পায়ের দিকে। মানে কি না—গোড়ার দিকে। কেননা, কথাটা হচ্ছে শংস—পা, অর্থাৎ শাঁকালু।"

অপর এক মহিলা বলিয়া উঠিলেন,—"সে কি ঠাকুরপো! শাঁকালু গাছে চড়বে কি? শাঁকালু ত লতানে গাছ।"

ঠাকুরদা' বলিলেন,—"আগে কি লতানে ছিল? তখন এই গুঁড়ি—এই ডাল। মহাবীর স্বয়ং চেপে ঝাঁকারি দিয়েছেন, সাধ্য কি তার খাড়া থাকে। সেই অবধি মাথা নুইয়ে বাছাধন মাটীতে হামাগুড়ি দিয়ে চল্‌ছেন। ফল তার আজও প্রাণভয়ে মাটীর ভিতরে ঢুকে আছে।"

আমি তখন চণ্ডীমণ্ডপের সমস্ত সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া সবেমাত্র রোয়াকের উপর পা দিয়াছি। তখনও পর্য্যন্ত আমি কাহারও লক্ষ্য হই

নাই। ঠাকুরদাদার মানে করা শুনিয়া আমি আর হাসি রাখিতে পারিলাম না। বলিলাম,—"ও কি বল্‌ছেন ঠাকুরদা'! শিংশপা মানে যে শিমুল গাছ।" অমনি সকলে আমার পানে চাহিল।

ঠাকুরদা' চসমাখানি আবার চোখে তুলিতেছিলেন। আমার কথা শুনিয়া তাহা আর তাঁর করা হইল না। "মুখ্‌খু পণ্ডিতগুলো বলিয়াছে বুঝি? আরে শালা, সে সময় কি শিমুল গাছ লঙ্কায় ছিল? রাবণ রাজা কুস্তি ক'রে শিমুল গাছে পিঠ ঘস্‌ত,তাইতেই শিমুলগাছ একেবারে তেল।" এই বলিয়াই ঠাকুরদা' আবার পাঠারম্ভ করিলেন।

ঠাকুর-মা চণ্ডীমণ্ডপের একটি কোণে বসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে তিরস্কারচ্ছলে কহিলেন,—"হাঁরে গাধা, ইস্কুলে পড়িয়া তোমার কি এই বিদ্যা হইতেছে? গুরুজনের উপর কথা কওয়া! নাও, কান মলিয়া ঠাকুরদাদার পদধূলি গ্রহণ কর।"

ঠাকুরমার আদেশটা আমার ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমার উপরে কি এক রকম শক্তি প্রকাশ করিত, আমি তাহা পালন না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। আমি অগ্রসর হইয়া ঠাকুরদা'কে প্রণাম করিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে কহিলেন,—"বালকের কথা—শুনিতেই মিষ্টি।"

তখন আমার কথা লইয়া, বুদ্ধি লইয়া, লক্ষণ লইয়া মহিলামণ্ডলীর ভিতরে অনেক কথা হইয়া গেল।

সকলে নীরব হইলে ঠাকুরদা' আবার পাঠারম্ভ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে আমি পিতামহীকে পিতার আগমনবার্ত্তা শুনাইলাম, এবং তাঁহাকে গৃহে আসিতে কহিলাম।

এই কথায় আবার পাঠ বন্ধ হইল। ঠাকুরদা' এবারে বই মুড়িয়া ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সপ্তাহ যাইল না, এরই মধ্যে যে অঘোরনাথ ফিরিয়া আসিল?"

ইহার পূর্ব্বে পিতা প্রায় মাসান্তে একবার করিয়া বাড়ী আসিতেন। সুতরাং সপ্তাহমধ্যে তাঁহার আসা সকলেরই বিস্ময়ের বিষয় হইল।

পিতামহী বলিলেন.—"কেন আসিয়াছে, তাহা তো বলিতে পারি না।"

তখন কেহ বলিলেন –"মনটা ভাল নয়, তাই কলিকাতায় থাকিতে পারে নাই।"

কেহ বলিলেন,—"মন খারাপ হইবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি! অমন বাপ গেল, তা তাকে দেখিতে পাইল না।"

তৃতীয়া বলিলেন,—"আর তার বিদেশে থাকিবার দরকার কি? বৃদ্ধ মাও কোন্ দিন হঠাৎ ঘরে মরিয়া থাকিবে!"

ঠাকুরদা' বলিলেন,—"বল কি গো! চার চারটে পাশ করিয়া ছোক্‌রা ঘরে বসিয়া থাকিবে?"

তৃতীয়া উত্তর করিলেন,—"বাপ ত আজন্ম বিদেশে কাটাইয়া কিছু রাখিয়া গিয়াছে। তাই বাড়ীতে বসিয়া দেখিলে যে যথেষ্ট হয়।"

ঠাকুরদা। কি এমন রাখিয়া গিয়াছে? তার যা কিছু করা সে সমস্ত আমারই হাত দিয়ে ত। একটা বই নাতী নেই, তাই রক্ষা। ওর ওপর আর একটি ছুটি হ'লে হাতে মাখিতে কুলাইবে না।

তৃতীয়া। বেশ ত, দেশের ইস্কুলে মাষ্টারী ত করিতে পারে। বামুনের ছেলে চাকরী বৃত্তি ধরিলে, তার তেজ নষ্ট হইয়া যায়।

ঠাকুরমা এতক্ষণ এই সকল মতামত নীরবে শুনিতেছিলেন।

এইবারে কথা কহিলেন। তৃতীয়া মহিলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তুমি ঠিকই বলিয়াছ ঠাকুর ঝি। তবে আমার স্বামীর সংসার-নির্ব্বাহের অন্য উপায় ছিল না বলিয়া তিনি চাকরী স্বীকার করিয়াছিলেন।"

ঠাকুরদা। চাকরীই বা তাকে কেমন করিয়া বলিব। সাহেবদের পড়াইত এইমাত্র।

ঠাকুরমা। সে যাই করুন, তবু তাকে চাকরীই বলিতে হইবে। আর সেই জন্যই তিনি একটী বিশেষ দুর্ব্বলতার কাজ করিয়া গিয়াছেন।

ঠাকুরদা। কি কাজ! কই আমি ত কিছু জানি না!

ঠাকুরমা। তুমিও জান বইকি ঠাকুরপো, তবে তোমার মনে নাই।

ঠাকুরদা। কি বল দেখি?

ঠাকুরমা। সময়ান্তরে বলিব। আর বলিতেই বা হইবে কেন, এর পরে আপনিই বুঝতে পারিবে।

এ হেঁয়ালীর মত কথা কেহ বুঝিতে পারিল না। সুতরাং শুনিয়াও তুষ্ট হইল না।

তৃতীয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলিতে কি আপত্তি আছে?"

ঠাকুরমা। না থাকিলে ত বলিতাম। তবে তোমাদের তা অবিদিত থাকিবে না। একথার পর আর কেহ সে কথা জানিতে জিদ করিল না। সুতরাং হেঁয়ালি—হেঁয়ালিই রহিয়া গেল। আমি পিতামহীকে সঙ্গে লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

৬

হেঁয়ালি বুঝিতে পারি আর নাই পারি, পিতামহীর কথার ভাবে আমি তাহা অনুমান করিয়া লইয়াছি। সেদিন প্রাতঃকালে মা ও পিতামহীর বাগ্‌বিতণ্ডা শুনিয়াছি। এইমাত্র, পিতার আসিবার পূর্ব্বক্ষণে, মা ও ঠানদিদির কথোপকথনও শুনিলাম। আমি ইহাতেই বুঝিলাম, মা আমার অসাক্ষাতে নিশ্চয়ই পিতামহীর অমর্য্যাদা করিয়াছে।

পথে চলিতে চলিতে আমি পিতামহীকে একবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাঁ ঠাকুরমা, মা কি তোমাকে কটু কথা কহিয়াছে?"

পিতামহীও বিস্মিত ভাবে আমাকে প্রশ্ন করিলেন,—"এ কথা কেন জিজ্ঞাসা কর্‌লি বল্ দেখি?"

"তোমার কথার ভাবে আমার সন্দেহ হচ্ছে।"

পিতামহী হস্ত দ্বারা আমার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন। এবং বলিলেন—"যদিই করে, তা হ'লে তুই কি করিবি?"

তাই ত! আমি তা হ'লে কি করিব? আমি কিই বা করিতে পারি? আমি পিতামহীর এ প্রশ্নে উত্তর দিতে অসমর্থ হইলাম। পিতামহী আমার মুখ দেখিয়া কি বুঝিলেন। বলিলেন—না ভাই, অমর্য্যাদা করিবে কেন? অমর্য্যাদা করিতে তাহার ক্ষমতা কি?"

"তবে চণ্ডীমণ্ডপে ওকথা বলিলে কেন?"

"সে ত তোমার পিতামহ সম্বন্ধে কথা। সে নিগূঢ় কথা তোমাকে শুনিতে নাই।"

"তবে শুনিব না।"

"আর দেখ, তুমি সন্তান। ব্রাহ্মণ-সন্তান—লেখাপড়া শিখিতেছ। এর পরে তুমিও তোমার বাপের মতন চার পাঁচটা পাশ করিবে। তুমি মাকে যেন কোনও কটু কথা কহিয়ো না।"

"আমি কি কটু কথা কহিয়াছি ?"

"তুমি মাকে 'তুই' বলিয়ো না। গর্ভধারিণী সকলের চেয়ে গুরু—তাকে শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাইতে হয়। তুমি তাহা কর না বলিয়া তোমার মা আমার কাছে অনুযোগ করে।"

তা আমায় বলে না কেন ?"

"সেইটিই ত তার দোষ। যাহাকে যা বলিবার, তাহা তার সুমুখে বলিলেই হয়। তুমি ছেলে, তোমাকে বলিবে, এ সাহসও তার নাই। দুর্ব্বল-ঘরের মেয়ে—নিজে কল্পনায় ভিতরে দুর্ব্বলতার সৃষ্টি করে। সে মনে করে, আমি তোমাকে অমর্য্যাদা দেখাইতে শিখাইয়া দিই।"

"তবে কি এবার থেকে তাকে 'আপনি' বলিব ঠাকুর-মা ?"

"না ভাই, অত করিতে হইবে না। সেটা বাড়াবাড়ি হইবে। বংশের নিধি তুমি। তুমি 'তুমি' বলিলেই যথেষ্ট হইবে।"

আমি কিন্তু মনে মনে ঠিক করিলাম, মাকে এবার হইতে 'আপনি' বলিয়া ডাকিব।

বাড়ীর দ্বার-সমীপে আসিয়া, পিতামহী পাদ-প্রক্ষালনের জন্য পুষ্করিণীতে গমন করিলেন। আমাকে বলিয়া গেলেন—"তুমি আগে যাও। গিয়া তোমার বাপকে বল, আমি আসিতেছি।"

আমি একাই বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলাম। উঠানে উপস্থিত হইয়াই প্রথমে ঠানদিদিকে দেখিলাম। তিনি মায়ের চুলবাঁধা কাজ শেষ করিয়া

বাড়ী ফিরিতেছিলেন। তাঁর হাতে একটি ছোট রেকাবিতে কতকগুলি মিষ্টান্ন। বুঝিলাম, পিতা ব্যাগের ভিতর পুরিয়া কলিকাতা হইতে কিছু খাদ্য-সামগ্রী আমাদের জন্য আনিয়াছেন। তাহা হইতে কিয়দংশ ঠান-দিদির প্রাপ্য হইয়াছে। সেরূপ মিষ্টান্ন আমাদের দেশে পাওয়া যাইত না। পিতামহ যখনই কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিতেন, তখনই বড়বাজার হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট খাবার আমার জন্য লইয়া আসিতেন। রাতাবী সন্দেশ, গুঁজিয়া, বরফী, পেঁড়া, ক্ষীরের গোলাপজাম, যাহা আমাদের দেশের লোক চোখে পর্য্যন্ত দেখিতে পাইত না, পিতামহের মমতায় তাহা আমি কতবার উদর পুরিয়া আহার করিয়াছি। পিতামহের জীবদ্দশায় পিতা এ সকল সামগ্রী আনেন নাই। আনিবার আর লোক নাই বলিয়া পিতা আজ পিতামহের মমতার অনুসরণ করিয়াছেন।

আমি মিষ্টান্ন-পাত্রের দিকে চাহিয়াছি দেখিয়া ঠানদিদি সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন,—"আর দেখিতেছ কি ভাই, তোমার সমস্ত খাবার তোমার বাপ আজ আমাকে বিলাইয়া দিয়াছেন।"

"তা আর দিতে হয় না।"

"আর দিতে হয় না। তুমি যে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া কর।"

আমি এ কথার কোন উত্তর দিতে না দিতে পিতা আমাকে ডাকি-লেন।—"হরিহর!" ঠানদিদি তখন প্রস্থানমুখে আমাকে বলিলেন—"না হে ভাই, ভয় নেই। তোমার মা তোমার জন্য আগে তুলে রেখে, তবে তোমার কাকাকে এই খাবার দিয়েছেন।" এই বলিয়াই ঠানদিদি চলিয়া গেলেন। আমি পিতার কাছে চলিলাম। তিনি হাতমুখ ধুইয়া জলযোগ সারিয়া ঘরের দাওয়ায় একটা চৌকির উপর বসিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে-

ছিলেন। আর বৃদ্ধ চাকর সদানন্দ চৌকীর পাশে বসিয়া একটা কল্‌কের আগুনে ফুঁ দিতেছিল। ফুঁ শেষ করিয়া হুঁকাটির উপর কল্‌কেটি বসাইয়া সবে মাত্র সে পিতার হাতে দিয়াছে, এমন সময়ে আমি পিতার সমীপে উপস্থিত হইলাম।

মা অন্যদিকে মুখ করিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া কি কাজ করিতে ছিলেন। তিনি আমার উপস্থিতি দেখিতে পান নাই। তিনি মুখ না ফিরাইয়াই পিতাকে কি বলিতেছিলেন। আমি সে কথার কিয়দংশ শুনিতে পাইলাম। মা বলিতেছিলেন—"খুড়ী মা আমার সঙ্গে যাইবে বলিয়াছে।"

পিতা আমাকে দেখিয়াই হউক, অথবা অপর কোন কারণেই হউক, মায়ের কথার অন্য কোন উত্তর দিলেন না। বলিলেন—"আচ্ছা, সে সম্বন্ধে পরে বিবেচনা করা যাইবে। এখন যা করিতেছ, কর।" এই বলিয়াই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর-মার দেখা পাইলি ?"

"ঠাকুর-মা ঘাটে গিয়াছে, এখনি আসিবে।"

"হাঁ রে গাধা, তুমি দিন দিন অসভ্য হইতেছ ? তুমি তোমার গর্ভধারিণীকে রূঢ় কথা বল ?"

এইবারে মা কথা বন্ধ করিয়া আমাদের দিকে মুখ ফিরাইলেন।

আমি পিতার প্রশ্নে কিঞ্চিৎ হতভম্ব হইয়া গেলাম। রূঢ়বাক্য বস্তুটা কি এবং তাহা মায়ের প্রতি কোন্ সময়ে প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তখন মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাঁ মা, কখন্ আপনাকে রূঢ়বাক্য বলিয়াছি ?"

পিতা মায়ের মুখপানে চাহিলেন। মাও পিতার মুখপানে চাহিলেন

এবং ঈষৎ হাসির সহিত বলিলেন—"আমার মুখপানে চাহিতেছ কি! ও সয়তান, ওর ভাব বুঝা তোমার আমার কর্ম্ম নয়।"

পিতা তখন আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"হাঁ রে গাধা! তবে ত তুমি সমস্তই জান। গুরুজনের সঙ্গে কিরূপ কথা কহিতে হয়, জানিয়াও তুমি তোমার গর্ভধারিণীকে 'তুই' বলিয়াছ!"

আমি নিরুত্তর। সত্যই ত মাকে 'তুই' বলিয়াছি! পিতা শাসনস্বরূপ আমাকে কলিকাতা লইয়া যাইবার ভয় দেখাইলেন। বলিলেন—"এখানে থাকিলে তুমি অসৎ শিক্ষায় ও অসৎসঙ্গে অসভ্য হইয়া যাইবে। আমি তোমাকে আর এখানে রাখিব না।"

প্রথম প্রথম পিতামহের মুখে কলিকাতার কথা শুনিয়া কলিকাতা দেখিতে অথবা তথায় বাস করিতে আমার আগ্রহ হইত। এ আগ্রহ শশবে কতবার পিতামহের কাছে প্রকাশ করিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে যাই-বার জন্য তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিয়াছি। কিন্তু আজ শাসনের সঙ্গে পিতার মুখে কলিকাতার নাম শুনিয়া আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল।

শৈশবের কল্পনায় যতটুকু শক্তি, সেই শক্তিতে কলিকাতার এক বিভী-ষিকাময় ছবি আমি মুহূর্ত্তের মধ্যে মানসপটে অঙ্কিত করিয়া লইলাম। মুহূর্ত্তের ভিতরে আমি তন্ময় হইয়া গেলাম।

সদানন্দ এই সময়ে পিতার সঙ্গে কি কথা কহিল। আমার বোধ হইল, তাহাও কলিকাতার কথা। সদানন্দকে বোধ হয় পিতার সঙ্গে যাইতে হইবে। সদানন্দ কি করিবে, ঠিক করিতে পারিতেছে না। পিতার কাছে এ বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে সে তিনদিনের অবসর প্রাপ্ত হইল। সদানন্দ চিন্তা-ভারাক্রান্তের মত যেন টলিতে টলিতে উঠিয়া গেল। আমি

দ্বিগুণ ভীত হইলাম। পিতাকে কি উত্তর দিব ভাবিতেছি, ইত্যবসরে পিতামহী সেখানে উপস্থিত হইলেন।

পিতামহীকে দেখিয়াই আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনে হইল, যেন এই আকস্মিক বিপৎপাত হইতে আমাকে রক্ষা করিবার জন্য দেবী আসিয়াছেন।

(৭)

পিতামহী গৃহে আসিলে, পিতা ও তাঁহাতে যে সব কথোপকথন হইয়াছিল, এখনকার বয়স ও এই কালোচিত মতি হইলে, আমি সমস্ত কাজ ফেলিয়া, সেই কথোপকথন শুনিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহা হয় নাই। বালক 'আমির' বুদ্ধির দোষে বৃদ্ধ 'আমির' সে অমূল্য কথোপকথন শুনা ঘটিয়া উঠে নাই। সেই সময় কতকগুলি খেলুড়ে সঙ্গী আমাকে ডাকিতে আসিল। আমি অমনি সকল ভুলিয়া তাহাদের কাছে উপস্থিত হইলাম। পিতামাতা অথবা পিতামহী কেহই আমাকে নিষেধ করিলেন না।

কবি বলেন, বালক 'আমি' বৃদ্ধ 'আমির' জনক। বৃদ্ধ 'আমি' বালক আমির বুদ্ধিমত্তা লইয়া যত কেন রহস্য করুন না, অনেক সময় তাহার শাসন-বাক্য দূর-অতীত-সীমান্ত হইতে আসিয়া এমন কঠোরতার সহিত বৃদ্ধের কর্ণে ধ্বনিত হয় যে, তাহার জন্য বৃদ্ধ 'আমি'কে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়।

মনে হয়, যে কোন উপায়ে হউক, একবার সেই বালকের কাছে ফিরিয়া যাই, এবং তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া তাহারই পদপ্রান্তে

এই বৃদ্ধের বিজ্ঞতা অঞ্জলি দিয়া আসি। বালক বৃদ্ধ হয়, কিন্তু হায়, সংসারে কয়জন বৃদ্ধ বালক হইতে পারিয়াছে? কবি কাতরকণ্ঠে জননী কাছে ভিক্ষা করিয়াছেন—"হে জননি! কর পুনঃ বালক আমায়। সংসারে মান-যশ-প্রতিষ্ঠাজনিত অহঙ্কারের উচ্চ কোলাহলের মধ্য হইতে অসংখ্য বৃদ্ধের অন্তর এক একবার বলিয়া উঠিতেছে—"হে শিশুমূর্ত্তি গুরু আমাকে যে কোন উপায়ে তোমার চরণসমীপে উপস্থিত কর।"

কিন্তু ফিরিবার উপায় নাই।—অন্ততঃ আমার নাই। এই সুদীর্ঘ জীবন-পথে চলিতে চলিতে অন্যের শাসনে অথবা নিজের ইচ্ছায় এত কণ্টক-লতার কুঞ্জরচনা করিয়াছি। কেমন করিয়া ফিরিব? অনুকূল ঋতুবশে সেগুলা এত বড় ঘন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে যে, ফিরিবার কথা মনে উঠিতেই বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠে। বাব-আঁচড়ার কাঁটা—উলঙ্গ হইয়া সে দূরদেশে ফিরিতে গেলে, শুধু হাড় কয়খানি ফিরিবে। এতদিনের সযত্নরক্ষিত দেহাবশেষ শুধু ক্ষুধার্ত্ত চিতাভূমির ব্যাদিতমুখে বিশ্রামলাভের জন্যই ব্যাকুল হইয়াছে। ফিরিবার কথা মনে আনিতেই সে মজ্জার ভিতর হইতে স্পন্দন তুলিয়া আমাকে ব্যাকুল করিয়া ফেলে।

কাপড় পরিয়া ফিরিতে গেলে, একাংশের কণ্টক মুক্ত করিতে সহস্রাংশ কণ্টকযুক্ত হইবে। এক জননী—একমাত্র শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণা জননী—মা! তুমি ভিন্ন সে মন্দাকিনীর তরঙ্গাকুলিতদেশে আর কেহ যে ফিরাইতে পারিবে না! তোমার কোল হইতে উঠিয়া তোমারই কোলে শুইতে চলিয়াছি। স্থিতিকে গতিকল্পনা করিয়াছি। মা! এ মোহ ঘুচাইয়া দাও—আমাকে বালক কর।

পিতামহীর কথা অমূল্য—শুনি নাই, কিন্তু বুঝিয়াছি। তখন নয়—

তখন বুঝিবার সামর্থ্য ছিল না—বুঝিবার প্রয়োজনও ছিল না। যখন প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল, তখন অনুমান করিয়াছি। অনুমানের সঙ্গে সঙ্গে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। চিন্তার বিভিন্নমুখ স্রোতের মধ্যেও এক একটা মাথাভাঙা ঢেউ সময়ে সময়ে এই হৃদয়-তটভূমিতে আঘাত করিয়া অনুমানকে নিশ্চয়াত্মক করিয়াছে। কথা অমূল্য—শুনিতে পাই নাই—শুনিতে পাইব না—তবু বুঝিয়াছি—কথা অমূল্য।

খেলার শেষে যখন ঘরে ফিরিলাম, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে। আমি বাড়ীর উঠানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পিতামহী তাঁহার ঘরের দাওয়ায় আহ্নিক করিতে বসিয়াছেন। সে সময় তাঁহার কাছে যাইবার আমার অধিকার ছিল না। আমি পিতার ঘরে প্রবেশ করিলাম।

প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম, মা চোখে আঁচল দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পিতা তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হস্ত দ্বারা মায়ের অঞ্চল মৃদু আকর্ষণ করিতে করিতে বলিতেছেন—"কেঁদো না। আমি দেখিতেছি, আমার পিতার মৃত্যুতে মায়ের মাথা খারাপ হইয়াছে।"

মায়ের চক্ষু অঞ্চলেই চাপা রহিল, পিতা কোনও উত্তর পাইলেন না। তিনি আবার বলিলেন,—"মাথা খারাপ না হইলে আমি পাঁচটা পাস করিয়াছি,—মূর্খ স্ত্রীলোক আমাকে উপদেশ দেয়!"

এই সময় পিতা আমাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই বলিলেন—"নাও, চোখ খোল। হরিহর আসিয়াছে। তাহার আহারের ব্যবস্থা কর।"

তথাপি মা উত্তর করিলেন না। চক্ষু অর্দ্ধাবৃত করিয়া ধীরে ধীরে তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মায়ের এই ভাব দেখিয়া আমি হভভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। পিতা আমাকে বলিলেন—"যা হরিহর, তোর গর্ভধারিণীর সঙ্গে যা; বল্, আমাকে খেতে দাও।" আমি বলিলাম—"কি হইয়াছে বাবা?"

"কিছু হয় নাই। তোর ঠাকুর-মা কি বলিয়াছে। সেই জন্য ওঁর দুঃখ হইয়াছে।"

"আমি ঠাকুরমাকে বকিব?"

"না না, তোকে কিছু বলিতে হইবে না। তুই ওঁর সঙ্গে যা।"

আমি পিতার আদেশমত মাতার অনুসরণে যাইতেছি, এমন সময় তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ্ হরিহর! তোর ঠাকুরমা যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করে,—আমাদের সম্বন্ধে কোন কথা—তুই বল্‌বি আমি জানি না। যদি কোন উপদেশ দেয়, ত সে কথা কাণেও তুলিস্ নি। ওরা সেই পূর্ব্বকালের অসভ্য, লেখাপড়া কিছু জানে না। তুই কালে লেখাপড়া শিখিয়া পণ্ডিত হইবি, আমার মত হাকিম হইবি। ও বুড়ীর কথা শুনিলে কিছুই হইতে পারিবি না। কেবল তোর গর্ভধারিণী তোকে যা উপদেশ দিবে, সেইমত কার্য্য করিবি। তোর ঠাকুরমার অমূল্য উপদেশ শুনিলে তোর দুঃখে শিয়াল-কুকুর কাঁদিবে। যা—শিগ্‌গির যা। উনি কোথায় গেলেন, দেখিয়া আয়। তাঁহাকে ধরিয়া রান্নাঘরে লইয়া যা।"

আমি ঘরের বাহির হইয়া দেখিলাম, মা আগে হইতেই রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। সেখানে গিয়া দেখি, মায়ের পরিবর্ত্তে ঠানদিদি রাঁধিতেছেন। আর মা রন্ধনের পরিবর্ত্তে অঞ্চলে নাসিকা-হুঙ্কার পরিত্যাগ করিতেছেন।

তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ঠানদিদি চুল্লী পশ্চাতে রাখিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিলেন, এবং বলিয়া উঠিলেন—"কি হ'ল বৌমা ?"

এমন সময়ে আমি উপস্থিত। মা চক্ষু অঞ্চলমুক্ত করিয়া বলিলেন—"পরে বলিব।" মায়ের মুখে না জানি কত ঝুড়ি দুঃখের চিহ্নই চাপানো রহিয়াছে! কিন্তু ও মা! তা নয়! মায়ের অন্তরের আনন্দ-উৎসব অধরপ্রান্ত দিয়া বাহির হইবার জন্য যেন যুদ্ধ করিতেছে। ঠানদিদিও তাহা দেখিলেন। দুইজনের চোখে চোখে কি ইঙ্গিত হইল। তিনি আবার রাঁধিতে লাগিলেন। আমি তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আহারে বসিলাম।

বালকের চক্ষু পাখীর চক্ষুর সঙ্গে তুলনীয়। আহারান্তে দেখি, পিতামহী তখনও আহ্নিকে নিযুক্ত রহিয়াছেন। আমি তাঁহার উঠিবার অপেক্ষা না করিয়াই শয্যায় শয়ন করিলাম। শয়নের সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রাভিভূত হইলাম।

আমি পিতামহীর ঘরেই শুইতাম। শুধু শুইতাম কেন, আহারাদি যাবতীয় ব্যাপার আমার পিতামহীর নিকটেই নিষ্পন্ন হইত। মা শুধু গর্ভে ধরিয়াছিলেন। আমার লালন-পালনের ভার পিতামহীর উপরেই পড়িয়াছিল। শিশুর উৎপাত-অত্যাচার যা কিছু একমাত্র পিতামহীই সহ্য করিয়াছিলেন। মায়ের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দু'চারিটা কথাবার্ত্তা ছাড়া আমার অন্য কোনও সম্বন্ধ ছিল না।

সেই পিতামহীর সম্বন্ধে পিতার মত-প্রকাশে বালকের মন যতটা ব্যাকুল হইবার হইয়াছিল। পিতার কথায় ও মাতার পূর্ব্বোক্তভাবে অবস্থিতিতে কি বুঝিয়াছিলাম, জানি না। কিন্তু মনের অন্তরালে চিরাবস্থিত

রহিয়া, যিনি বালক-বৃদ্ধকে এক করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি বোধ হয় সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মন, সমস্ত ঠিক বুঝিতে না পারিলেও, তাঁহার অঙ্গুলিস্পর্শে যেন মাঝে মাঝে উত্তেজিত হইতেছিল।

আমি পিতামহীর আহ্নিকাদি শেষ হইবার পূর্ব্বেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম,জানি না, রাত্রিও কত হইয়াছে, বলিতে পারি না। সহসা কি জানি কেন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চাহিয়া দেখি, পিতামহী একটি দীপ আমার মুখের কাছে ধরিয়া আমার মাথার শিয়রে তক্তপোষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছেন।

শয্যায় মূত্রত্যাগ আমার রোগ ছিল বলিয়া পিতামহী প্রতিদিন মধ্যরাত্রে আমাকে ঘুম হইতে উঠাইতেন। কিন্তু উঠাইতে তাঁহাকে যে কষ্ট পাইতে হইত, তাহা আর আপনাদের কি বলিব? প্রথম প্রথম তিনি আমার নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষা রাখিতেন না। ঘুমন্ত আমাকে কাঁধে তুলিয়া বাহিরে লইয়া যাইতেন। কিন্তু ইদানীং আমিও কিছু ডাগর হইয়াছি, তিনিও অধিকতর বৃদ্ধ হইয়াছেন। বিশেষতঃ পিতামহের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ এতই কৃশ হইয়াছে যে, এক বৎসর যে তাঁহাকে দেখে নাই, সে এখন ঠাকুরমাকে চিনিতে পারিবে না।

সুতরাং ইদানীং আমার ঘুম ভাঙ্গাইতে তাঁহাকে অনেক পদাঘাত ও মুষ্টিপ্রহার সহ্য করিতে হইত। তথাপি তিনি আমাকে না উঠাইয়া ছাড়িতেন না। আজিও বোধ হয়, তিনি সেইরূপ করিতে আমার মাথার শিয়রে দাঁড়াইয়াছিলেন।

কিন্তু আজ আর ঠাকুরমাকে উঠাইতে হইল না। আমার মুখের কাছে আলো ধরিতে না ধরিতে আমি জাগিয়াছি। জাগিয়াই বুঝিলাম,

আমাকে কি করিতে হইবে। বুঝিবামাত্র শয্যা পরিত্যাগ করিলাম।

শয্যা পুনর্গ্রহণের সময় ঠাকুরমা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ রে ভাই, তোর বাপ মা কি তোকে কোন তিরস্কার করিয়াছে?"

পিতা-মাতার কথা দূরে থাক্, তাঁদের স্মৃতি পর্য্যন্ত আমার ঘুমচাপা পড়িয়াছিল। পিতামহী জিজ্ঞাসা করিতে মনে পড়িল। আমি উত্তর করিলাম —"না ঠাকুরমা, আমাকে বাবা মা কিছু বলেন নাই।"

"আমাকে বলিয়াছে? তা বলুক। তাহাতে আমার কোন দুঃখ নাই। তবে তোমাকে কিছু বলিলে আমার কষ্ট হইবে। কেন না, আমার কাছেই তোমার ভালমন্দ যা কিছু শিক্ষা। তোমার বাপ মা তোমাকে বড় একটা দেখে নাই।"

এই বলিয়াই পিতামহী চুপ করিলেন, এবং আমার কাছে বসিয়া আমার মাথায় গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। আমার বোধ হইল, ঠাকুর-মার মনে যেন বড়ই একটা কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। মনে হইল যেন, একটা নিশ্বাস-তরঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া আমার কপোল স্পর্শ করিতেছে।

আমি বলিলাম—"কই, মা, বাবা তোকে বকিয়াছে, এ কথা ত তোকে বলি নাই!"

"তুমি বলিবে কেন? আমি জানিতে পারিয়াছি। তোমার ঘুমন্ত মুখ দেখিয়া জানিয়াছি। তুমি আপনা আপনি জাগিতে, তাহা বুঝিয়াছি। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, তোমার বাপ তোমাকে তিরস্কার করিয়াছে। যাহোক ভাই, তোমার দাদার স্বর্গে যাওয়ার পর আমি ভাবিয়াছিলাম, আমার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে, এসংসারে এমন আর কেহ রহিল না। এখন দেখিলাম

আছে। তুমি আমার সর্ব্বস্ব। আমার দুঃখে দুঃখী হইতে আমার অঞ্চলের নিধি তুমি রহিয়াছ।"

"দেখ্ মা, তোকে কেউ কিছু বলিলে আমার বড় কষ্ট হয়।"

"তবে আর আমার কিসের দুঃখ! কিন্তু ভাই, দেখ, যেন কখনও কোনও কারণে পিতামাতার প্রতি অভক্তি দেখাইও না। তা করিলে ভবিষ্যতে তোমার ভাল হইবে। কখনও দুঃখ পাইতে হইবে না। পিতামাতার মত গুরু আর নাই।'

আমি শৈশবে ঠাকুরমাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতাম। বাবা যা বলিতেন, মা যা বলিতেন, আমি তাই শুনিয়াই ওই কথা বলিতে শিখিয়াছিলাম। আর পিতামহীর সম্বোধনের অনুকরণে মাকে 'বৌমা' বলিতাম। বৎসর থানেক হইতে মা ও বাবা উভয়েই আমার এই সম্বোধনের বিরুদ্ধে খড়্গাহস্ত হইয়াছিলেন। প্রথমে অনুনয়, তাহার পর আদেশ, শেষে এই কদভ্যাস দূর করিতে তাঁহারা আমাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছেন।

পিতামহীও আমাকে নিষেধ করিতেন। সকলের পীড়াপীড়িতে অভ্যাসটা অনেক পরিমাণে দুর হইয়াছে বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে পিতামহীর অগাধ স্নেহে আত্মহারা হইয়া, তাঁহাকে ঠাকুরমা বলিতে ভুলিয়া যাই। আজ ভুলিয়াছি। অন্য সময়ে ভুলিলে পিতামহী তৎক্ষণাৎ ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতেন। কিন্তু আজ কি জানি কেন, তিনি তাহা করিলেন না। সুতরাং মনের আবেগে আমি তাঁহাকে বারংবার মাতৃ সম্বোধন করিলাম। এবং তাঁহার মমতার্দ্র কোমল স্নিগ্ধ করকমল-স্পর্শ-সুখ অনুভব করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

(৮)

পরদিন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই শুনিলাম, আমার পিতা হাকিম হইয়াছেন। পিতামাতার মুখে শুনি নাই—তাঁহারা তখনও পর্য্যন্ত ঘুম হইতে উঠেন নাই। পিতামহীও আমাকে বলেন নাই। আমার ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই তিনি শয্যাত্যাগ করিয়াছেন। শুনিলাম, ঠানদিদির মুখে।

আমি ঘরের দাওয়ায় বসিয়া চোখ দু'টা হস্তদ্বারা মার্জ্জিত করিতেছিলাম। চোখে তখনও পর্য্যন্ত ঘুমের ঘোর ছিল। সহসা ঠানদিদির কথার মত কথায় চমকিয়া উঠিলাম। চোখ মেলিয়া দেখি, সত্য সত্যই ঠানদিদি! অত প্রত্যূষে তাঁহাকে কখন আমাদের বাড়ীতে আসিতে দেখি নাই। আজ প্রথম দেখিলাম।

ঠানদিদি বলিতেছিলেন—"কি রে ভাই, সকালে এক চোখ দেখাইতেছিস্ কেন? আমার সঙ্গে কি ঝগড়া করিবি? তা ভাই, তোর সঙ্গে ঝগড়া হইলে বুড়ো ঠানদিদিরই বিপদ্। তোর বাপ হাকিম। সে ত আর তোর ঠানদিদি বলিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিবে না। একেবারে গ্রেপ্‌তার করিয়া জিঞ্জিরে পাঠাইয়া দিবে। দে ভাই দু'চোখে হাত দে।"

আমি চক্ষু হইতে হাত অপসারিত করিয়া ঠানদিদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাকিম কি ঠানদিদি?"

"সে কি রে শালা, শুনিস্‌নি?"

"কই না!"

"তোর বাপ, মা, কিংবা ঠাকুরমা, কেউ তোকে কিছু বলে নি?"

"কই, না ত ঠান্‌দি!"

"তা হ'লে দে ভাই, আমাকে কি বক্‌সিস্‌ দিবি দে। আমিই সকলের আগে তোকে এ সুখের সমাচার শুনাইলাম।"

"হাকিম কি ঠান্‌দি?"

"তা ভাই আমি জানি না। সে তোর বাপ্‌ কিংবা মাকে জিজ্ঞাসা করিস্‌। আমি ভাই তোমার গরীব ঠান্‌দিদি। চরকায় পৈতার সূতো ভেঙে দিন চালাই। হাকিম যে কি, তা আমি কেমন করিয়া বলিব!"

এই সময় মা দ্বার খুলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ঠানদিদি বলিলেন—"বৌমা! তোমার ছেলেকে হাকিম কি বুঝাইয়া দাও। সে, বেছে বেছে তোমার চরকা-ভাঙ্গা খুড়শ্বাশুড়ীকে হাকিম বোঝাবার লোক ধরিয়াছে। দারগা হইলেও না হয় কতক মতক বুঝাইতে পারিতাম।"

"মাতা ঠানদিদির এ কথাতে কোনও উত্তর না দিয়া বলিলেন—"ঠাকুরপোকে বলিয়াছ?"

"আর বলাবলি কি! সে ত তোমাদেরই। তাহাকে যখন যা' হুকুম করিবে, সে তাই করিবে। সে কি 'না' বলিতে পারে! তোমার হরিহরও যেমন, সেও তেমন। খাইতে না পাইলে, তার খাওয়া-পরার ভার তোমাদেরই লইতে হইবে।"

"বেশ, তা'হলে এখানে যদি তার কোন কাজকর্ম্ম সারিবার থাকে, সারিয়া লইতে বল। বাবু বোধ হয় কালই এখান হইতে রওনা হইবেন।"

"কাজকর্ম্ম সারিবার তার আর কি আছে। খায়, ঘুমায়—আর

তাসপাশা খেলিয়া দিন কাটায়। এইবারে তোমাদের কৃপা পাইয়া যদি সে মানুষ হয়।"

"বাবুর মন জোগাইয়া চলিতে পারিলে হইবে বই কি। বাবু ত এখন যে সে লোক ন'ন। ইচ্ছা করলে রাজাকে ধ'রে জেলে দিতে পারেন।"

"বল কি বৌমা, অঘোরনাথ আমাদের এমন লোক হয়েছে?"

"এখন ও'র কাছে যে সে লোক যখন তখন আর আসিতে পারিবে না। কোম্পানী বাবুকে অট্টালিকার মত বাড়ী দিবে। বাড়ী-ঘেরা বাগান, বাগান-ঘেরা ঝিল, আর ঝিল-ঘেরা আকাশের চেয়েও উঁচু পাঁচিল। সেই পাঁচিলের উপরে শান্ত্রী পাহারা। তাহারা চব্বিশ ঘণ্টাই কেবল তরোয়াল খুলে পাহারা দিতেছে। যে সে লোকের কি আর বাবুর কাছে পৌছিবার যো থাকিবে!"

"সে কি বৌমা, তা'হলে কি অঘোরনাথকে কোম্পানী কয়েদ করিয়া রাখিবে?"

এই কথা শুনিয়া মা হাসিয়া উঠিলেন। ঠানদিদি তাই শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—"হাসিয়ো না বৌমা, আমি মূর্খ স্ত্রীলোক। তুমি কি বলিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না। আমার মূর্খ ছেলেটাকে অঘোরনাথ সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিতেছে বলিয়াই বলিতেছি। তোমার বাবুই যদি কয়েদ হয়, তাহ'লে সে মূর্খটাকে কি কোম্পানী অমনি ছেড়ে দিবে?"

এই কথা শুনিবামাত্র মায়ের হাসি দ্বিগুণ সুরে চড়িয়া উঠিল। মা বলিলেন—"কয়েদ! আমার সোয়ামীকে কয়েদ দিতে পারে, এমন লোক কি আর ভারতে আছে! তিনিই কত লোককে যে কয়েদ দিবেন, তার ঠিক কি!"

"কেন মা, অঘোরনাথ তাদের কয়েদ দিবে কেন ?"

"কেন, এ কথা বলা বড় শক্ত। আর বলিলেও তুমি বড় বুঝিবে না। ওঁর চাকরীই হচ্ছে কেবল কয়েদ দিবার জন্য।"

"তাই বল ! অঘোরনাথ তা'হলে দারগা হইয়াছে !"

"যাও যাও—তুমি বুঝিবে না, খুড়ীমা ! দারগা বাবুকে দেখিলে ভয়ে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিবে। দূর হইতে তাঁহাকে সেলাম করিবে। বাবুর কি চাকরী, তা তুমি কেন, এ গ্রামে এমন কেউ নেই যে, বুঝিতে পারে। আমার বাবা হাকিমের পেস্‌কারী করে। তাঁরই ভয়ে বাঘে গরুতে জল খায়। লাট সাহেব কাকে বলে, শুনেছ কি খুড়ীমা ?"

ঠানদিদি মাথাটা একেবারে কটিদেশের নিকট পর্য্যন্ত হেলাইয়া, বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে বলিয়া উঠিলেন—"ও ! তাই বল্ না বউমা ! অঘোর আমার লাট হইয়াছে !"

মাতা ঈষৎ স্মিতমুখে বলিলেন—"একেবারে ততটা নয়। লাট ত আর বাঙ্গালীর হইবার যো নাই। তবে অনেকটা সেই রকম। লাট-সাহেব হচ্ছে মুলুকের লাট। আমাদের বাবু হবেন, জেলার লাট।"

এই কথা শুনিবামাত্র ঠানদিদির চক্ষু একেবারে কপালে উঠিয়া গেল। মুখ ব্যাদিত হইল ! তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া মা বলিলেন—"আমাকে কি বাবা এই অসভ্য জঙ্গলীদের দেশে বিবাহ দিতেন ! বাবুর ঠিকুজী দেখিয়া তিনি জানিয়াছিলেন, তিনি কালে হাকিম হইবেন ! তাই তিনি ইঁহাদের বাড়ীতে আমার বিবাহ দিয়াছেন।"

ঠানদিদি এতক্ষণে যেন সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া মাকে, বাবাকে ও আমাকে যত পারিলেন, আশীর্ব্বাদ করিলেন। বাবা ও আমি

তাঁহার মাথার কেশ-প্রমাণ পরমায়ু লাভ করিলাম। মা তাঁহার ভবিষ্যতের শুভ্রমস্তকে সিন্দুর ধারণের অধিকার পাইলেন। আশীর্ব্বাদান্তে তিনি বলিলেন—"তা এ চাকরী আমাদের এ জঙলা দেশের লোক কেমন করিয়া বুঝিবে! বাঙ্গালী এদেশে সর্ব্বপ্রথম এই চাকরী পাইয়াছে। ভোগ কর মা—ভোগ কর। স্বামি-পুত্র লইয়া, নাতিপুতি লইয়া, তুমি মনের মতন সুখভোগ কর। তবে মা, তোমার গরীব দেওরটিকে কৃপা-নয়নে দেখিয়ো। তা হ'লেই আমি ধন্য হইব।"

মা ঠানদিদিকে ধন্য করিবার আশ্বাসটা না দিয়া বলিলেন—"অসভ্য জঙলার দেশ না হইলে, মা কখন সন্তানের সুখে ঈর্ষা করে?"

ঠানদিদি এ কথার উত্তর দিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে পিতামহী বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মা ও ঠানদিদি তাঁহার আগমন আগে হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন। বাটীর অঙ্গনে প্রবেশমাত্র তাঁহারা পরস্পরের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া কথোপকথন বন্ধ করিয়া দিলেন।

ঠাকুরমা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই মাকে বলিলেন—"অঘোর-নাথকে ঘুম হইতে তুলিয়া দাও, তাহাকে বল, বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে অনেক লোক তার সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষা করিতেছে।" এই বলিয়া পিতামহী তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমি সেই ঘরের দাওয়াতেই বসিয়া-ছিলাম। তিনি আমাকে দেখিলেন না, কি দেখিতে পাইলেন না, সেটা আমি বুঝিতে পারিলাম না। কেননা, তিনি আমার সঙ্গে কোনও কথা কহিলেন না।

ঠাকুরমার সঙ্গে আমার কথা কহিবার প্রয়োজন ছিল। মা ও ঠান-দিদির কথোপকথন শুনিয়া আমি কতকটা হতভম্বের মত হইয়াছিলাম।

তাঁহাদের অনেক কথা জানিবার আমার প্রয়োজন হইয়াছিল। সমস্ত কথা ভালরূপ বুঝি নাই। মায়ের কাছে বুঝিতে চাহিলে তিরস্কার মাত্র লাভ হইবে। তিনি যে আমাকে কিছু বুঝাইয়া বলিবেন, এটা আমার বিশ্বাস ছিল না। বাবাকে ভয় করিতাম। তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এ সব কথা কহিতে আমার সাহস নাই। ঠানদিদি নিজেই বুঝিতে অপারগ। তখন সে আমাকে কি বুঝাইবে! 'তা' হইলে একমাত্র ঠাকুরমা ভিন্ন আর কাকে সুধাইব ?

কিন্তু ঠাকুরমা আমার সঙ্গে কথা কহিল না! হঠাৎ কি জানি, কেন মনে একটা দুঃখ উপস্থিত হইল। ঠাকুরমা দোষী কি না, বিচার করিবার আমার অবকাশ হইল না। আপনা আপনি তাঁহার উপরে আমার অভিমান জাগিল। আমি আর ঠাকুরমাকে না ডাকিয়া উঠিলাম। বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে কাহারা আসিয়াছে, মনে করিলাম, তাহাদের একবার দেখিয়া আসি। ইহার পূর্ব্বে পিতার আগমনে তাহারা ত কই আসিত না। কিন্তু আজ আসিয়াছে। এক আধ জন নয়। পিতামহী বলিলেন, অনেক। বাবা হাকিম হইয়াছেন বলিয়াই তাহারা বাবাকে দেখিতে আসিয়াছে। আমি চণ্ডীমণ্ডপে যাইবার জন্য দাঁড়াইলাম।

পিতামহী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র মা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"দেখিলে খুড়ীমা ব্যাপারটা!"

ঠানদিদি উত্তর করিলেন—"দেখিতে ত পাচ্ছি মা। কার মন কি, কেমন করিয়া বুঝিব! ছেলের সুখে মা ঈর্ষা করে, এ ত কোনও কালে শুনি নাই। সত্যকথা বলিতে কি মা, আমার ছেলের যদি আজ এ অবস্থা হইত, আমি দু বাহু তুলে নাচিতাম। আর শত দেবতার দ্বারে

মাথা খুঁড়িয়া কপাল ঢিপি করিয়া ফেলিতাম। ছেলেটাকে একটু বেশি রকমের ভালবাসি বলিয়া অমনি অমনি ত পাড়ার পোড়া লোক কত কথা বলে। দশ মাস দশদিন গর্ভে-ধরা, কত কষ্টে মানুষ-করা ছেলে—সে সুখী হবে, এর চেয়ে মায়ের সুখ আর কি আছে! না মা—আমরা গরীব—আমরা বড় মেজাজের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না।"

এই সময় পিতা গৃহত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। মা ও ঠানদিদির কথোপকথন বন্ধ হইল। ঠানদিদির পুত্রকে প্রস্তুত থাকিবার উপদেশ দিয়া মা তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তিনি চলিয়া গেলে, মা পিতাকে বাহিরে জনাগমের সংবাদ দিলেন। পিতা তাড়াতাড়ি মুখে জল দিয়া বাহিরে চলিলেন। মাতা গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

আমিও পিতার অনুসরণে বাহিরে যাইতেছিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "কই হরিহর, এখনও বই লইয়া পড়িতে ব'স নাই?"

আমার অবস্থাই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে। তবু আমি তাঁহাকে বলিলাম—"পণ্ডিত ম'শাই এখনও আসেন নাই।"

"এখনও বৈকুণ্ঠ আসে নাই? মাসে মাসে মাহিনা লইবার ত খুব তাড়া আছে। কিন্তু পড়ায় সে কতক্ষণ? কাজে ফাঁকি দেয়, সেই জন্যই হতভাগ্যের উন্নতি হয় না।"

পিতা বৈকুণ্ঠ পণ্ডিতকে উপলক্ষ্য করিয়া আরও দুই চারিটা উপদেশ দিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় মাতা ঘর হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বলিতেছ?"

"বৈকুণ্ঠ কত বেলায় পড়াতে আসে? তুমি তাহাকে কিছু বল না, না?"

"কি বলিব? সে যেমন সময় আসিবার, প্রতিদিনই তেমনি সময়ে আসে। আজই কেবল আসে নাই। বোধ হয়, সে আর আসিবে না।"

"কেন?"

"কেন আমি জানি না। জানিতে হয়, নিজে তার কাছে গিয়া জানিয়া আইস।"

এই উষ্মাযুক্ত ঈষৎউচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত মাতৃবাক্য শুনিবামাত্র পিতা চুপ করিলেন। এই সময়ে পিতামহী গৃহ হইতে বাহির হইয়াই বলিলেন—"কখন আসেনি মা, এরূপ সময়ে বৈকুণ্ঠ কখন আসেনি। আজ তুমি ভুলে একটু সকালে উঠে পড়েছ, তাই তাকে দেখিতে পাও নাই।"

মাতা। ভুলে উঠিয়াছি কি রকম? ঠেস না দিয়া কি কথা কহিতে জান না?

পিতামহী। ঠেস কাকে দিব? আর দিবার প্রয়োজন কি? সত্য-কথা বলিব। তাতে কাকে ভয় করিয়া বলিব? নিত্য যে সময়ে উঠ, সেই সময়ে উঠিলেই বৈকুণ্ঠকে দেখিতে পাইতে। সে তোমার ঘুম ভাঙ্গি-বার সময় জানে।

পিতা তখন অনুচ্চকণ্ঠে উভয়কে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"কি কর—কি কর! বাহিরে ভদ্রলোক সকল আসিয়াছে। এখনি আমার মান-সম্ভ্রম সব নষ্ট হইবে।"

মাতা একটু বিশেষ রকমের রুক্ষস্বরে পিতাকে বলিয়া উঠিলেন,—"আজই যদি তুমি আমাকে কলিকাতা লইয়া না যাও, তাহ'লে তোমার অতি বড় দিব্য রহিল।"

পিতা কেবল হস্ত-সঞ্চালনে ও ইঙ্গিতে মাতাকে চুপ করিতে অনুরোধ

করিলেন। কে সে অনুরোধ শুনে! মা ইঙ্গিতে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"যদি না নিয়ে যাও, তা হ'লে আমি এ বাটীতে জলগ্রহণ করিব না।"

পিতার ইঙ্গিতমাত্র অবলম্বন। তিনি তারই সাহায্যে মাকে যথাসাধ্য নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিয়া এবং বৈকুণ্ঠ-পণ্ডিতকে ডাকিয়া আনিতে আমার উপর আদেশ দিয়া, বাটীর বাহিরে চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটী হইতে বাহির হইলাম। ভিতরে মা ও পিতামহীতে আর কোনও বাগ্‌বিতণ্ডা হইল কি না, জানিতে পারিলাম না।

সেইদিনেই থানার দারোগার হাতে পিতার নিয়োগপত্র আসিল। আমাদের দেশে এরূপ চাকরীর কথা লোকে বড় একটা শুনে নাই। সুতরাং পিতাকে দেখিবার জন্য গ্রাম ও গ্রামান্তর হইতে নরনারী আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

(৯)

বাড়ীর ভিতরে স্ত্রীলোক ও বাড়ীর বাহিরে পুরুষ-জনসমাগমে আর কোলাহলে সমস্ত দিনটাই প্রায় কাটিয়া গেল। মা, পিতা, পিতামহী—কেহ কাহারও সহিত কথা কহিবার অবকাশ পর্য্যন্ত পাইলেন না। আমিও স্কুলে যাওয়া, অথবা পড়াশুনা, কিছুই সেদিন করিতে পারি নাই। সে দিন শনিবার। স্কুলে না গেলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া পিতা আমার না যাওয়াতে কোন আপত্তি করিলেন না। আমাকে বাড়ীতে রহিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আনন্দভোগের অবসর দিলেন।

আর এ দেশের স্কুলে যাইয়া বা কি করিব? ঠিক বুঝিয়াছি, দুই

চারিদিনের মধ্যেই আমাকে স্কুল ছাড়িয়া পিতার অনুগামী হইতে হইবে। মাও তাই মনে করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার প্রাতঃকালের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া বুঝিলাম, তিনি আর একদিনের জন্যও এবাটীতে থাকিতে ইচ্ছুক নহেন।

কিন্তু মায়ের প্রতিজ্ঞা রহিল না। বেলা এগারটা না বাজিতে বাজিতেই ঠানদিদির ও পিতার সাগ্রহ অনুরোধে তিনি জলও গ্রহণ করিলেন, অন্নও গ্রহণ করিলেন। কেবল রন্ধনটাই নিজে করিলেন না। পূর্ব্ব দিন হইতে রন্ধনকার্য্যের ভার ঠানদিদিই গ্রহণ করিয়াছেন। পিতামহী মাকে অনুরোধও করেন নাই, মা আহার করিলেন কিনা দেখেনও নাই।

সন্ধ্যার কিছু পরে, পিতা পিতামহীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। পিতামহী তখন সবেমাত্র আহ্নিক সমাপন করিয়াছেন। আমিও আহার শেষ করিয়া তাঁহার ঘরে সবেমাত্র প্রবেশ করিয়াছি। আমি ঘরের মধ্যে নিজের বিছানায় শয়ন করিলাম। বাবা ও ঠাকুরমাতে কি কথা হয়, শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, তাহাদের ভিতরে মায়ের সম্বন্ধ লইয়াই কথাবার্ত্তা হইবে। কেন না, প্রাতঃকালের সেই বচসার পর উভয়ের মধ্যে আর কোনও কথাবার্ত্তা হয় নাই। পিতাও পিতামহীর কাছে সে সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করেন নাই, অথবা প্রকাশ করিবার অবকাশ পান নাই। এমন সুখের দিনে আমার উভয় গুরুজনের মধ্যে মনোমালিন্য আমার পক্ষে বড়ই কষ্টের কারণ হইয়াছিল। বাস্তবিক বলিতে গেলে আমি সারাদিন সুখেও সুখ পাই নাই। এখন আমি আগ্রহ সহকারে পিতার সাহায্যে উভয়ের মধ্যে পুনর্মিলন প্রার্থনা করিতেছিলাম।

কিন্তু পিতা পিতামহীর কাছে মায়ের কথা আদৌ উত্থাপিত করিলেন না। তিনি প্রথমেই পিতামহীর কাছে কথোপকথনের অনুমতি গ্রহণ করিলেন। বলিলেন—"মা! তোমার আহ্নিক শেষ হইয়াছে?"

ঠাকুরমা বলিলেন—"কি বলিতে চাও, বলিতে পার।"

"আমাকে কিছু টাকা যে দিতে হইবে।"

পিতার এই কথায় পিতামহীর কোনও উত্তর শুনিতে পাইলাম না। অনেকক্ষণ কান পাতিয়া রহিলাম, তবু শুনিতে পাইলাম না।

কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া পিতা আবার বলিতে লাগিলেন—"নূতন চাকরীস্থানে যাইতে হইবে, চাকরীর উপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদ কিনিতে হইবে। টাকার বিশেষ প্রয়োজন পড়িয়াছে।"

পিতামহী এইবার বলিলেন,—"কেন, টাকা ত তোমার কাছে আছে।"

"কই, কোথায় টাকা? টাকা থাকিলে তোমার কাছে চাহিব কেন?"

"তুমি ত গত মাসের মাহিনা আমায় দাও নাই।"

পিতা এই কথা শুনিয়াই হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"সে টাকা? সে কি আছে তা তোমাকে দিব!"

"কিসে সে টাকা খরচ হইল?"

"এত বড় একটা শ্রাদ্ধের হাঙ্গাম গেল। কিসে খরচ হইল, তা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়।"

"শ্রাদ্ধের খরচ তোমাকে কি করিতে হইয়াছে?"

"কি হইয়াছে তা তোমাকে কি বলিব? আমি কি হিসাব রাখিয়াছি? আর সে কত টাকা? সামান্য ষাট টাকা বই নয়। এই চাকুরী

যোগাড় করিতে কত অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে, তা কি তুমি জান ? আজই চৌকিদারকে দুই টাকা বক্‌সিস দিতে হইল। যাট টাকা, সে কোন্ কালে ধূলোর মত উড়িয়া গিয়াছে। আমাকে আজই টাকা না দিলে চলিবে না।"

"কত টাকা ?

"অন্ততঃ পাঁচ শো।

"বল কি! এত টাকা!

"এ আর এত কি! যে চাকরী পাইয়াছি, তাহাতে এ আমার এক মাসের আয় বই ত নয়।"

"তা হলে এত টাকা লইবার প্রয়োজন কি ?

"কিন্তু ছয়মাস আমি পঞ্চাশ টাকার বেশী পাইব না। এই ছয়-মাস আমায় শিক্ষা নবীশী করিতে হইবে। এই ছয়-মাসে জলপানিস্বরূপ গভর্ণ-মেণ্ট আমাকে মাসে পঞ্চাশ টাকা দিবেন। কিন্তু সাধারণ লোকে ত তা বুঝিবে না। তাহারা আমাকে হাকিম বলিয়াই জানিবে। হাকিমের মর্য্যাদায় থাকিতে হইলে এই ছয়মাসে অন্ততঃ হাজার টাকা খরচ হইবে। পাঁচশো টাকা ঘর হইতে লইব, পাঁচশো টাকা মাহিনা থেকে খরচ করিব।"

"অত টাকা ত আমি দিতে পারিব না। আমার নিজের বলিবার কুড়ি গণ্ডা টাকা আছে, তাই তোমাকে দিতে পারি।"

"সে কি! এত টাকা পিতা উপার্জ্জন করিলেন, আমি উপার্জ্জন করি-লাম—তোমার হাতে টাকা নাই! এ তুমি কি বল্‌ছ মা ?"

"তা মা কি বলিবে ? টাকা উপার্জ্জন করিয়া তুমি কি মায়ের হাতে দিয়াছ—না কর্ত্তাই তাঁর উপার্জ্জনের টাকা আমাকে কখন দিয়াছেন ?

তোমাদের উপার্জ্জনের কথা আমি শুনিয়াছি মাত্র। চোখে কখনও দেখি নাই।"

"মৃত্যুকালেও কি টাকার কথা তিনি ব'লে যান নি?"

"কিছু না। হৃদ্‌রোগে মৃত্যু। কথা বলিবার সময় পান নাই।"

কিছুক্ষণের জন্য আবার উভয়ে নিস্তব্ধ হইলেন। বাবা কি করিতেছেন, দেখিতে আমার বড় কৌতূহল হইল। আমি ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিলাম। পা টিপিয়া টিপিয়া দ্বারের কাছে উপস্থিত হইলাম। উঁকি দিয়া দেখি, পিতা মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন। আর পিতামহী তাঁহার সম্মুখে বসিয়া উর্দ্ধনেত্রে ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতেছেন। আমি প্রায়ই তাঁহাকে এইরূপ করিতে দেখি বলিয়াই বুঝিতে পারিলাম। আহ্নিকের সময় কেবল তিনি কাহারও সঙ্গে কথা কহিতেন না। আহ্নিকান্তে যখন তিনি জপে বসিতেন, তখন তিনি, প্রয়োজন হইলে লোকের সঙ্গে কথাও কহিতেন।

অনেকক্ষণ তদবস্থায় থাকিয়া পিতা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—"মা, এরূপ করিয়া সন্তানের মাথায় বজ্র হানিয়ো না। টাকা তোমার কাছে আছে নিশ্চয় জানিয়া, আমি তোমার কাছে আসিয়াছি।"

পিতামহী আবার নীরব রহিলেন। এখন বুঝিতেছি, এ কঠোর বাক্যের উত্তর দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাঁহার মনে কি হইতেছিল, তিনিই বলিতে পারেন, কিন্তু একটি কথাও তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

পিতা উত্তরের প্রতীক্ষায় পিতামহীর মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া আবার বলিলেন—"কি বল?"

পিতামহী। কি বলিব! এই ত বলিলাম, কুড়ি গণ্ডা টাকা লইতে চাও, দিতে পারি। ইহার অধিক চাহিলে কেমন করিয়া দিব ?

পিতা। তোমার হাতে আর কিছু নাই ?

পিতামহী। কিছু নাই, এ মালা হাতে করিয়া কেমন করিয়া বলিব ? আরও দুই চারি টাকা থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা একত্র করিলেও তোমার পাঁচশো হইবে না!

পিতা। তা হ'লে তুমি কি আমাকে বুঝিতে বল, পিতা এই এতকাল কেবল চিনির বলদের মত বৃথা পরিশ্রম করিয়াছেন, এক পয়সাও উপার্জ্জন করেন নাই ?

পিতামহী। উপার্জ্জন করেন নাই ত, এত বিষয় আশয় কোথা থেকে হইল? তোমাদের কি ছিল? তবে, কি তিনি উপার্জ্জন করিয়াছেন, আমিও কখন জানিতে চাহি নাই, তিনিও আমাকে বলেন নাই। জানিবার মধ্যে একজন কেবল তাঁর নাড়ীনক্ষত্র সমস্ত জানিত। টাকাকড়ি কিছু আছে কি না, তুমি গোবিন্দ ঠাকুরপোকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পার। যদি কিছু থাকে, তাহার কাছেই আছে। না থাকে নাই।

পিতা। আমার বাবার উপার্জ্জন। কি আছে না আছে, আমি তোমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া গোবিন্দ খুড়োকে জিজ্ঞাসা করিব ? মা, তোমার এমনি মতিচ্ছন্ন হইয়াছে!

পিতামহী। ও কি বলিতেছ অঘোরনাথ!

পিতা। আর না বলিয়া কি বলিব! আমি দেবতার দুষ্প্রাপ্য চাকরী শুধু তোমার জন্য পাইয়াও পাইলাম না। তোমার হাতে টাকা থাকিতেও তুমি বউএর উপর ঈর্ষায় আমাকে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিতেছ।

পিতামহী। ঈর্ষা করিবার লোক না পাইলে, এ ছাড়া আর কি করিব অঘোরনাথ? তুমি একমাত্র পুত্র। তাঁহার কাছে দুই এক পয়সা চাহিলে তিনি তোমার দোহাই দিয়া আমাকে নিরস্ত করিতেন। বলিতেন—"ইহার পরে অঘোরনাথ তোমাকে কি খেতে দিবে না বলিয়া, আগে হইতে বৈধব্যের সম্বল করিতেছ? ভয় নাই। রত্ন গর্ভে ধরিয়াছ। যখন অর্থের প্রয়োজন হইবে,তাহারই কাছে পাইবে। কখনও সে তোমাকে অভাবে রাখিবে না।" তিনি দুই দিন মাত্র স্বর্গে গিয়াছেন। ইহারই মধ্যে তোমার কাছে যা পাইলাম! ইহার পরে আরও না জানি কি পাইব, ভাবিয়া আমার অন্তঃকরণ কাঁপিয়া উঠিতেছে।

পিতা। তা আমি কি মূর্খ যে, তোমার এই অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিব? বুঝিব, তোমার হাতে কিছু নাই? যদি কিছুই নাই, শ্রাদ্ধের টাকা কেমন করিয়া দিলে?

পিতামহী। শ্রাদ্ধের টাকা কি আমি তোমার হাতে দিয়াছি?

পিতা। গোবিন্দ খুড়া আমার হাতে দিয়াছে। কিন্তু আমি জানি, তিনি তোমার নিকট হইতে সে টাকা লইয়া আমাকে দিয়াছেন।

পিতামহী। না, ঠাকুরপো আমার কাছ থেকে লয় নাই।

পিতা এই কথায় যেন কতকটা সত্যের আভাস পাইলেন। তিনি একটি গভীর হুঙ্কার ত্যাগ করিলেন। তার পর বলিলেন—"ভাল, বিষয়-আশয়ের দলিলপত্র কোথায়? তাও কি তোমার কাছে নাই?"

পিতামহী। আমার কাছে কিছু নাই।

পিতা। তাও কি গোবিন্দ খুড়োর কাছে?

পিতামহী। তোমার কাছে ত তাঁহার বাক্স আছে।

পিতা। তাহাতে ত শুধু একটি সিঁদুর-মাখানো টাকা ছিল। আর কতকগুলা বাজে কবিতাভরা কাগজ।

পিতামহী। ছিল বলিতেছ যে! সে টাকা কি বাহির করিয়া লইয়াছ?

পিতা এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া আমার মাকে ডাকিলেন। "ওগো! একবার এদিকে এসত!"

আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই মা আসিলেন বুঝিতে পারিলাম। কেন না পিতা বলিতে লাগিলেন,—"কি ঘটিয়াছে, বুঝিয়াছ কি?"

পিতামহী আবার বলিলেন—"সে লক্ষ্মীর টাকা কি নষ্ট করিয়াছ?"

পিতার পরিবর্ত্তে মাতা উত্তর করিলেন—"না—সে আমার বাক্‌সে রাখিয়াছি।"

পিতামহী। সেটি আমাকে দিও। তোমরা তাহার মর্য্যাদা রাখিতে পারিবে না।

মাতা সে 'অমূল্যনিধি' পিতামহীকে ফিরাইয়া দিতে অঙ্গীকার করিলেন। তার পর পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ঘটিয়াছে?"

পিতা। সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। এ দিকে হাকিমী পাইয়াছি; ওদিকে ভিতরে ভিতরে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি।

মাতা। সে কি?

পিতা। পিতারই মূর্খতায় হউক কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, তাঁহার সমস্ত উপার্জ্জিত সম্পত্তি পরহস্তগত হইয়াছে।

মাতা। বল কি গো!

পিতা। আর বলিব কি, এখন বুঝিতেছি, আমার কিছু নাই।

মাতা। কি হইল?

পিতা। সমস্ত সম্পত্তি—টাকা-কড়ি, জমী-জিরেত সমস্তই গোবিন্দ-খুড়োর হাতে।

মাতা। তা এ শুভসংবাদ আমাকে দিবার জন্ম এত ব্যাকুল হইয়াছ কেন? এরূপ ঘটিবে, এ কথা ত আগে থাকৃতে কতবার তোমাকে বলিয়াছি! তোমার অগাধ বিশ্বাস। ও কথা তুলিতেই আমাকে মারিতে আসিতে। আমি "ছোটলোকে"র মেয়ে তোমাকে দিবারাত্রি কেবল কুমন্ত্রণাই দিয়া আসিতেছি। ছোটলোকের মেয়েকে এ সব কথা শুনাইবার দরকার কি?

পিতা। এখন ক্রোধ রাখিয়া কি কর্ত্তব্য, তাই বল। আমার মাথা ঘুরিতেছে। একটি কপর্দ্দক পর্য্যন্ত পিতা ঘরে রাখেন নাই। কি যে ছিল, তাহাও জানিবার উপায় নাই। তাই ত! বাবা এত নির্ব্বোধের মত কাজ করিয়াছেন, তাহা ত একদিনের জন্যও বুঝিতে পারি নাই।

মাতা। ঠাকুর নির্ব্বোধ হইতে যাইবেন কেন? নির্ব্বোধ তুমি। তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব একটা মূর্খ বামুনের হাতে দিয়ে গেছেন, এ কথা তুমি বিশ্বাস কর?

পিতামহী। অর্থাৎ তোমার শ্বশুরের মৃত্যুর পরে আমিই টাকা, কড়ি, কাগজপত্র সব গোপনে ঠাকুরপোর কাছে রাখিয়া আসিয়াছি?

মাতা। কি করেছ, না করেছ, তুমি জান আর ভগবান জানেন। তা আমাকে শুনাইয়া বলিতেছ কেন? আমি কি তোমার সম্পত্তির জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া আছি? বলিতে হয়, তোমার ছেলে সম্মুখে আছে তাহাকে বল।

পিতামহী। ছেলে কোথায় তা বলিব। তুমিই ত ছেলের স্থান অধিকার করিয়াছ।

মাতা আবার এই কথার উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, পিতা ঈষৎ উষ্মাসূচক বাক্যে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন এবং পিতামহীর পদ ধারণ করিয়া ঈষৎ ক্রন্দনের ভাবে বলিলেন—"দোহাই মা, আমার এই গৌরবের দিবসে আমাকে পাগল করিও না। কাগজপত্র, টাকাকড়ি সম্বন্ধে যদি কিছু করিয়া থাকত বল।"

"মালা-হাতে আমি মিথ্যা কথা বলি নাই অঘোরনাথ! বাস্তবিক আমি কিছুই জানি না। তিনি আমাকে টাকা-কড়ি সম্বন্ধে কখনও কিছু বলেন নাই। আমিও কখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই।"

পিতা আবার মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। মাতা বলিলেন—"তামা-তুলসীর দিব্য শুনিলে, আর কেন—উঠিয়া এস। মাথায় হাত দিয়া বসিলে কি সম্পত্তি ফিরিয়া আসিবে? সে সমস্ত গিয়াছে।"

পিতা। বল কি! সব গেল?

মাতা। না যাইবে কেন? এখনি তোমার খুড়ো তোমার সমস্ত সম্পত্তি মাথায় বহিয়া দিয়া যাইবে। তোমাকে কোম্পানি কেমন করিয়া হাকিম করিল, বুঝিতে পারিতেছি না। হিসাব নাই, কি আছে কি না আছে, জানা নাই, সে কি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যে, তুমি তাহার কাছে টাকা পাইবার প্রত্যাশা করিতেছ?

ঠিক এমনি সময়ে বহির্ব্বাটীতে শব্দ উঠিল—"অঘোরনাথ ঘরে আছ?"

মুহূর্ত্তে সমস্ত কথা একটা ঘন নিস্তব্ধতার চাপে পড়িয়া যেন নিষ্পেষিত হইয়া গেল।

"অঘোরনাথ !" দ্বিতীয়বারে উচ্চতর স্বরে ডাক পড়িল।

এবার ব্যস্তসমস্তভাবে পিতা দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং মাতাকে একটা আসন আনিতে আদেশ দিয়াই বলিয়া উঠিলেন—'আসুন, খুড়োমহাশয় আসুন।"

কিয়ৎক্ষণ পরেই—স্বহস্তে একটী লণ্ঠন গোবিন্দ ঠাকুরদা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পিতা কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিলেন। পিতামহীর ঘরের দাওয়াতেই তাঁহার বসিবার আসন প্রদত্ত হইল।

পিতামহী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া গোবিন্দ ঠাকুরদা আসনে উপবিষ্ট হইলেন। বসিবার পূর্ব্বে পিতামহীকে তিনি একবার প্রণাম করিয়া লইলেন। বলিলেন, "বউ! আজ সমস্ত দিন তোমাকে দেখি নাই।"

পিতামহীকে প্রণাম করিতে দেখিয়া পিতাও ঠাকুরদাকে প্রণাম করিলেন। মাতাঠাকুরাণীর প্রণাম আমি দেখিতে পাই নাই। ঠাকুরদার আশীর্ব্বাদে বুঝিলাম, তাঁহাকেও প্রণাম করিতে হইয়াছে।

পিতামহী বলিলেন, "ভাই, আজ আর আমি যাইবার অবসর পাই নাই।"

"পাও নাই, তা বুঝিয়াছি। অঘোরনাথ শুনিলাম ফৌজদারী হাকিম হইয়াছে। সেই কথা শুনিয়া গ্রামান্তর হইতে অঘোরনাথকে দেখিতে লোক আসিয়াছে। বুঝিলাম, তুমি সেই জন্যই অবকাশ পাও নাই।" এই বলিয়াই ঠাকুরদা, আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "নাতীটে এক আধবার আমাদের বাড়ীতে যায়, আজ সেও পর্য্যন্ত আমাদের ত্রিসীমায় পা বাড়ায় নাই।"

এই কথা শুনিয়াই, পাছে ঠাকুরদা ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, এই ভয়ে আমি আবার পা টিপিয়া টিপিয়া শয্যায় শয়ন করিলাম।

শুইতে শুইতে পিতার কথা আমার কর্ণগোচর হইল। তিনি ঠাকুরদার প্রশ্নের কৈফিয়ৎ দিতে লাগিলেন। ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা করা তাঁর সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু নানা কারণে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তিনি তাহা পারেন নাই। পিতা বলিলেন, "সারাদিন এমন ঝঞ্ঝাটে পড়িয়াছিলাম যে, হাজার চেষ্টা করিয়াও আপনার সহিত সাক্ষাতের অবসর পাইলাম না।"

এ কৈফিয়ৎ ঠাকুরদা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন, "তাই কি অঘোরনাথ! না মূর্খ কাকার সঙ্গে দেখা করায় মানহানি হইবে বলিয়া পারিলে না।"

পিতা। ক্ষমা করুন কাকা, ওরকম অসৎ বুদ্ধি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের হয় নাই। আর আশীর্ব্বাদ করুন, কখন যেন না হয়।

ঠাকুরদা। আমিও ত তাই বিশ্বাস করি। তুমি যে লোকের পুত্র, তোমার অসদ্‌বুদ্ধি হওয়া ত সম্ভব নয়। তথাপি আমার মনে অভিমান জাগিয়াছিল। ফৌজদারী হাকিম হওয়া এত অল্প সৌভাগ্যের কথা নয়! বাঙ্গালীতে এরূপ চাকুরী পায়, আগে আমার এ ধারণাই ছিল না। যখনই আমি এই খবর পাইয়াছি, তখনই দাদার শোকে অভিভূত হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়াছি। আক্ষেপ, পুত্রের এ সৌভাগ্য তিনি দেখিতে পাইলেন না।

পিতা। আপনার ত দুঃখ হইবারই কথা। আপনি আমার পিতৃ-বন্ধু।

ঠাকুরদা। শুধু বন্ধু বলিলেও ঠিক সম্বন্ধ বলা হয় না। তিনি আমার সহোদর—গুরু। আমাদের এ ভালবাসা কাহাকেও বলিবার নয়। কেন না, বলিলেও সে বুঝিবে না। অধিক আর কি বলিব, তুমি পুত্র, তুমিও তা বুঝিতে পার নাই। পারিলে, তুমি সব কাজ ফেলিয়া আগে এ শুভ সংবাদ আমাকে জানাইতে।

পিতা। অপরাধ হইয়াছে কাকা, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার এরূপ অভিমান জাগিবে জানিলে, আমি সর্ব্বাগ্রে আপনার চরণ দর্শন করিয়া আসিতাম।

ঠাকুরদা। আমি প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার আগমন প্রত্যাশা করিতেছিলাম। তুমি এই আস—এই আস ভাবিয়া আমি পথ পানে চাহিয়াছিলাম। তুমি যখন একান্তই গেলে না, তখন তোমাকে দেখিবার জন্য আমার বড়ই ব্যাকুলতা আসিল। কিন্তু কি করি, বড় লজ্জা বোধ হইল বলিয়া দিনমানে এখানে আসিতে পারিলাম না।

মাতা অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "আপনার কাছে যাইবার জন্য আমি উঁহাকে বারংবার অনুরোধ করিয়াছি। বলিয়াছি, কাকামশা'য়ের সঙ্গে দেখা না করিলে, তাঁহার মনে দারুণ কষ্ট হইবে। উনি কোন মতেই যাইতে পারিলেন না। আপনার পুত্রকন্যার প্রতি দয়া করিয়া তাহাদের ক্ষমা করুন।"

"আপনাকে অবজ্ঞা অথবা তাচ্ছিল্য করিয়া যাই নাই, কাকা মশা'য়, এ কথা আপনি মনের কোণেও স্থান দিবেন না। আপনার কাছে যাইবার একান্ত প্রয়োজন সত্ত্বেও যাইতে পারি নাই ; এইটে শুনিলেই আপনি আমার অবস্থা বুঝিয়া ক্ষমা করিবেন।" এই বলিয়া পিতা ঠাকুরদার কাছে

টাকার কথা পাড়িলেন। পিতামহীকে ইতঃপূর্ব্বে যে সব কারণ দেখাইয়াছিলেন, গোবিন্দ ঠাকুরদাকেও সেই সমস্ত কারণ দেখাইয়া পিতা সর্ব্বশেষে বলিলেন,—"কাকা মশায়, কাল আপনাকে যেমন করিয়াই হউক,পাঁচশত টাকা ঋণ দিতে হইবে।"

এতক্ষণ পরে ঠাকুরদা যেন পিতার নির্দ্দোষতায় বিশ্বাস করিলেন। টাকার প্রয়োজন সত্ত্বেও যখন বাবা তাঁহার কাছে যান নাই, তখন তিনি যে একান্ত অশক্ত হইয়াছিলেন, এটা ঠাকুরদার যেন বোধ হইল। তিনি বলিলেন—"টাকার যখন প্রয়োজন, তখন তুমি যাইতে না পারিলেও, বৌমাকেও অন্ততঃ একবার আমার কাছে পাঠাইতে পারিতে। আর ঋণই বা তোমাকে করিতে হইবে কেন? তোমার পিতার সমস্ত টাকাই যে আমার কাছে রহিয়াছে।"

পিতা। তাহা আমি জানিতাম না।

ঠাকুরদা। সে—কি! দাদা—কি তোমাকে টাকার কথা কিছু বলেন নি?

পিতা। না। আর বলিবারও তাঁর প্রয়োজন হয় নাই। তিনি জানিতেন, টাকা যেন তাঁর ঘরেই তোলা আছে। আমাদের যখন প্রয়োজন হইবে, তখন পাইব।

ঠাকুরদা। তা হ'ক। তথাপি তোমাকে টাকার কথা বলা তাঁর একান্ত কর্ত্তব্য ছিল। যদি আমিও ইহার মধ্যে মরিয়া যাইতাম, তা হ'লে আমার কি সর্ব্বনাশ হইত বল দেখি! আজকালকার ছেলে কি উপযাচক হইয়া তোমার টাকা শোধ করিত? ভগবান্ আমাকে বড়ই রক্ষা করিয়াছেন। তাহ'লে শুন অঘোরনাথ, তোমাকে যে কথা বলিতে

এত রাত্রে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা শুন। তোমার পিতার ন্যস্ত যে সকল টাকা-কড়ি কাগজ-পত্র আমার কাছে আছে, কাল আমি সে সমস্তই তোমাকে বুঝাইয়া দিব।

পিতা। অবশ্য আপনি যখন দিবেন বলিতেছেন, তখন আপনার বাক্যের প্রতিবাদ করা আমার কর্ত্তব্য নয়। তবে আপনার কাছে টাকা থাকায় আমি যত নিশ্চিন্ত, ঘরে সে টাকা রাখিলে আমার ততটা নিশ্চিন্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন, বুদ্ধিমান্ আপনাকে একথা বুঝাইতে হইবে না। আমি এখন হইতে প্রায় বিদেশে বিদেশেই ঘুরিব। টাকা সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ফেরাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আর মায়ের কাছে রাখিয়া তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করাও যুক্তিযুক্ত নয়।

পিতার এ উত্তরে মাতা বড় সন্তুষ্ট হইলেন না, পরন্তু যেন ভীত হইলেন। তাঁহার কথার ভাব স্মরণ করিয়া এখন আমি তাহা অনুমান করিতেছি। মাতা বলিলেন, "তা কাকা মহাশয় যখন আর টাকাকড়ি রাখিতে ইচ্ছা করিতেছেন না, তখন উঁহার কাছে রাখিয়া উঁহার ঝঞ্ঝাট বাড়াইবার প্রয়োজন কি ?"

ঠাকুরদা। না মা, টাকা আর রাখিতে ইচ্ছা নাই।

মাতা। পরের টাকা—হিসাব নিকাশ ঠিক রাখা কি কম ঝঞ্ঝাট!

ঠাকুরদা। এই মা, তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। ঝঞ্ঝাট কি সহজ! নিজেরই হ'ক বা পরেরই হ'ক, এ বয়সে আর আমি ঝঞ্ঝাট পোহাইতে পারিব না। দাদার হঠাৎ মৃত্যুতে আমারও বড় ভয় হইয়াছে। অঘোরনাথ, তুমি কালই সমস্ত কাগজ-পত্র বুঝিয়া লইবে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত পিতামহীর একটীও কথা শুনিতে পাই নাই। পিতা-

মাতা অসঙ্কোচে অনর্গল মিথ্যা কহিতেছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বের কথা শুনিবার পর এ সকল কথা আমার ভাল লাগিতেছিল না। আমি ঠাকুরমার কথা শুনিতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলাম।

পিতামহীর কথা শুনিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। গোবিন্দ ঠাকুরদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বউ ঠাকরুণ, তুমি যে কোনও কথা কহিতেছ না? অঘোরনাথকে তাহার পৈত্রিক সম্পত্তি বুঝাইয়া দিই, তুমি অনুমতি দাও।"

পিতামহী উত্তর করিলেন,—"বুঝাইয়া দিবে কি? অঘোরনাথ উপযুক্ত হইয়াছে, তোমারও এ ঘাসের বোঝা বহিতে ইচ্ছা নাই। তখন উহাদের সম্পত্তি উহাদের ফেলিয়া দাও। তার আর বুঝাইয়া দিবে কি?"

ঠাকুরদা। তোমার যেমন বুদ্ধি, তেমনি বলিলে। দাদা এতকাল কি উপার্জ্জন করিল, কখনও কোন দিন সখ্ করিয়াও জানিতে চাহিলে না। তোমার বুদ্ধির যোগ্য কথাই তুমি বলিয়াছ। কিন্তু বিনা হিসাবে দিয়া আমি সন্তুষ্ট হইব কেন?"

পিতামহী। তবে তোমার যা ভাল বিবেচনা হয়—কর।

ঠাকুরদা। দাদার কাছে কতবার হিসাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। দাদা খাতা দেখিলেই ক্রোধ করিতেন, মুখ ফিরাইতেন। তোমার কাছে ত টাকার কথা তুলিতেই পারিতাম না। বউ! দাদার বিশ বৎসরের ন্যস্ত ধন। তিনি নিজে পর্য্যন্ত জানিতেন না, আমার কাছে তাঁহার কি ছিল। এই জন্য সত্য বলিতে কি, এই বিশ বৎসর আমি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারি নাই। কি জানি, কোন মুহূর্ত্তে সহসা যদি আমার জীবন যায়, দাদা যদি সে সময় ঘরে না থাকেন, স্ত্রী-পুত্রে—করিবে না খুব বিশ্বাস—

তবু কালবশে—যদি সে সম্পত্তি অস্বীকার করে, তাহা হইলে আমাকে অনন্তকাল অমুক্ত অবস্থায় থাকিতে হইবে। এই ভয়ে আমি সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতাম। অথচ পাছে দাদার ক্রোধ হয়, এই ভয়ে তাঁহার কাছে ইদানীং টাকার কথা উত্থাপনও করিতে পারিতাম না। কি করি বউ! সে অগাধ বিশ্বাসের গচ্ছিত ধন—নিরুপায়ে আমি কড়ায় গণ্ডায় হিসাব রাখিয়াছি। কাল অঘোরনাথকে বুঝাইয়া দিব। নখদর্পণের হিসাব। বুদ্ধিমান্ অঘোরনাথ দেখামাত্র বুঝিতে পারিবে।"

পিতা। হিসাব আবার কি দেখিব? যাঁহার সম্পত্তি, তিনি কখনও দেখেন নাই! আমি কি এতই হীন হইয়াছি, কাকা ম'শায়?

ঠাকুরদা। বেশ, হিসাব না দেখিতে চাও, কাগজ-পত্র গুলাত তোমার কাছে রাখিতে হইবে।

পিতা। সে দিতে হয় মায়ের হাতে দিবেন।

পিতামহী। না বাবা, আমি ওসব সামগ্রী আর হাতে করিব না। আমি এখন তোমাদের রাখিয়া শীঘ্র শীঘ্র যাইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হই। কাগজপত্র টাকা-কড়ি সমস্ত তুমি বউমার হাতে দিও।

পিতা। সে যাহা করিবার, পরে করা যাইবে। কাগজপত্রের জন্য আমি বিশেষ ব্যস্ত নই। যে জন্যে আমি ব্যস্ত হইয়াছিলাম তাহা আপনাকে আমি বলিয়াছি। আমার টাকার একান্ত প্রয়োজন। হাজার টাকা হইলেই ভাল হয়, একান্ত না হয়, পাঁচশো টাকা আপনাকে যেমন করিয়া হউক দিতে হইবে।

ঠাকুরদা। হাজার টাকা হইলেই যদি ভাল হয়, হাজারই দিব।

মাতা। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহা হইলে একটা কথা, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি।

ঠাকুরদা। বল।

মাতা। আগে বলুন, কিছু মনে করিবেন না?

ঠাকুরদা। কত টাকা আছে, জিজ্ঞাসা করিবে ত?

মাতা। আমার শ্বশুর বহুকাল হইতে উপার্জ্জন করিয়াছেন। তিনি কি রাখিয়া গিয়াছেন, জানিতে ইচ্ছা হয়।

ঠাকুরদা। হাঁ বউ, তোমার কি জানিতে ইচ্ছা হয় না। তোমার স্বামীর উপার্জ্জন, একদিনও কি তোমার মনে জানিবার খেয়াল হইল না!

পিতামহী। বেশত বলই না ঠাকুরপো, আজ একবার শুনিয়া লই।

ঠাকুরদা। তুমি কি কিছু আন্দাজ করিতে পার, অঘোরনাথ?

পিতামহী। ও বালক, ও কি আন্দাজ করিবে?

পিতা। গত তিন বৎসরের একটা আন্দাজ করিতে পারি। কেন না, এই কয় বৎসর মাসে তাঁহার কি আয় ছিল, আমার অনেকটা জানা আছে। এই কয় বৎসর আমিও তাঁহাকে মাসে অন্ততঃ পঞ্চাশ টাকা দিয়াছি। তাঁহার আয় ছাড়িয়া দিলে, এই তিন বৎসরে আমার অন্ততঃ দুই হাজার টাকা উপার্জ্জন হইয়াছে। তবে তাহার মধ্যে কি খরচ হইয়াছে, আমি জানি না।

ঠাকুরদা। তিনি তোমার উপার্জ্জনের একটী পয়সাও খরচ করেন নাই। সব আমার কাছে গচ্ছিত আছে।

পিতা। তাহ'লে এই দুই হাজার—

ঠাকুরদা। দুই হাজারের বেশী। প্রায় চব্বিশ শো হইবে।

পিতা। তাহ'লে এই চব্বিশ শো, আর পিতার হাজার চারেক। তাহার মধ্যে বাসা ও যাতায়াত খরচ বাবদে হাজার খানেক টাকা খরচ হইবার সম্ভাবনা।

ঠাকুরদা। তাহ'লে তুমি বলিতে চাও, গত তিন বৎসরে তোমাদের হাজার পাঁচেক টাকা সঞ্চয় হইয়াছে?

পিতা। এই আমার অনুমান। তারপর ইহার পূর্ব্বেও আরও হাজার পাঁচেক, সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দশ হাজার টাকা উপার্জ্জন হইয়াছে। ইহার মধ্যে কি খরচ হইয়াছে, আর কিই বা অবশিষ্ট আছে, আপনি জানেন।

এই কথা শুনিবামাত্র ঠাকুরদা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। পিতা যেন কতকটা অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার উত্তরেই সেইটিই যেন আমার অনুমান হইল। পিতা বলিলেন—"হাসিলেন যে কাকা ম'শায়? তবে কি বুঝিব, পিতা আমার সারাজীবনে দশ হাজার টাকাও উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই?"

ঠাকুরদা পিতার কথার কোনও উত্তর না দিয়া পিতামহীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বউ! তাহ'লে আজ আর টাকার কথা তোমাকে বলিব না। কাল অঘোরনাথকে সমস্ত কাগজ দেখাইব।"

মাতা ঈষৎ শ্লেষের সহিত বলিলেন—"কাগজপত্রও আপনার, হিসাবও আপনার। উনি আর দেখিয়া কি বুঝিবেন।"

ঠাকুরদা মায়ের কথার কোনও উত্তর না দিয়া পিতামহীকেই পুনরায় সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বউ, তাহ'লে যা বলিবার কালই বলিব, আজ আমি চলিলাম। পারত তুমিও কাল সকালে একবার আমাদের বাড়ী যেয়ো।"

"না ভাই, ওইটী আমায় অনুরোধ করিও না। টাকার কথায় আমি থাকিব না। উহাদের টাকা উহাদের ফেলিয়া দাও—আমার শুনিবার প্রয়োজন নাই।"

"বেশ, কাল তাই করিব। রাত্রি অধিক হইতেছে, আজ আমি চলিলাম।"

ইহার পর কিছুক্ষণের জন্য কাহারও কোন কথা আমি শুনিতে পাইলাম না। তাহাতেই অনুমান করিলাম, ঠাকুরদা চলিয়া গিয়াছেন।

কিছুক্ষণের নীরবতায় আমি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। তাহার পর কে কি কহিল, আমি আর শুনিতে পাইলাম না।

(১০)

পরবর্ত্তী তিন চারি দিবসের ঘটনা আমার স্মৃতি হইতে একেবারেই মুছিয়া গিয়াছে।

অনুমানে কিছু বলা যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া তাহা বলিতে আমি নিরস্ত হইলাম। গোবিন্দঠাকুরদার কাছে পিতার যে কি প্রাপ্তি হইল, আমার পিতামহের সম্পত্তি কি ছিল, এ সব আমি সময়ান্তরে জানিয়াছি। অনেক দিন পরে। সুতরাং এখানে তাহার উল্লেখ না করিয়া যথাসময়ে আপনাদের জানাইব। গুরুজন লইয়া কথা, অনর্থক তাহার অবতারণা করিতে আমার সঙ্কোচ বোধ হইতেছে।

পিতার প্রথম চাকরীস্থান হুগলী। চতুর্থ কি পঞ্চম দিবসের শেষে পিতা হুগলী যাত্রা করিলেন। আমার ও মায়ের, সঙ্গে যাইবার কথা ছিল। কিন্তু যাওয়া হইল না। পিতা পূরা বেতন পাইবেন না। এই জন্য তিনি

আমাদিগকে সে দূরদেশে লইয়া যাইতে সাহসী হইলেন না। সঙ্গে যাইবার একান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও মাতা কর্তৃপক্ষের কার্পণ্যের উপর দোষারোপ করিয়া পিতার সঙ্গে যাইতে নিরস্ত হইলেন।

আমি বুঝিলাম, আপাততঃ ছয় মাসের জন্য আমাকে আর গ্রাম ছাড়িতে হইবে না। পিতৃকর্তৃক আদিষ্ট হইলাম, এই কয়মাস আমাকে বাড়ীতে বৈকুণ্ঠ পণ্ডিতের শাসনাধীন থাকিতে হইবে।

এ কয়দিনের মধ্যে একটী দিনের জন্যও আমি সেই কমনীয়-কান্তি ব্রাহ্মণকে দেখি নাই। তিনি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন কি না, তাহাও বুঝিতে পারি নাই। পিতার উচ্চপদপ্রাপ্তির উল্লাসে আমি বোধ হয়, সে সময় বিবাহের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

গ্রাম হইতে পোয়াটাক পথ তফাতেই একটী খাল। সেই খালে কলিকাতা যাইবার ডোঙ্গা থাকিত। গ্রামের বহুলোক, স্ত্রী ও পুরুষ পিতাকে শুভকার্য্যে শুভযাত্রা করাইতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই খালের ধার পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। আমরাও গিয়াছিলাম।

যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে হঠাৎ সেই ব্রাহ্মণকে পিতার সমীপে উপস্থিত হইতে দেখিলাম।

অমনি সেই সময় পিতামহীকে সম্বোধন করিয়া মাকে বলিতে শুনিলাম—"মা! বাবুকে পিছু ডাকিতে বামুনকে নিষেধ কর।"

পিতামহী বলিলেন—"ভয় নাই, ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞ। যাতে তোমার স্বামীর অনিষ্ট হয়, এমন কাজ তিনি কখনও করিবেন না।"

পিতামহীর অনুমান মিথ্যা হইল, তাঁহার আশ্বাস-বাণী মিথ্যা হইল। পিতা ডোঙ্গায় উঠিবার জন্য সবেমাত্র পা'টী বাড়াইয়াছেন, এমন সময়

ব্রাহ্মণ খালের তীর-ভূমি অবতরণ করিয়াই, পিতাকে বলিলেন—"অঘোরনাথ! একটু অপেক্ষা কর।"

মাতা অমনি নয়ন ঈষৎ বক্র করিয়া পিতামহীর মুখের পানে চাহিলেন, পিতামহীও যেন শিহরিয়া উঠিলেন।

ব্রাহ্মণ কি বলেন, শুনিবার জন্য আমি যথাসম্ভব তাঁহার সমীপস্থ হইলাম।

পিতাও যেন ব্রাহ্মণের আচরণে বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি উত্থত চরণ নামাইয়া বলিলেন—"সমস্তই ত বলিয়াছি। আবার আপনার বলিবার কি আছে?"

"না, আমার নিজের আর বলিবার কিছু নাই। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্তমনে তোমার পুনরাগমন প্রতীক্ষায় রহিলাম। তোমারি মুখে শুনিয়াছিলাম, তোমার কর্ম্মস্থানে যাইতে অন্ততঃ সপ্তাহ বিলম্ব হইবে। তুমি এত শীঘ্র যাইবে, তাহা আমি শুনি নাই। তুমি আজ যাত্রা করিতেছ শুনিয়া আমি ছুটিয়া আসিয়াছি।"

"কি প্রয়োজন বলুন?"

"প্রয়োজন আমার নয়, তোমার। অবশ্য তোমার হইলেই আমার। কেননা, তোমার মঙ্গলের উপর আমার মঙ্গল নির্ভর করিতেছে।"

"কি বলিতে চান বলুন।"

"কোন্ মূর্খ তোমাকে এ সময় যাত্রার ব্যবস্থা দিয়াছে?"

"তাতে কি হইয়াছে? এ সময় যাত্রা করিতে দোষ কি?"

"দোষ কি! যদিও তুমি বৈবাহিক, তথাপি তুমি স্নেহাস্পদ। কি দোষ, তা আর তোমাকে কি বলিব? সূর্য্যাস্তের আর একদণ্ড সময় আছে,

এই সময় অপেক্ষা করিয়া যাত্রা কর। আর যখন শুভ কর্ম্মের জন্য যাত্রা করিতেছ, তখন এই সামগ্রীটা সঙ্গে লইয়া যাও।”

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ শুষ্ক ফুলের মত কি একটা সামগ্রী পিতার হাতে দিলেন। তারপর তীরভূমি হইতে উঠিয়া পিতামহীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন।

সকলেই ব্যাপারটা কি, বুঝিবার-জন্য উৎসুক হইল। যখন সকলে সে সময় যাত্রার ফল শুনিল, তখন বুঝিল, অশুভক্ষণে যাত্রা করিলে পিতার মৃত্যু, অথবা মৃত্যুতুল্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে; তখন সেই অজ্ঞাত অজ্ঞ পঞ্জিকা-দর্শকের উপরে সকলেই একবাক্যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। এই সময় দেখি, বৈকুণ্ঠ পণ্ডিত মাথা গুঁজিয়া মাতার অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

পিতা ব্রাহ্মণের এই কুসংস্কার-প্রণোদিত কথায় বিশেষ আস্থা স্থাপন করিলেন না। কেননা, ব্রাহ্মণ পিছন ফিরিতেই তদ্দণ্ডে শুষ্ক পুষ্পটী তিনি খালের জলে নিক্ষেপ করিলেন। পুষ্প স্রোতের জলে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তাঁহার অবজ্ঞায় ক্ষুণ্ণ হইয়াই যেন তীব্রবেগে স্থানান্তরিত হইয়া তীরস্থ একটা বেতসকুঞ্জে আত্মগোপন করিল। কিন্তু একদণ্ড বিলম্বে কোনও ক্ষতি হইবে না বুঝিয়া, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তিনি শালতীতে পদার্পণ করিলেন না। তীরের উপরে উঠিয়া ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

আমার বেশ স্মরণ আছে, সে দিন শুক্লপক্ষীয়া একাদশী। পিতামহীর সে দিন নিরম্বু উপবাস। মাস অগ্রহায়ণ। খালের দুই পাশের শস্যশ্যামল তৃণক্ষেত্র সন্ধ্যার বায়ুহিল্লোলে তরঙ্গসঙ্কুল হরিৎসাগরে পরিণত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্য অস্তগত হইল এবং সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পীত

কিরণ-তরঙ্গ যেন ঈর্ষায় প্রান্তর-বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আমার এখনও সে দৃশ্য বেশ মনে পড়ে। এখনও যেন দেখিতেছি, বায়ুবলে উত্থিত ধান্যশীর্ষগুলা আকাশের কৌমুদীকে পাইয়া, আহ্লাদে তরঙ্গশিরে ভাসিয়া, অবিরাম রজত-ফেনোচ্ছ্বাস ফুৎকার করিতেছে।

পিতা সেই সন্ধ্যায় আত্মীয়-বন্ধুগণের আশীর্ব্বাদ-প্রেরিত হইয়া শালতীতে আরোহণ করিলেন। সেই পীতশ্যাম সাগর দেখিতে দেখিতে দূর হইতে দূরান্তরে লইয়া শালতীকে চোখের অন্তরাল করিয়া দিল।

পিতার এই কর্ম্ম-প্রাপ্তিতে গ্রামের সকল লোকেই সুখী হইয়াছিল, মায়ের মুখ আনন্দে গর্ব্বে ভরিয়াছিল। আমি সুখী কি দুঃখী হইয়াছিলাম, মনে নাই। কিন্তু পিতামহীর একটা কথায় আমি বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলাম। গৃহে ফিরিয়াই পিতামহী আমাকে বলিলেন,—"যাহ'ক ভাই,আরও ছয়মাস বোধ হয় আমি তোমাকে দেখিতে পাইব। 'সাভ্যোম' চাকরী স্বীকার করে নাই বলিয়া আমি আগে তাকে মূর্খ মনে করিয়াছিলাম। এখন গুরুজন হইয়াও তাকে নমস্কার করিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

বাস্তবিকই পিতামহী করযোড়ে 'সাভ্যোম' মহাশয়ের উদ্দেশে প্রণাম করিয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রিত চক্ষুদুটির প্রান্ত হইতে আমি দুই বিন্দু অশ্রু পতিত হইতে দেখিয়াছিলাম।

(১১)

যাক্, এতকাল আমার ক'নের কথা বলিবার অবসর পাই নাই। চাকরী, বাম্‌নাই আর বিষয়ের হাঙ্গামে তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছি। কেবল কতকগুলা বাজে কথায় আপনাদের কর্ণকণ্ডূতি উৎপাদন করিয়াছি। সকল উপন্যাসের—বিশেষতঃ বাঙ্গালার সেই

পরমাবলম্বন, সমাজ-চক্ষে এখনও দুষ্প্রাপ্য হইলেও কল্পনার দৃষ্টিতে চিরাবস্থিতা, সেই ষোড়শী নায়িকাই যদি আমার এই গল্পে না রহিল, তাহা হইলে এ শুষ্ক সমাজ-কথার ঝঙ্কার তুলিয়া লাভ কি? সুতরাং এইবারে মনের কথা—ক'নের কথা কহিব।

যে গ্রামে ক'নের বাড়ী, তাহা আমাদের গ্রাম হইতে এক ক্রোশ দূরে। উভয় গ্রামের মধ্যে একটা মাঠ। এখন তাহাকে মাঠই বলি, কিন্তু বাস্তবিক একসময়ে তাহা গঙ্গার গর্ভ ছিল। গঙ্গা স্রোতের মুখ ফিরাইয়া অন্য পথে চলিয়া গিয়াছে। তার পূর্ব্বের প্রবাহ-পথ এখন ধান্য-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

এই ক্ষেত্রের উভয় পার্শ্বে আজিও পর্য্যন্ত এই দুইখানি গ্রাম—প্রান্তস্থ ঘনসন্নিবিষ্ট নানাজাতীয় তরু, শির অবনমিত করিয়া ক্ষেত্রমধ্যে আপনাদিগের লুপ্ত ধ্বংসাবশেষের অনুসন্ধান করিতেছে।

আমাদের গ্রাম হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে আর একটি গণ্ডগ্রামে একটি মধ্য-ইংরাজি স্কুল ছিল। আমি প্রতিদিন সেখানে গ্রামের অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে পড়িতে যাইতাম। বৈকালে ঘরে প্রত্যাগমনমুখে লুপ্ত গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বোক্ত তরুগুলির মত, আমিও পরপারের সেই গ্রামখানির ভিতরে আমার সেই পাঁচ বছরের ক'নেটির আজিও না-দেখা মুখখানির অনুসন্ধান করিতাম।

আমার মনে হইত, সেই 'কি জানি কে' যেন আমার গ্রামস্থ সঙ্গী ও সঙ্গিনীগুলির মধ্যে সকলের অপেক্ষা আপনার। কিন্তু শৈশবের লুকোচুরি খেলায় সে আমার নিকট হইতে এমন করিয়া লুকাইয়া আছে, যেন বহু অনুসন্ধানে চারিদিক আতিপাতি করিয়াও তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে

পারিতেছি না। তাহাকে ছুঁইতে না পারায় আজিও পর্য্যন্ত যেন আমি চোর হইয়া ঘুরিতেছি। একদিন তাহার চিন্তায় এমন তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, গ্রাম হইতে তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য মাঠে অবতরণ করিয়াছিলাম। গ্রামবুড়ী যদি তাহার দন্তহীন মুখ ব্যাদান করিয়া আমায় ভয় না দেখাইত, তাহা হইলে হয়ত সেদিন আমি ক'নেদের দেশে উপস্থিত হইতাম।

তাহার প্রতি এতটা মমতা যে কেন আসিয়াছিল, এত অল্প বয়সে সে যে আমার আপনার হইতেও আপনার, এ বোধ কেন হইয়াছিল, তাহা এখন অনুমানে কতকটা যেন বুঝিয়াছি।

আমাদের দেশে অন্য শ্রেণীর বিবাহ-সম্বন্ধ ও আমাদের বিবাহ-সম্বন্ধে কিছু পার্থক্য আছে। অন্য শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বরকন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ ছাঁদনাতলাতে ভাঙ্গিয়া গেলেও যেমন কন্যার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কন্যাকে আবার অপর পাত্রে অর্পণ করা চলে, আমাদের সম্প্রদায়ের বরকন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ সেরূপ নয়। সম্বন্ধই একরূপ বিবাহ। সম্বন্ধ-স্থাপনের সঙ্গে কতকগুলা মাঙ্গল্য কর্ম্ম করা হয়। মন্ত্রোচ্চারণে উভয় পক্ষের আদানপ্রদানের প্রতিশ্রুতি হয়। দেবদ্বিজের অর্চ্চনায় উভয় পক্ষের যথাসম্ভব অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে যদি বরের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সে কন্যার নাম 'অন্যপূর্ব্বা'। পূর্ব্বে কোন কুলীনের গৃহে তাহার বিবাহ হইত না। শুনিয়াছি, কোন কোন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ এরূপ কন্যার আর বিবাহ দেন নাই; বাগ্‌দত্তা কুমারীকে অপর বরে অর্পণ করিয়া প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করেন নাই। তাহাকে বিধবা জ্ঞানে ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা দিতেন।

দশমবর্ষীয় বালকের শুদ্ধমনে বাগ্‌দানের মন্ত্রগুলা বুঝি থাকিয়া থাকিয়া প্রতিধ্বনিত হইত, বুঝি তাহার প্রিয়তমার ঘুমঘোরে উচ্চারিত আত্ম-নিবেদিত প্রিয়বচনের আকর্ষণে বালক স্বামীর অন্তরাত্মা মিলনাশায় ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

(১২)

একদিনের শুভ সুযোগে ক'নের সহিত আমার পরিচয় হইয়া গেল। চারিটা বাজিলে যেমন স্কুলের ছুটি হইত, অমনি আমি আমার সহপাঠীর সঙ্গে বাড়ীতে চলিয়া আসিতাম। আমার পিতার হাকিম হওয়া অবধি পণ্ডিত মহাশয় আমাকে সমধিক যত্ন করিতেন। পাছে পথে কোথাও খেলা করিয়া, আমি বাড়ী পোঁছিতে বিলম্ব করি, এই জন্য তিনি আমাদের গ্রামের দুই একটি বড় ছেলের উপর আমাকে বাড়ীতে পৌছাইয়া দিবার ভার দিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রায়ই তাহারা যথাসময়ে আমাকে বাড়ীতে রাখিয়া যাইত। তবে মাঝে মাঝে পথের মধ্যে খেলার জন্য দুই একদিন বাড়ীতে পৌঁছিতে বিলম্ব যে না ঘটিত, এমন নয়; কিন্তু গৃহে পৌঁছিতে কখনও কোন কালে আমি সন্ধ্যা উত্তীর্ণ করি নাই।

গ্রামের এক প্রান্তে একটি চৌরাস্তার মোড়ের উপর আমাদের স্কুল। তাহার একটি ধরিয়া কিছু দূর গেলেই গ্রামের জমীদারের একটি বাগান। সেই বাগান পার হইলেই পঞ্চবটীর বন। সেখানে কালুরায় দক্ষিণদার ঠাকুরের 'আস্তানা।' আমরা এক কথায় ঠাকুরকে 'দক্ষিণরায়' বলিতাম। যে ভীষণ অরণ্য নিম্ন-বঙ্গের সমস্ত উপকূল-ভাগ ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, সেই নরখাদক, 'রাজকীয় বাংলা-বাঘে'র আবাসভূমি সুন্দরবন

পূর্ব্বকালে আমাদের গ্রামের অতি নিকটেই ছিল। বন কাটিয়া আবাদ হওয়ায় এখন তাহা গ্রাম হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে।

পিতামহের বাল্যাবস্থায় গ্রামে প্রায়ই বাঘের উপদ্রব হইত। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় গ্রামের মধ্যে কোনও উপদ্রব না থাকিলেও গ্রামের দুই এক ক্রোশের মধ্যে বাঘ আসিয়াছে শুনিয়াছি। গ্রামে বাঘ আসার কথা না শুনিলেও গ্রামের লোকে, বিশেষতঃ বালক-বালিকারা তখন সন্ধ্যার পর বাটীর বাহির হইত না।

দক্ষিণরায় বাঘের দেবতা। তাঁহাকে পূজা-উপচারে তুষ্ট করিলে বাঘের ভয় দূর হয়, এই বিশ্বাসে গ্রামের লোকে শনিমঙ্গলবারে তাঁহার অর্চ্চনা করিত। শরীররক্ষী দেশরক্ষী সিপাইগণের মধ্যে আমরা যেমন কাহাকে পাহারাদার, কাহাকেও বা জমাদার, রেসেলদার বলিয়া থাকি, এই ঠাকুর দক্ষিণদিক্ রক্ষা করিতেন বলিয়াই বোধ হয়, তাঁহাকে দক্ষিণরায় বলা হইত। দক্ষিণরায়ের আস্তানা পার হইলেই গুপ্তগঙ্গার তীরস্থ পথ। সেই পথ ধরিয়া পোয়াখানেক পথ আসিলেই আমাদের গ্রাম।

দক্ষিণরায়ের আস্তানার কাছে যে পঞ্চবটী, তাহারই একটি আমলকী-বৃক্ষের তলদেশে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী চার পাঁচখানি গ্রাম হইতে গ্রাম্য রমণীরা প্রতি চৈত্রমাসে বনভোজন করিতে আসিত। কেহ কেহ বা সেই সঙ্গে দক্ষিণরায়ের পূজাও সারিয়া যাইত।

যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিন অনেক রমণী পূর্ব্বোক্ত আমলকী-বৃক্ষের তলে সমবেত হইয়াছিল।

সে দিন শনিবার। দেড়টার সময়েই আমাদের ছুটি হইয়াছে। সকাল সকাল বাড়ীতে পৌঁছিব বুঝিয়া, আমার সহচর রক্ষী সে দিন

আমাকে সত্বর বাড়ী ফিরিতে অর্থাৎ পথের কোন স্থানে বিলম্ব না করিতে উপদেশ দিয়া, কোনও কার্য্যোপলক্ষে গ্রামান্তরে চলিয়া গিয়াছিল। আমার সঙ্গে আরও যে দুই চারি জন বালক ছিল, তাহারা কিয়দ্দূর আমার সহিত চলিয়া নিজ নিজ গ্রামাভিমুখে চলিয়া গেল। পঞ্চবটীর সন্নিকটে যখন আমি উপস্থিত হইলাম, তখন আমি সঙ্গিহীন। কিন্তু আমি তখন অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়াছি। সুতরাং একাকী পথ চলিতে আমার ভয়ের কোন কারণ ছিল না।

সেদিনকার নির্জ্জনতা আমার কেমন মিষ্ট লাগিল। আমি যেন একটা অভিনব উল্লাসে এদিক্ ওদিক্ একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া পথ চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে দেখি, অনেকগুলি স্ত্রীলোক আমলকীগাছের তলে বসিয়া আহার করিতেছে।

তখন বনভোজন কা'কে বলে, জানিতাম না। আমলকীর তলে বনভোজন প্রশস্ত বলিয়া মহিলামণ্ডলী গাছটিকে একরূপ ঘেরিয়া অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া আহারে বসিয়াছিল। মেয়েদের এরূপ ভাবে ভোজনে বসিতে আমি আর কখন দেখি নাই। সকলেরই আহার্য্য প্রায় একরূপ ছিল। চিঁড়ে, চালভাজা, দৈ, কলা, গুড়—কেহ কেহ বা গুড়ের পরিবর্ত্তে বাতাসা লইয়াছিল।

বাঙ্গালীর ভোজন—পুরুষেরই হউক, অথবা স্ত্রীলোকেরই হউক—বড় একটা নীরবে নিষ্পন্ন হয় না। ক্ষুধার প্রাবল্যে, ভোজনারম্ভে কতকটা নীরবতা থাকে বটে, কিন্তু সে অল্প সময়ের জন্য। একটু ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে না হইতে আবার যে কোলাহল, সেই কোলাহল। মহিলাদের মধ্যে কতকগুলি নীরবে আহার করিতেছিলেন, কতকগুলির মধ্যে কোলাহল

উত্থিত হইয়াছিল। তাঁহাদের সঙ্গে যে সকল বালকবালিকা আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি স্ব স্ব গুরুজনের প্রসাদ পাইতেছিল, কতক-গুলি পূর্ব্বাহ্ণেই "ফলার" খাইয়া দূরে ক্রীড়াকৌতুকে রত ছিল। আমি দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। দেখিতে দেখিতে প্রলোভনীয় আহারের প্রবল আকর্ষণে আমার ক্ষুধা জাগিয়া উঠিল। আমার ইচ্ছা হইল, আমিও উহাদের মধ্যে বসিয়া পেট ভরিয়া 'ফলার' খাইয়া লই। কিন্তু আমার ত মা অথবা ঠাকুরমা আসে নাই, আমি কাহার কাছে খাবার চাহিব ?

ক্ষুন্নিবৃত্তির অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, ক্ষুণ্ণ-মনে আমি সেই স্থান পরিত্যাগ করিলাম। একটু দূরেই দক্ষিণরায়ের স্থান। পঞ্চবটীকে বামে রাখিয়া আমি যেমন ঠাকুরের কুটীর-প্রাঙ্গণে পা দিয়াছি, অমনি একটি বৃদ্ধা পশ্চাদ্দিক্ হইতে আমার হাত ধরিয়া বলিল—"কি বাবা ! চলিয়া যাইতেছ কেন ? একটু মিষ্টমুখ করিয়া যাও।"

আমার বগলে বই ও শ্লেট ছিল। হাত ধরাতে বগল আল্‌গা হইয়া বইগুলি পতনোন্মুখ হইল। বৃদ্ধা ক্ষিপ্রতার সহিত সেগুলা নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া বলিল—"এস আমার সঙ্গে। আমি দেখিতেছি, তোমার ক্ষুধা পাইয়াছে, মুখখানি মলিন হইয়াছে।"

আমি তাহার সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম। বলিলাম—"আমার বই ফিরাইয়া দাও, আমি খাইব না।"

বৃদ্ধা সে কথায় কর্ণপাত করিল না। হাসিতে হাসিতে বলিল—"তাও কি হয় ? তুমি এই তৃতীয় প্রহর বেলায় প্রসূতিদের নিকট হইতে শুষ্কমুখে চলিয়া যাইলে, তাহারা কেমন করিয়া মুখে আহার তুলিবে ? তোমাকে কিছু মুখে দিয়া যাইতেই হইবে।"

এই বলিয়াই বৃদ্ধা আমার পশ্চাতে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"খুকী, এই বইগুলা ধর ত দিদি, আমি বাছাকে কোলে করিয়া লইয়া যাই।"

বৃদ্ধার কথা শেষ হইতে না হইতে একটি বালিকা ছুটিয়া আসিয়া আমার হাত হইতে বই-শ্লেট গ্রহণ করিল। বালিকার পরণে একখানি লাল-পেড়ে শাড়ী। পাছে তাহা খুলিয়া যায়, এই জন্য আঁচলটা তাহার কোমরে বাঁধা ছিল। বেণী-সংবদ্ধ কেশগুলি ঝুঁটির আকারে মাথার উপর বিন্যস্ত ছিল। কপালে একটি কাঁচপোকার টিপ, গলদেশে গুটিকয়েক মাদুলি, হাতে কালো কাচের চুড়ী, বাম হস্তের চুড়ীর নিম্নভাগে এক গাছি 'নোয়া'। এই সামান্য অলঙ্কারে নিরলঙ্কারা বালিকা শুদ্ধ মাত্র তাহার দেহের বর্ণে দাক্ষিণরায়ের আশীষ-পুষ্পের মত আমার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে ফুটিয়া উঠিল। দশমবর্ষীয় বালকের চোখে সৌন্দর্য্য-দর্শনের যতটুকু শক্তি, এখন স্মরণে আনিয়া অনুভবে বলিতে পারি, তাহাই আমি বলিতেছি। পরবর্ত্তী বক্ষ্যমাণ ঘটনায় এই রূপের সঙ্গে আমার হৃদয়ের একটা সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে, বালিকার সেই শ্রী আমি আজিও স্মরণ রাখিতে পারিতাম কি না, সে কথা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি না। কিন্তু আজিও আমি তাহা স্মরণে রাখিয়াছি। যৌবনে পদার্পণ করা অবধি এ বয়স পর্য্যন্ত অনেক সুন্দরীর রূপ আমি দেখিয়াছি, কিন্তু নির্জ্জনে বসিয়া কোনও সময়ে সেই সকল রূপের চিন্তা করিতে গেলে, সকলকে অতিক্রম করিয়া, সেই বালিকার রূপটিই আমার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। যে কামগন্ধহীন রূপ সকল রূপের মধ্য দিয়া মানুষের মনকে অনন্তের দিকে টানিয়া লয়, এখন আমার মনে হয়, এ রূপ বুঝি সে রূপেরই প্রতিবিম্ব।

আমি আর প্রতিবাদ করিলাম না। তবে কোলে উঠিলাম না, বৃদ্ধার

অনুসরণ করিলাম। শ্লেট-বই বগলে লইয়া বালিকা আমার পশ্চাতে চলিল।

চলিতে চলিতে বৃদ্ধা পরিচয় জানিতে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। লজ্জায় আমি তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিবার অবসর পাই নাই। উত্তর দিতে না দিতে আমি মহিলামণ্ডলীমধ্যে উপস্থিত হইলাম। আর উপস্থিত হইতে না হইতে সমস্ত রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল। আমাদের গ্রাম হইতেও দু'চারিটি স্ত্রীলোক সেখানে বনভোজনে আসিয়াছিল। তাহারা আমাকে দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না।

তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল—"ওগো মা, তুমি কাকে ধরিয়া আনিতেছ?"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে আর একজন মহিলা সাক্ষাৎ ভগবতীর মত পার্শ্ববর্ত্তিনী অপর একটি মহিলাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ও খুকীর মা! এ যে তোমারই জামাই গো!"

'জামাই' এই কথা শুনিবামাত্র এই দশমবর্ষীয় বালককে দেখিয়া তিনি আহার পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন, এবং কতই যেন সঙ্কোচের সহিত অনাবৃত মস্তকে অবগুণ্ঠন দান করিলেন।

যিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া আনিতেছিলেন, তিনি এই কথা শুনিয়া বিস্ময়ে উল্লাসে এমন কতকগুলি রহস্যের বাক্য প্রয়োগ করিলেন যে, তাহা শুনিয়া লজ্জায় আমি যেন গুটাইয়া গেলাম। এই অবস্থায় লুকাইয়া লুকাইয়া আমি একবার বালিকার পানে চাহিলাম। সে এ সকল রহস্যের একবর্ণও বুঝিতে না পারিয়া স্থিরদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া ছিল।

বৃদ্ধা তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন,—"ও দাখী! এখন থেকে এত ক'রে দেখিস্‌নি, পার্শ্বে তোর সতীন দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চোখ আর বড় বেশি দিন থাকিবে না। তাহাকে একটু দেখিবার ভাগ দে!"

অতি মধুর কণ্ঠে বালিকা বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করিল—"দিদিমা! এ কে?"

"চিন্‌তে পার্‌লিনি! তোর বর।"

তড়িতাকৃষ্টবৎ আমার দৃষ্টি আর একবার বালিকার মুখের উপর পড়িল! বালিকাও পূর্ণবিস্ফারিত-নেত্রে আমার পানে চাহিল। তাহার বগল হইতে বই-শ্লেট পড়িয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে রমণীমণ্ডলীর হাস্যপরিহাস পঞ্চবটীর পত্রান্তরাল-নিঃসৃত চৈত্র-বায়ুর "হো হো" হাস্যের সহিত মিশিয়া একটা হাসির ফলার রচিয়া আকাশে উপহার প্রদান করিল। আমি চক্ষু মুদিলাম।

তার পর? তার পর আমি কি বলিব? বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে যাহা আর কোনও বঙ্গ-বর-বধূর ভাগ্যে ঘটিবে না, আমার ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। আজকালিকার বয়স্থ নায়ক ও বয়স্থা নায়িকার অনেকের মধ্যে—বহুপত্র-ব্যবহারে, বহুবার নির্জ্জন সাক্ষাতে—পরস্পরের কাছে হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটন ঘটিতে পারে, কিন্তু বরবধূর একত্র বসিয়া, শ্বশ্রূঠাকুরাণীর হাতের 'ফলার' খাওয়া, আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিবে না।

বালিকার মাতা অতি যত্নে 'ফলার মাখিয়া, নিজ হস্তে আমার মুখে তুলিয়া দিতেছিলেন। 'দিদি মা' এখন বসনাঞ্চলে বালিকার দেহ ও মস্তকের কিয়দংশ ঢাকিয়া দিয়াছিল। সে তদবস্থায় আমার নিকটে বসিয়া বসিয়া 'ফলার' খাইতেছিল এবং এই অজ্ঞাত-পরিচয় বন্ধুটির প্রতি

তাহার মায়ের আদর নিরীক্ষণ করিতেছিল। রমণীদের মধ্যে যাহারা আহারকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছিল, তাহারা আমাদের তিনজনকে ঘেরিয়া—কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বা বসিয়া, তুলনায় আমাদের রূপের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

অর্দ্ধেক আহার করিয়াছি, এমন সময়ে এক বজ্রের মত চপেটাঘাত আমার পৃষ্ঠের উপর পড়িল। বালিকা চীৎকার করিয়া উঠিল, রমণীগণ স্তম্ভিত হইল, বালিকার মাতা কম্পিতকলেবরে মূর্চ্ছিতবৎ ভূমিতে পতনোন্মুখী হইলেন। এক মুহূর্ত্তে সমস্ত আনন্দ-কলকল যেন বিষাদ-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল—পঞ্চবটীর সমীরণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ!

আমি মাথা তুলিয়া দেখি, আমার মা! তাঁহার রোষকষায়িত চক্ষু দেখিয়া আমি প্রহার-যাতনা ভুলিয়া কাঁপিতে লাগিলাম।

কাহারও কোন কথা কহিবার অবসর রহিল না। আমি মাতৃকর্ত্তৃক কেশাকৃষ্ট হইয়া গৃহাভিমুখে নীত হইলাম।

(১৩)

আমার বাড়ী ফিরিতে অযথা বিলম্ব দেখিয়া মাতা ও পিতামহী উভয়েই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। বাড়ীতে তখনও পর্য্যন্ত চাকর নিযুক্ত হয় নাই। গো-সেবা, বাসন মাজা ও বাড়ীর উঠান ঝাঁট দিবার জন্য এক-জন নীচজাতীয়া স্ত্রীলোক নিযুক্ত ছিল। সদানন্দ অধিকাংশ সময় চাষের কাজেই নিযুক্ত থাকিত। বাড়ীর কাজে তাহাকে বড় একটা পাওয়া যাইত না। পরিবারবর্গ অধিক ছিল না। গৃহের অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য পিতামহী ও মাতার দ্বারাই সম্পন্ন হইত। ঝি কাজ সারিয়া তাহার গৃহে

বোধ হয় চলিয়া গিয়াছিল। সদানন্দও বোধ হয়, তখনও মাঠ হইতে ফিরে নাই। বেলা যায় দেখিয়া, উদ্বেগে আত্মহারা জননী গঙ্গার তীর ধরিয়া একটু একটু অগ্রসর হইতে হইতে পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পিতামহী একে বৃদ্ধা, তাহার উপর স্বামিশোকে তিনি অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ঘর ছাড়িয়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। পথের মাঝে দাঁড়াইয়া উৎকণ্ঠার সহিত তিনিও আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

আমাকে দেখিবামাত্র আমার অবস্থা বুঝিতে পিতামহীর বাকী রহিল না। তিনি বুঝিলেন, আমার অকার্য্যের জন্য আগে হইতেই মায়ের হাতে যথেষ্ট শাস্তি পাইয়াছি। এই জন্য তৎসম্বন্ধে আমাকে কিংবা মাকে তিনি কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, নীরবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

বাল্যে আমি পিতামহ ও পিতামহীর কাছেই একরূপ পালিত হইয়াছিলাম। আমার পালনে ও শাসনে আমার মাতা কিংবা পিতার কোনও অধিকার ছিল না। এমন কি, কোনও সময়ে তাঁহারা আমাকে শাসন করিলে, উভয়েই পিতামহী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতেন। পিতামহ পিতামহীকে নিষেধ না করিয়া, তাঁহার কার্য্যের পোষকতা করিতেন। পিতামহের মৃত্যুর পর তিনি সংসারে একরূপ নির্লিপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এ কয়টা মাস তৎকর্ত্তৃক আমি একরূপ পরিত্যক্তই হইয়াছিলাম।

কিন্তু আজ মায়ের শাসনে আমার মুখের অবস্থা দেখিয়া তিনি বিশেষ কাতর হইয়া পড়িলেন। বাড়ীর চৌকাঠে পা দিয়াই তিনি আমাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ ভাই! কখন কোন দিন ত তোমাকে পথে বিলম্ব করিতে দেখি নাই, তবে আজ এমন অন্যায় কাজ করিলে কেন?"

তখনও প্রহারের জ্বালা আমার পৃষ্ঠদেশে প্রবল ভাবেই সংলগ্ন ছিল। পিতামহীর প্রশ্নে সেই জ্বালার সঙ্গে প্রবল বেগে অভিমান জাগিয়া উঠিল। ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। পিতামহী সস্নেহে আমার পৃষ্ঠে হাত দিলেন—দেখিলেন, মায়ের পাঁচটা আঙ্গুলের চিহ্ন এখনও আমার পৃষ্ঠদেশে ফুটিয়া রহিয়াছে।

এ অবস্থা দেখিয়া পিতামহীর চোখে জল আসিল। তিনি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বালক এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহাকে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়াছ?"

মাতা রুক্ষস্বরে উত্তর করিলেন—"অপরাধ! অপরাধ কার? তোমাদের। তোমাদের অপরাধে বালক আজ শাস্তি পাইল।"

"তোমাদের"—এই বহুবচনান্ত শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া, আমার পিতামহী বুঝিতে পারিলেন, পুত্রবধূ তাঁহার পরলোকগত স্বামীকেও লক্ষ্য করিয়া কথা বলিতেছেন।

ইদানীং মায়ের ভাবপরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে, তথাপি পিতামহী আমার মাতার নিকট হইতে এরূপ ভাবের উত্তর কখনও শুনেন নাই, শুনিবার প্রত্যাশাও করেন নাই।

উত্তর শুনিয়া তিনি স্তম্ভিতার ন্যায় নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে মা মুখ অবনত করিয়া ভূমিতে লক্ষ্য করিয়াই যেন অস্ফুটস্বরে আর কতকগুলা কি কথা বলিলেন—আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না; পিতামহী বোধ হয়, পারিলেন। তিনি উত্তর করিলেন—"তা আমাদেরই

যদি অপরাধ বুঝিয়া থাক,—আমাদের অবশিষ্ট আমি আছি—আমাকে শাস্তি দিলে না কেন? আমাদের অপরাধে বালক শাস্তি পাইল কেন?"

মাতা একটু অবজ্ঞাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"কথার কু ধর কেন?"

পিতামহী। যেমন স্বভাব, সেইরূপ করিব ত। তুমি যে হাকিমের গৃহিণী হইয়াছ, তাহা ত বুঝি নাই।

মাতা। তুমি আমার ভাগ্যে ঈর্ষা করিতেছ নাকি?

পিতামহী। করিতে হয় বই কি। হাকিমের বউ না হইলে ত এরূপ মেজাজ হয় না।

মাতা। মেজাজ কি দেখিলে?

পিতামহী। আর দেখাইতে বাকি কি রাখিতেছ? তবু এখনও তোমার স্বামীর উপার্জ্জনের এক তণ্ডুলকণাও মুখে তুলি নাই। আজিও পর্য্যন্ত সেই 'মূর্খের' অন্নে জীবন রক্ষা করিতেছি।

মাতা। তা'বলে দুগ্ধপোষ্য শিশুর যিনি বিবাহের সম্বন্ধ করিতে পারেন, তিনি বেদবেদান্ত গুলিয়া খাইলেও, তাঁহাকে আমি পণ্ডিত বলিতে পারিব না।

ইহার পর মাতা ও মাতামহীর মধ্যে যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইল, বাঙ্গালীর এই যৌন-বিবাহ-সমর্থন যুগে, তাহা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিয়া আমি অপ্রীতিভাজন হইতে ইচ্ছা করি না। সেই সকল কথা শুনিয়া যে তথ্যটুকু আবিষ্কার করিয়াছি, এবং তাহার যে অংশটুকু প্রকাশ-যোগ্য মনে করিয়াছি, তাহাই আমি আপনাদিগকে শুনাইব।

বংশানুক্রমিক আমাদিগের মধ্যে এইরূপ বাল্যবিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্বন্ধ অতি শৈশবে হইলেও বরের উপনয়ন-সংস্কারের পরে বিবাহ

হইত। বিবাহের অব্যবহিত পরেই বালক গুরুগৃহে প্রেরিত হইত। অন্ততঃ বারো বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে সে গৃহে ফিরিবার অনুমতি পাইত না। সেখানে শাস্ত্রশিক্ষা ও গুরুসেবা তাহার কার্য্য ছিল। যাহার একাধিক শাস্ত্রে পারদর্শিতা-লাভে অভিলাষ হইত, তাহাকে এক গুরুর নিকটে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া, আবার অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ, মিথিলা; কাশী—এমন কি, দ্রাবিড় পর্য্যন্ত কেহ কেহ শাস্ত্রশিক্ষার্থে গমন করিতেন। একাধিক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে হইলে, দ্বাদশ বৎসরেও কুলাইত না। পিতামহী শুনিয়াছেন, ক'নের বাপের ঘরে ফিরিতে কুড়ি বৎসরকাল লাগিয়াছিল। আমার পিতামহ বারো বৎসর পরেই ফিরিয়াছিলেন।

পাছে শাস্ত্রজ্ঞানের ফলস্বরূপ বৈরাগ্যোদয়ে যুবক সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যায়, ঘরে আর না ফিরিয়া আসে, এই জন্য বর কন্যা উভয়েরই একরূপ অজ্ঞাতসারে উভয়কে দাম্পত্য-বন্ধনে আবদ্ধ করা হইত। পুরুষ যে সময়ে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু হিন্দু—বিশেষতঃ সে সময়ের হিন্দু—কন্যার ত আর কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইতে দিতে পারিতেন না, কাজেই ওই অতি অল্পবয়সেই বিবাহের ব্যবস্থাটা তাঁহাদের কাছে সমীচীন বোধ হইয়াছিল।

স্বামীর অনুপস্থিতিকালে বধূ শ্বশুরগৃহে আনীত হইতেন। বিবাহের পর শ্বশুর-গৃহে দ্বিতীয়বার আসাতেও একটা হাঙ্গামা ছিল। এরূপ আসাকে দ্বিরাগমন বলিত। বলিতই বলিতেছি, কেননা, পাঁজিতে এ কথাটার অস্তিত্ব থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে এ প্রথার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। এখন শীঘ্র শীঘ্র বধূকে ঘরে আনিবার যে প্রকার কৌশল আবিষ্কৃত

হইয়াছে, তাহা বোধ হয়, আজিকালিকার কোন বিবাহিত হিন্দুসন্তানের অবিদিত নাই। কিন্তু পূর্ব্বে রীতিমত শুভদিন দেখিয়া, বধূকে দ্বিতীয়বার বাড়ীতে আনিতে হইত। এ দ্বিরাগমনের দিন এতই অল্প যে, কাহারও কাহারও ভাগ্যে দুই তিন বৎসরের মধ্যে শ্বশুর-গৃহে আগমন ঘটিয়া উঠিত না।

শ্বশুর-গৃহে আসিলে, কুমারী ব্রহ্মচারিণীর মত তিনি শ্বশুরশাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের সেবাতৎপরা—গৃহের সৌভাগ্যলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিতেন। আমার পিতামহীও বহুকাল সেইরূপভাবে আমাদের গৃহে বাস করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল অদর্শনের পর সমাবর্ত্তিত পিতামহকে যেদিন তিনি প্রথম দর্শন করেন, সেদিন নবোঢ়া বধূর সমস্ত লজ্জা নবভাবে তাঁহাকে আবৃত করিয়াছিল।

মাতা ও পিতামহীর বাগ্‌বিতণ্ডায় আমি পূর্ব্বোক্ত তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছিলাম। পিতামহী বাল্যবিবাহের সমর্থনে তাহাকেই প্রকৃত যৌন-বিবাহ প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন; মাতা সে প্রথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; এবং সেই সঙ্গে গুরুজনের বুদ্ধির নিন্দা করিয়াছিলেন।

এরূপভাবে শাশুড়ীর সঙ্গে মায়ের বাগ্‌বিতণ্ডা এই প্রথম। অন্ততঃ ইহার পূর্ব্বে আর কখনও আমি এরূপ বিতণ্ডা দেখি নাই।

মাতার এই অভাবনীয় আচরণে ক্ষুন্ন পিতামহীর মুখের ভাব এখনও আমার মনে পড়ে। সে মুখের ভাব দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, পিতামহী বুঝি আমার উপর অধিকার পরিত্যাগ করিলেন। প্রস্থানকালে তিনি আমার পানেও আর ফিরিয়া চাহেন নাই।

(১৪)

পরবর্ত্তী সোমবারে ডাকঘরে দিবার জন্য মা আমার হাতে একখানি পত্র দিলেন। ইহার সপ্তাহ পরেই পিতা কর্ম্মস্থান হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

পিতার শিক্ষানবীশীর ছয়মাস পূর্ণ হইয়াছে। তিনি হুগলি সহরেই ডেপুটীর পদে পাকা হইয়াছেন এবং আমাদের সকলকেই তিনি সেখানে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন।

সঙ্গে যাইবার জন্য তিনি প্রথমেই পিতামহীকে অনুরোধ করিলেন। তিনি সম্মত হইলেন না। বলিলেন—"আমি গেলে ঘরে সন্ধ্যা দিবার লোক থাকিবে না। গরুর ও নারায়ণের সেবা হইবে না।"

কাজেই পিতামহীর হুগলি সহর দেখা ভাগ্যে ঘটিল না। আমি, মা, ঠানদিদির পুত্র গণেশ-খুড়া এবং নবনিযুক্ত একজন ভৃত্য পিতার সঙ্গে চলিলাম।

আমাদের বিদেশ যাইবার কথা কাহার মুখে শুনিয়া কনের বাপ আমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। পিতা তাঁহাকে কি বলিয়াছিলেন, শুনি নাই। কেননা, পিতা আমাকে তাঁহার কাছে যাইতে দেন নাই। তবে ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে, পিতামহী পিতাকে যে সব কথা কহিয়াছিলেন, ঘটনাবশে, তাঁহাদের কথোপকথন-সময়ে তাহার কিয়দংশ আমি শুনিয়াছিলাম।

পিতামহী বলিলেন,—"তোমার ব্যবহারে ও কথায় ভাবে বোধ হইতেছে, তুমি হরিহরের বিবাহ দিবে না।"

"বিবাহ দিব না, তুমি কি প্রকারে বুঝিলে?"

"বিবাহ দিবে না কেন—আমি বলিতেছি, সার্ব্বভৌমের কন্যার সহিত—

"এখন দিব না। তবে ও ব্রাহ্মণ যদি বিবাহের কথা লইয়া আমাকে বারংবার বিরক্ত করে, তাহ'লে দিব না।"

"এ কি পাগলের মতন কথা বলিতেছ?"

"পাগল আমি, না তোমরা? এক দুগ্ধপোষ্য শিশুর বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছ!"

"সম্বন্ধ করিয়াছ ত তুমি।"

"আমি করিয়াছি?"

"আদানপ্রদানের প্রতিজ্ঞা কি আমরা করিয়াছি?"

"করিয়াছি একান্ত অনিচ্ছায়—কেবল তোমাদের অত্যাচারে।"

"তুমি সে সময় কর্ত্তাকে মনের কথা বল নাই কেন?"

"সেইটিই আমার বোকামি হইয়াছে।"

"তাহ'লে ব্রাহ্মণের কি হইবে, অঘোরনাথ?"

"ব্রাহ্মণের কি হইয়াছে, তা হইবে?"

"সে যে সত্যপাশে আবদ্ধ হইয়াছে।"

তা হ'লে কি আমি কচিছেলের বিবাহ দিয়া, তার ইহকাল পরকাল সব নষ্ট করিব?"

"ইহকাল পরকাল যাইবে কেন?"

"বালকের এই পঠদ্দশা—এ সময় বিবাহ হইলে এ জন্মের মত তার পড়াশুনা শেষ হইয়া যাইবে।"

"কেন, তোমার পিতার কি পড়াশুনা শেষ হইয়াছিল?"

"সেকালে হইতে পারিত। এখন আর সে বর্ব্বরতার যুগ নাই। আমার বাল্যে বিবাহ হইলে, আমাকে আর তিনটা পাশ দিতে হইত

না। আমাদের বংশে বিচারক জন্মিবে, ইহা কেহ কখনও স্বপ্নেও মনে করিয়াছিল কি ? আমার অবস্থা কি হইয়াছে, তাহা তুমি এখানে আমাকে দেখিয়া কি বুঝিবে ? আমার সঙ্গে হুগলি চল, তাহ'লে কতকটা বুঝিতে পারিবে। ছেলেবেলায় বিয়ে হইলে কি এ সব হইত ?"

পিতামহী কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। তর্কে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছেন মনে করিয়া, পিতা বলিতে লাগিলেন, "এই আমার নূতন চাকরী—একটা পুতুলখেলার ব্যাপার লইয়া কি চাকরীটি খোয়াইব—আখের নষ্ট করিব ?"

"হুঁ ! তাহ'লে সপিণ্ডকরণের কি করিবে ?"

"তুমি কি সত্যসত্যই পাগল হইয়াছ ? এ কাজ—আর তোমার নাতির বিবাহ—এ দুই কি এক সমান ? সপিণ্ডকরণের সময় সব কাজ ফেলিয়াও আমাকে আসিতে হইবে। তখন ছুটি চাইলে ছুটি পাইব। আর এ কার্য্যে ছুটি পাওয়া দূরে থাক্, শিশুপুত্রের বিবাহ দিয়াছি, এ কথা যদি মেজেষ্টার সাহেবের কানে ওঠে, তখনি আমার চাকরী যাইবে।"

চাকরী যাইবার কথা শুনিয়াই পিতামহী নিরুত্তর রহিলেন। তথাপি পিতা বলিলেন—"ভাবিবার প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হইলে, তাঁহাকে নিরাশ হইতে নিষেধ করিও। তাঁহাকে বলিয়ো, যদিও আমার একান্ত অনিচ্ছা, তথাপি যখন কথা দিয়াছি, তখন তাঁহার কন্যার সহিত হরিহরের বিবাহ আমাকে দিতে হইবে। কিন্তু এখন নয়—কিছুদিন পরে। পুত্র দুইটা পাশ না হইলে, তাহার কাছে বিবাহের কথা তুলিতেই দিব না।"

"সে কত দিন পরে ?"

"সেখানে হরিহরকে যদি চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলেও অন্ততঃ ছয় বৎসর। তাহার কমে ত হইতেই পারে না।"

"ততদিন ব্রাহ্মণ মেয়েকে রাখিতে পারিবে কেন?"

"তা কি করিব!—তা ব'লে আমি শিশু পুত্রের বিবাহ কিছুতেই দিতে পারিব না।"

"বিবাহ?—কার বিবাহ?"—বলিয়া আমার মা রণচণ্ডিকার আবির্ভাবের মত পিতা ও পিতামহীর কথোপকথনস্থলে উপস্থিত হইলেন।

পিতা বোধ হয়, তাঁহার আকস্মিক উপস্থিতিতে কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। তিনি মাতাকে বলিলেন,—"তুমি এখানে আসিলে কেন?"

মাতা পিতার কথায় উত্তর না দিয়া, পিতামহীকে বলিতে লাগিলেন,— "পুত্রকে নির্জ্জনে পাইয়া তাহাকে ফুস্‌লাইয়া আমার কচিছেলের মাথা খাইবার চেষ্টায় আছ! ও কেমন করিয়া আমার ছেলের বিবাহ দেয়—দিক্ দেখি।"

পিতা। ছেলের বিবাহ দিতেছি, তোমাকে কে বলিল? ভবিষ্যতে দিবার কথা হইতেছে।

মাতা। কার সঙ্গে? ওই মড়ুইপোড়া বামুনের মেয়ের সঙ্গে? আজই হ'ক, কালই হ'ক, যেদিন তা দিবে, সেই দিনই আমি গলায় দড়ী দিয়া মরিব।

এই বলিয়া মাতা পিতামহীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তুমি কি মনে করিয়াছ, বামুন সে দিন প্রাতঃকালে আসিয়া তোমাকে যা বলিয়া গিয়াছে, আমি শুনি নাই? আমি হাড়ীমুচি-ঘরের মেয়ে—কেমন?"

পিতামহী বিস্মিতার মত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাড়ীমুচির ঘরের মেয়ে, এ কথা তোমাকে কে বলিল ?"

"কে বলিল, জান না ? এখন ন্যাকা সাজিতেছ ?"

পিতা, মাতাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। মাতা নিরস্ত হইলেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"সে বামুন, সে দিন ভোরে আসিয়া বলে নাই, আমি 'অঘরের' মেয়ে। আমি আমার পুত্রকে শাসন করিব, তাহাতে সে বামুনের এত মায়া উথলিয়া উঠিল কেন ? সে আমাকে অকথ্য কথা শুনাইবার কে ? আমি কে, সে জানে না ? তার মত কত বামুন আমার বাপের ঘরে রসুয়ের বৃত্তি করিতেছে।"

পিতামহী বলিলেন—"তা করিতে পারে। কিন্তু মা ব্রাহ্মণ ত মিথ্যা কথা ক'ন নাই। তুমি আমাদের ঘর নও।"

"তবে ভালঘরের বধূ আনিয়া আগে ছেলের বিবাহ দাও, তার পর নাতির বিয়ের ব্যবস্থা কর।"—বলিয়াই ক্রোধান্ধ জননী পিতার ঘাড়ের উপর দিয়াই যেন এক রকম চলিয়া গেলেন। পশ্চাতে দেয়াল না থাকিলে পিতা বোধ হয়, ভূপতিত হইতেন।

পিতা দেওয়ালের সাহায্যে পতন হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়াই "কর কি—কর কি, লোকে জানিবে, আমার মানসম্ভ্রম নষ্ট হইবে"—বলিতে বলিতে মাতার অনুসরণ করিলেন।

এই কথোপকথন হইতে আমি বুঝিলাম, আমার লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া, সমবেদনা জানাইতে, ব্রাহ্মণ কোন একদিন পিতামহীর সহিত দেখা করিয়াছিলেন। মা অন্তরাল হইতে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলেন। আর বুঝিলাম, ক'নের সঙ্গে আমার দেখা এ জন্মের মত বুঝি আর হইবে না।

অল্পক্ষণ পরেই পিতা ফিরিলেন। পিতামহী, মাতা ও পিতা উভয়েরই আচরণে স্তম্ভিতার ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। পিতা তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, ঈষৎ গ্রীবাভঙ্গে বলিলেন,—"মা! তুমি সেই ব্রাহ্মণকে তাহার কন্যার জন্য অন্য কোনও স্থানে পাত্র দেখিতে বলিয়ো। আমার পুত্রের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে পারিব না।"

"বলিতে হয়, তুমিই বলিয়ো।"

"বেশ—আমিই বলিব।"—বলিয়াই পিতা আমাকে ডাকিলেন। আমি বই পড়িবার ব্যপদেশে পিতামহীর ঘরের তক্তপোষে বসিয়া, একটি ক্ষুদ্র জানালার ফাঁক দিয়া সমস্ত দেখিতেছিলাম। পিতার ঘরের দাওয়ায় এই সকল কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

আমি পিতার কাছে উপস্থিত হইবামাত্র, তিনি আমার বই-শ্লেট সমস্ত গুছাইয়া লইতে বলিলেন। আমাদের সেই দিনেই বৈকালে রওনা হইতে হইবে। পিতামহী বলিলেন,—"মিস্ত্রী আসিলে তাহাকে আমি কি বলিব?"

"এখন থাক্। আমি ফিরিয়া আসিলে ঘর করিবার ব্যবস্থা করিব।"

আমাদের মেটে বাড়ী। তবে ঘরগুলা যথাসম্ভব বড় ও সুদৃশ্য ছিল। অল্পদিন পূর্ব্বে কোঠা করিবার অভিলাষে পিতামহ একলক্ষ ইট পোড়াইয়াছিলেন। তাহা দিয়া সর্ব্বাগ্রে তিনি একটি ঠাকুরঘর ও একটি বৈঠকখানা প্রস্তুত করাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। পিতার বি-এ পাশের পর হইতে দেশের দুইচারিজন ভদ্রলোক প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। সুতরাং একটি বৈঠকখানার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। অবশিষ্ট ঘরগুলিও তাঁহার কোঠা করিবার ইচ্ছা ছিল। এখন

পিতা হাকিম। তাঁহার চালাঘরে বাস ত' কোনও ক্রমেই চলিতে পারে না, এইজন্য পিতামহী ঘরগুলাকে কোঠা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

মিস্ত্রীও আসিয়াছিল। কথা ছিল, কর্ম্মস্থানে যাইবার পূর্ব্বে পিতা বাড়ী করিবার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন।

সে ব্যবস্থা আর করা হইল না। আমার এক কুক্ষণে খাওয়া-ফলার সকল কাজের বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইল।

সেই দিন অপরাহ্ণে পিতা আমাদের লইয়া হুগলি যাত্রা করিলেন।

(১৫)

রাত্রির শেষভাগে আমরা কালক্লিষ্টা ভাগীরথীর বিশীর্ণ দেহে ভর করিলাম। আজ ভাগীরথীর এই দুর্দ্দশা; কিন্তু চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ইনি পূর্ণাঙ্গী, নিত্যবেগবতী ও তরঙ্গমালিনী ছিলেন। অসংখ্য পোত তৎকালীন বণিক্‌গণের আশার ভাণ্ডার বুকে করিয়া, এক সময় এই গঙ্গারই বুকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সরস্বতীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে এক দিন সপ্তগ্রামের—বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধিশালী বন্দরের—যে অবস্থা হইয়াছিল, জাহ্নবী-স্রোতের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতীরবর্ত্তী সমৃদ্ধিশালী আমাদের দেশে গ্রামসমূহেরও সেই অবস্থা হইয়াছে।

অনুমান ভিন্ন এখন আর অন্য কোন উপায়েএ দেশে জাহ্নবীর অস্তিত্ব নির্ণয়ের উপায় নাই। এখনও গ্রামপ্রান্তে অনেক ভগ্নদেবালয় দৃষ্টিগোচর হয়। স্থানে স্থানে মৃত্তিকাপ্রোথিত অনেক দেবমূর্ত্তি জলাশয়-খননকারীর খনিত্র আশ্রয় করিয়া সূর্য্যমুখদর্শনের জন্য উপরে উঠে। সময়ে সময়ে দুই একটা নৌকার ভগ্নাংশও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এখন ইহার একটি ক্ষুদ্র শালতী-সঞ্চালনেরও শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এক সময় ইহার উপর দিয়া শ্রীমন্ত সদাগরের সাত ডিঙ্গা পণ্যসম্ভারে পূর্ণ করিয়া সিংহল গিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পার্ষদ সঙ্গে লইয়া এই গঙ্গারই উপর দিয়া উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন।

এখন ইহাকে গঙ্গা বলিতে লজ্জা বোধ করে। মধ্যে একটি সামান্য শীর্ণ খাল। আর খালের উভয় পার্শ্বে শস্যক্ষেত্র। স্থানে স্থানে গঙ্গাগর্ভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যানে পরিণত হইয়াছে। তথাপি দেশবাসী ইহাকে গঙ্গা বলিতে ছাড়ে না। জাহ্নবীর আকৃতি গিয়াছে, প্রকৃতি গিয়াছে; তথাপি উহার উপর দেশের লোকের ভক্তি যায় নাই। এই ক্ষুদ্র শীর্ণদেহ খালের জল এখনও গঙ্গাজলের ন্যায়ই তাহাদের চক্ষে পবিত্র। লোকে ইহার বক্ষে স্থানে স্থানে সরোবর খনন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই জলজ-গুল্ম-বহুল। সেই সকল গুল্মাচ্ছাদিত পানাভরা পঙ্কিল জলে এখনও হিন্দু নরনারী, "সদ্যঃপাতকসংহন্ত্রী সুখদা মোক্ষদা" জ্ঞানে, অসঙ্কোচে ডুব দিয়া থাকে।

আমরা এই গঙ্গায় শালতী ভাসাইয়া চলিয়াছি। ভাসাইয়া বলি কেন, গঙ্গাকে প্রহার করিতে করিতে শালতীকে বংশদণ্ডের সাহায্যে অগ্রসর করিতেছি। পিতা যখন প্রথমবার হুগলীতে যান, তখন বর্ষার শেষ। শস্যক্ষেত্র জলপূর্ণ, খালেও যথেষ্ট স্রোত ছিল। এখন জ্যৈষ্ঠের শেষ। সবেমাত্র বর্ষার সূচনা হইয়াছে। সেই জন্য খালটা শালতীর পক্ষে কতকটা সুগম হইয়াছে।

এই খাল ধরিয়া আমরা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মগরায় উপস্থিত হইব। সেখানে আহারাদি সমাপন করিয়া আবার যাত্রা করিব। সকাল সকাল

পৌছিবার উদ্দেশ্যে আমরা রাত্রিশেষেই যাত্রা করিয়াছি। স্থলপথে মা'কে ও বালক আমাকে লইয়া বার বার উঠানামা করিতে হইবে বলিয়া, পিতা বরাবর জলপথেই আমাদিগকে কলিকাতায় লইয়া যাইবেন, স্থির করিয়াছেন। যাইতে কিছু বিলম্ব হইবে বটে, কিন্তু ঝঞ্ঝাট কম।

আমরা যে শালতীতে উঠিয়াছি, তাহা সেই জাতীয় যানের পক্ষে যতটা বড় হওয়া সম্ভব, তত বড়। পিতা ঝাছিয়া বাছিয়া এইরূপ শালতী ভাড়া লইয়াছেন। আমরা সর্ব্বশুদ্ধ চারি জন আরোহী, তাহার উপর আবার মায়ের সেই সেকালের মন্দিরাকৃতি পেঁটরা, কাঠের সিন্দুক, বেতের ঝাঁপি, ও বালিস-বিছানার মোট। ছোট শালতীতে সকলের স্থান হইত না।

শালতীর টাপরের মধ্যে পেঁটরা ও সিন্দুকটি রাখিয়া মা তাহার নিকটে বসিলেন। আমি তাঁহার পার্শ্বে এবং আমার পার্শ্বে পিতা ঝাঁপি ও কাপড়ের মোট লইয়া। গণেশ খুড়া টাপরের বাহিরে বসিল।

টাপরের আচ্ছাদনে এতটুকু ফাঁক নাই যে, উভয় পার্শ্বের দৃশ্য দেখিব। রাত্রি তখন তিনটা। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। দুই পাশে কেবল মাঠ। মাঠের প্রান্তে দূরে গাঢ় অন্ধকার কোলে করিয়া গ্রামপ্রান্তস্থ আম, কাঁটাল, অশ্বথ, বটের গাছ। দেখিবার এমন বিশেষ কিছুই ছিল না যে, তাহা দেখিতে আগ্রহ হইবে। তথাপি আমি টাপরের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিতে লাগিলাম। তাহাতে টাপরে আমার মাথা দুই তিন বার আহত হইল। প্রথম দুই এক বার চাঞ্চল্যের জন্য পিতা কর্তৃক তিরস্কৃত হইলাম। মা আমাকে ঘুমাইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ঘুম ত তাঁহার আদেশ-অনুযায়ী আমার চোখে আশ্রয় লইবে না। আমি কিয়ৎক্ষণ মায়ের কোলে মাথা দিয়া চোখ টিপিয়া পড়িয়া রহিলাম। ঘুম আসিল না।

অল্পক্ষণ পরেই পিতা বলিয়া উঠিলেন, "যাক্, বাঁচা গেল। গ্রাম পার হইয়াছি।"

মা বলিলেন,—"আপদ্ চুকিল।"

আমি তাঁহাদের কথার ভাব সম্পূর্ণ বুঝিতে অক্ষম হইলেও, গ্রামপারের কথা শুনিয়া, সহসা মায়ের কোল ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলাম। কেন যে উঠিলাম, তাহা বুঝি নাই। বুঝি, জন্মভূমির জন্য চিরান্তঃস্থিত মমতা সহসা আহত হইয়া মস্তিষ্কপথে ছুটিল। আমি বসিয়াই দাঁড়াইতে গেলাম। অমনি মাথাটা বিষমবেগে টাপরে লাগিয়া গেল। আমি মায়ের বক্ষের উপর সবেগে পতিত হইলাম।

মায়ের বক্ষে আঘাত লাগিল। তিনি মৃদু আর্ত্তনাদ করিয়া আমার পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত করিলেম। মায়ের অঙ্গে আঘাত লাগায়, আমি নিজের আঘাত-যন্ত্রণা মনেই রাখিয়া, আবার তাঁহারই পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলাম।

পিতা এইবারে আমার প্রতি সদয় হইলেন। বলিলেন,—"মাঠ দেখিতে কি তোর বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে? তা হ'লে আমার সুমুখে আসিয়া বোস্।"

মা বলিলেন,—"তোমারই কাছে রাখ। আর বোঝ, অসৎশিক্ষায় ছেলে কতটা বেসহবৎ হইয়াছে।"

আমি পিতার সম্মুখে বসিলাম।—পিতা বলিলেন,—"সাবধান, এখানে যেন উঠিবার চেষ্টা করো না। তা' হলেই জলে পড়িয়া যাইবে।"

যেখানে বসিলাম, সেখান হইতে মুখ বাহির করিলেই খালের উভয় তীরই দৃষ্টিগোচর হয়। আমি মুখ বাহির করিয়াই দেখিলাম। যে স্থানের

উপর দিয়া শালতী চলিয়াছে, গঙ্গার একটি তীর তাহার অতি নিকটে। অপরটি প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে।

নিকটের তীরে যে গ্রাম, আমরা যেন তার গা ঘেঁসিয়া চলিয়াছি। আমি দেখিলাম। ভাল করিয়া দেখিলাম, কিন্তু আমাদের গ্রাম বলিয়া বুঝিতে পারিলাম না। আমি পিতাকে বলিলাম,—"কৈ বাবা, এ ত আমাদের গ্রাম নয়।"

পিতা কিন্তু আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। কথাটা যেন তিনি শুনিতে পাইলেন না। তিনি গণেশ খুড়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "কি হে গণেশ, ঘুমাইতেছ না কি?"

সত্যই তখন গণেশ খুড়া ঘুমাইতেছিল। পিতার কথা শুনিবামাত্র সুপ্তোত্থিত হইয়াই বলিয়া উঠিল,—"এঁ—"..

পিতা বলিলেন—"বেশ গণেশ, বেশ! এই অবস্থায় তুমি যে ঘুমাইতে পারিয়াছ, ইহাতে তোমার বাহাদুরী আছে।"

বাহাদুরীই বটে! তাহার পার্শ্ব দিয়া মাঝির 'বোঁটে' অবিরাম যাতায়াত করিতেছে; খুড়ার তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না। লেপ-বালিসের নীচে মাথা গুঁজিয়া খুড়া বেশ এক ঘুম ঘুমাইয়া লইল।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ ঠাকুরপো, ইহারই মধ্যে কখন্ তোমার ঘুম আসিল?"

পিতা বলিলেন,—"ডোঙ্গায় উঠিবামাত্র। ইহা আর বুঝিতে পারিলে না! জাগিয়া থাকিলে গণেশ কি অন্ততঃ একটা কথাও কহিতে ছাড়িত! কেমন গণেশ, না?"

খুড়া বলিল,—"হাঁ দাদা, তাই বোধ হয়।"

পিতা। গণেশ! দেখিতেছি, তুমিই যথার্থ সুখী।

গণেশ। হাঁ দাদা, আমি কিছু সুখী। যাত্রার উদ্যোগ করিতে, এবং মা ও বউকে বুঝাইতে ভুলাইতে সারা রাত্রিটাই চলিয়া গেল। একটি বারের জন্য চোখের পলক ফেল্‌তে পাই নাই। রাত্রিটা আমি আদতেই জাগিতে পারি না। এই জন্য চোখ দু'টা কখন্ আপনি বুজিয়া গিয়াছে।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাহাকে কি বলিয়া ভুলাইলে?"

খুড়া। বউ কাঁদিবার উদ্যোগ করিতেছিল। তাহাকে বলিলাম,—"কাঁদিসনে ক্ষেপী, আমি তোর জন্য গেঁজে পূরিয়া টাকা আনিতে চলিয়াছি।" মা বলিল,—"বাবা! কোম্পানীর চাকরী করিতে চলিয়াছ। খুব হুঁসিয়ার হইয়া কাজ করিবে। কোনও রকমে কোম্পানীকে চটাইয়ো না।" আমি বলিলাম,—"আমার কাজ দেখিয়া কোম্পানীর বাপ পর্য্যন্ত খুসী হইয়া যাইবে। কোম্পানী ত ছেলে-মানুষ।" এই রকম কথার উপর কথা—রাত্রি বারটা বাজিয়া গেল। তার পর তোমাদের তল্পীতল্পা বাঁধিতে, গোছ করিতে, ডোঙ্গায় উঠাইতে দুইটা। ঘুমাইবার আর এক দণ্ডও সময় পাইলাম না।

পিতা। এমন কি কাজ করিতে জান যে, কোম্পানী দেখিয়া তুষ্ট হইবে?

খুড়া। এমন কি কাজ আছে যে, আমি করিতে জানি না? ঘর-ঝাঁট হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত বাড়ীর সমস্ত কাজ ত আমিই করি। মা দিনরাত এ বাড়ী ও বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। বউ নিজের শরীর লইয়াই ব্যস্ত থাকে। কাজ করিবে, কখন্?

পিতা। রান্নার কাজও কি করিতে হয় ?

খুড়া। দুইবেলা। করিতে হয় বলিয়া করিতে হয় !

পিতা। বেশ ভাই, বেশ ! তা হ'লে তোমার চাকরীর ভাবনা কি ?

মাতা। চাকরী করিতে হইলে যে কিছু বিদ্যা থাকা চাই ঠাকুরপো !

খুড়া। কেন ! বিদ্যের অভাব কি ? গোপাল গুরুম'শার পাঠশাল। অঘোর দা'র যেখান থেকে বিদ্যে, আমারও বিদ্যে সেইখান থেকে। কুড়ুবা কুড়ুবা কুড়ুবা লিজ্যে ; কাঠায় কুড়ুবা কাঠায় লিজ্যে। গোবিন্দ খুড়ার বাগানের কলাগাছ শেষ করিয়াছি। বাঁশ-ঝাড়ের কঞ্চি নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। আমার বিদ্যা নাই ! তবে বিদ্যা দাদার মতন হয় নাই, এই যা বলিতে পার। তবে দাদার বিদ্যা দাদার মতন, ছোট ভাইয়ের বিদ্যা ছোট ভাইয়ের মতন।

পিতা। শুধু বিদ্যা হ'লে ত হবে না। কোম্পানী বড় পেটুক। তাহাকে ভাল ভাল তরকারী না খাওয়াইলে সে খুসী হবে না।

খুড়া এই কথা শুনিয়াই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল,—"অঘোর দা, তবে ত কোম্পানীকে হাতের মুঠোর ভিতরে পূরিয়াছি।"

মা বলিলেন,—"কই ভাই, তোমার বিদ্যা ত আমি জানিতে পারিলাম না।"

"বেশ, আগে মগরায় চল। আজই তোমাকে বিদ্যার পরিচয় দিব।"

এই কথোপকথনেই গণেশ খুড়ার প্রকৃষ্ট পরিচয় হইল।

আমি কিন্তু গ্রামের পানেই চাহিয়াছিলাম। আমাদের গ্রাম কি না, বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। সেই অবস্থায় গণেশ খুড়ার কথা যতটা

শুনিবার, শুনিয়াছিলাম। আমি বিশেষ দৃষ্টিতে যখন দেখিলাম, সেটা আমাদের গ্রাম নয়, তখন সে সম্বন্ধে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কই বাবা, এ ত আমাদের গ্রাম নয় !"

আমার এই কথা শুনিয়াই গণেশ খুড়া বলিয়া উঠিল,—"ও হরি ! আমাদের গাঁ, সে কোথায় ! কখন্ তাকে ফেলিয়া আসিয়াছি। তোমার ওই শ্বশুরের গাঁকেও ফেলিয়া আসিয়াছি।"

পিতা কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"থাক্ থাক্।"

গণেশ খুড়া পিতার আদেশ মানিল না। আবেগের সহিতই বলিয়া উঠিল,—"ওই ওই ! ওই দেখ বাবাজী, সাভ্যোম ম'শায়ের বাগানের অশথ গাছ লী লী করিতেছে।"

"চুপ কর না গণেশ !" পিতা ঈষৎ ক্রোধের সহিত বলিয়া উঠিলেন।

কিন্তু নিষেধ মানে কে ? গণেশ খুড়ার তখন প্রাণের কবাট খুলিয়া গিয়াছে। সে আবার বলিল,—"সত্যি অঘোর দা ! হয় না হয়, তুমি দেখ। ওই অশথ-গাছ আঙুল নাড়িয়া যেন হরিহরকে যাইতে ইসারা করিতেছে।"

আমি অশথ-গাছটার আঙুল-নাড়া দেখিবার জন্য টাপর হইতে সাগ্রহে গলা বাড়াইতে গেলাম। পিতা আমার ঘাড়টা ধরিয়া যথাস্থানে বসাইলেন।

মাতাও ঈষৎ ক্রোধের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"কর কি গণেশ ! বাবু বার বার তোমাকে চুপ করিতে বলিতেছেন, আর তুমি পাগলের মত কি ছাইপাঁশ বকিয়া যাইতেছ ?"

মায়ের মুখে নিজের নাম উচ্চারিত হইতে গণেশ খুড়া এই প্রথম

শুনিল। সে আর গ্রাম সম্বন্ধে কোনও কথা না কহিয়া বলিল,—"বউ ঠাকরুণ! যখন তোমার মুখ থেকে আমার নামটা বেরিয়ে পড়েছে, তখন বুঝ্লুম, তোমার সত্যি সত্যি রাগ হয়েছে। আর ও গাঁয়ের কথা বলিব না।"

পিতা বলিলেন,—"তুমি এখন নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাও।"

"বেশ দাদা!"—বলিয়াই গণেশ খুড়া আবার মোটের উপর মস্তক রক্ষা করিল।

শালতী-চালক বলিল,—"ওইটাই সাভ্যোম ম'শায়ের বাস্ত বটে। খুড়াঠাকুর ভুল করে নাই।"

পিতা বলিলেন,—"বেশ। তুমি এখন একটু জোরে চালাইয়া চল।"

গণেশ খুড়া মোটের উপর মাথা দিতে না দিতেই আবার ঘুমাইয়া পড়িল। পিতা সেটা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া মাতাকে অনুচ্চস্বরে বলিলেন,—"মূর্খটা ঘুমটাকে দেখিতেছি খুব সাধিয়াছে।"

মা বলিলেন,—"ওর আর সাধিবার কি আছে! কাজের মধ্যে দুই। খাই আর শুই।"

এই বলিয়াই তিনি আমাকে বলিলেন,—"কেন মিছে বসিয়া আছিস্ হরিহর? এখনও অনেক রাত আছে। আমার কোলে মাথা দিয়া ঘুমা। এ পোড়া দেশে কি দেখিবার আছে, তা দেখ্বি। যে দেশে বাবু আমাদের লইয়া যাইতেছেন, সেই দেশে চল্। কত কি দেখিতে পারিস্, বুঝিব।"

পিতা বলিলেন,—"তোকে কাল কলকেতা দেখাইব। তার পর হুগলীতে গিয়া ইমামবাড়ী দেখিবি? সে দেখিলে আর তোর এ দেশের নাম পর্য্যন্ত করিতে ইচ্ছা হইবে না।"

নূতন দেশ দেখিবার আশ্বাসে আশ্বাসিত আমি আবার মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শয়ন করিলাম।

তখন ঘুম আসে নাই। সবেমাত্র আসে আসে হইয়াছে। পিতা মনে করিয়াছেন, আমি ঘুমাইয়াছি। সেই মনে করিয়াই বোধ হয়, তিনি মাকে বলিলেন,—"এখন বুঝিতেছি, মা ছেলেটার মাথা খাইতে বসিয়াছিলেন।"

মাতা। দেখ—বুঝে দেখ। শ্বশুরবাড়ী দেখিবার জন্য বালকের আগ্রহটা দেখিলে! তবুত এই কয়মাস ওকে শাসনে শাসনে রাখিয়াছি।

পিতা। এখন বছর পাঁচ ছয় ত ওকে এদিকে পাঠাইবার নাম করিব না।

মাতা। তুমি যে পুরুষ, তুমি কি তা পারিবে? মা চিঠিতে একটু কাঁদাকাটার কথা লিখিলেই তুমি ছেলেকে সঙ্গে লইয়া ছুটিয়া আসিবে।

পিতা। কিছুতেই না। এখন বুঝিতেছি, ছয়মাস আগেই তোমাদের লইয়া যাওয়া উচিত ছিল।

মাতা। আমার কথাকে ত মূল্যজ্ঞান কর না। আমি কে ত কে। তোমাদের শত্রু বই ত নয়। অথচ ছেলেকে দশমাস দশদিন গর্ভে ধরিয়াছি।

পিতা। এত রাত্রিতে বাহির হইলাম কেন জান? পাছে বামুন খবর পাইয়া পথ আগুলিয়া বিরক্ত করে। যতক্ষণ না বামুনের গ্রাম পার হইয়াছি, ততক্ষণ মনে বড়ই উদ্বেগ ছিল।

মাতা। উদ্বেগ কি গিয়াছে মনে করিয়াছ? বামুন সেই হুগলী পর্য্যন্ত ধাওয়া করিবে।

পিতা। সেখানে গেলে তাহাকে বুঝিয়া লইব।

মাতা। পারিবে?

পিতা। দেখিয়ো।

মাতা। তবে তোমাকে মনের কথা বলি। ছেলের আমার বিবাহ না হয়, সেও স্বীকার, তবু আমি মড়ুই-পোড়া বামুনের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিব না। সে আমাকে অঘরের মেয়ে বলিয়াছে।

পিতা। বামুন অতি নির্ব্বোধ।

মাতা। নির্ব্বোধ নয়—হারামজাদা। সে কি আমাদের ঘর কি, জানে না? আমার বাপের মত কুলীন তোমাদের দেশে আর কেউ আছে?

পিতা। সে কথা ছাড়িয়া দাও না। আর কি কুলীন-মৌলিকের ইতরবিশেষ থাকিবে?

মাতা। ও বামুন ত মড়ুইপোড়া। তোমরা বোকা, তাই উহার বেটীর সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছ। আমার বাবা হইলে উহাদের ঘরের ছায়া মাড়াইত না।

পিতা। যাক্, বিবাহ ত আর হইতেছে না। তখন ঘরের কথা তুলিবার আর প্রয়োজন কি? তা যা হ'ক, একি করিলে? এক আপদ্ হইতে মুক্ত হইতে চলিয়াছি, আবার এ আপদ্ সঙ্গে লইলে কেন? এ গণ্ডমূর্খটাকে সেখানে লইয়া কি করিব?

মাতা। ওর মা আমার যথেষ্ট শুশ্রূষা করিয়াছে। আর আমার হাত দুটি ধরিয়া প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়াছে। কাছারীতে যে কোন একটি কাজ উহাকে করিয়া দিয়ো।

পিতা। কাজের মধ্যে এক কাজ রাঁধুনি-বৃত্তি। অন্য কোনও কাজ ও মূর্খের দ্বারা হইবার সম্ভাবনা নাই।

মাতা। ভাল, এখন চলুক। কোন কাজ করিতে না পারে, আমাদের রসুই করিবে।

ইহার পরেই পিতামাতা নিস্তব্ধ হইলেন এবং এই নিস্তব্ধতার অবসরে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

(১৬)

প্রভাতে মগরায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে চটিতে আহার-কার্য্য সমাধা করিলাম। গণেশ খুড়াই রাঁধিল। তাহার হাতের রান্নার অপূর্ব্ব আস্বাদন আজিও পর্য্যন্ত আমার মুখে লাগিয়া রহিয়াছে। তাহার পর অনেক স্থানে ভাল ভাল রসুয়ের রান্না খাইয়াছি; কিন্তু সে দিন যেমন তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছিলাম, এরূপ আহারে তৃপ্তি আর কখনও লাভ করি নাই। আমি যে শুধু একাই তৃপ্ত হইয়াছি, তাহা নহে। পিতা ও মাতা উভয়েই পরম তৃপ্তির কথা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। মাতা বলিলেন,—"তাই ত ঠাকুরপো, রান্নায় তোমার এমন মিষ্টি হাত, তা তো আগে জানিতাম না। আগে জানিলে যে, উপযাচক হইয়া তোমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিতাম।"

পিতা বলিলেন,—"তোমার যখন হাতের এত গুণ, তখন তোমার চাকরীর ভাবনা কি গণেশ!"

গণেশ খুড়া বলিল,—"কেমন অঘোরদা, কোম্পানী খুসী হইবে না?"

পিতা ও মাতা উভয়েই তখন গণেশ খুড়াকে চাকরী সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত

হইবার আশ্বাস দিলেন। আমি বুঝিলাম, গণেশ খুড়ার কি চাকরী হইবে। কিন্তু গণেশ খুড়া বুঝিল না।

আহারান্তে আবার আমরা শালতীতে উঠিলাম। এবারে প্রখর রৌদ্র; সুতরাং গণেশ খুড়ার আর টাপরের বাহিরে থাকা চলিবে না। পিতা তাহাকে টাপরের ভিতরে আসিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু খুড়া ভিতরে আসিল না। গামছাখানা জলে ভিজাইয়া মাথায় দিয়া বাহিরে বসিল। বলিল,—"না দাদা! আমি বাহিরেই থাকিব। রোদজল আমার সওয়া আছে। আর বামুনের ছেলে হয়ে যখন চাকরী করিতেই হইবে, তখন রোদজলকে ভয় করিলে চলিবে কেন?"

পিতা। চাকরী করাটা কি খারাপ কাজ?

খুড়া। খারাপ বই কি দাদা! যে কাজ বাপ-ঠাকুরদা করেন নাই, সে কাজ ভাল কেমন করিয়া বলিব! তাহারা ত কেহ মূর্খ ছিল না। বংশের মধ্যে মূর্খ কেবল আমি। ওইত আমাদের সবার বড় পণ্ডিত সাভ্যোম মশাই। কোম্পানী তাকে কত টাকা দিতে চাইলে, তবু বামুন চাকরী নিলে না।

মাতা। সে যে সবার বড় পণ্ডিত, এ কথা তোমারে কে বলিল?

খুড়া। সকলে বলে, তাই শুনি। আমি মূর্খ, আমি কি জানিব?

পিতা। বটে! তা হ'লে তুমি বুঝি অনিচ্ছায় আমাদের সঙ্গে যাইতেছ?

খুড়া। ইচ্ছা অনিচ্ছা বুঝি না। মা তোমাদের সঙ্গে যাইতে বলিয়াছে —চলিয়াছি। আবার আসিতে বলে—আসিব। না বলে, আসিব না।

মাতা। এ কথা আগে বলিলে ত আমরা তোমাকে সঙ্গে আনিতাম না।

খুড়া একথার কোন উত্তর করিল না, চাকরীর লঘুত্ব চিন্তায় বুঝি ব্যাকুল হইয়া আপনার মনে গান ধরিল—

"তারা কোন্ অপরাধে সুদীর্ঘ মিয়াদে সংসার গারদে থাটি বল্।"

এই সময়ে পিতা ও মাতা পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিলেন। মাতা বলিলেন,—"তবে আর কেন? পার ত এই স্থান হইতেই বিদায় দাও!"

পিতা ডাকিলেন—"গণেশ!"

খুড়া। কি অঘোর দা'।

পিতা। তুমি এইখান হইতে বাড়ী ফিরিয়া যাও। আমি তোমাকে কিছু অর্থ দিতেছি।

খুড়া। কেন, আমি কি চাকরী করিতে পারিব না?

পিতা। না। তুমি লেখাপড়া জান না। তুমি সেথানে কি চাকরী করিবে? তোমার মায়ের একান্ত অনুরোধে তোমাকে লইয়া চলিয়াছি; কিন্তু তোমাকে যে কি কাজে লাগাইব, এখনও পর্য্যন্ত আমরা স্বামী-স্ত্রীতে তাহা ঠিক করিতে পারি নাই।

মাতা। আমাদের বাসায় রসুই করা ভিন্ন সেথানে তোমার অন্য কোন কাজ করিবার নাই।

খুড়া। বেশ, তাই করিব। বউ ঠাকরুণ! তোমাদের সেবা ত আমার চাকরী নয়!

পিতা। তা যদি করতে ইচ্ছা কর চল। যতদূর যত্নে তোমাকে রাখা সম্ভব, ততদূর যত্নে তোমাকে রাখিব। হুগলী সহরে অন্যান্য ব্রাহ্মণে যাহা পায়, তোমাকে তাহার দ্বিগুণ দিব।

খুড়া। সে কি অঘোরদা'! তোমার ঘরে রাঁধিব, তাহাতে মাহিনা লইব! মূর্খ বলিয়া কি আমি এতই হীন হইয়াছি!

পিতা। তা' লইতেই হইবে। তুমি একা হইলে কথা স্বতন্ত্র ছিল। তা' নয়, তুমি সংসারী। তোমার মা আছে, স্ত্রীপুত্র আছে। সংসার স্বচ্ছলে চলে না বলিয়া তোমার মা আমাদের সঙ্গে পাঠাইতেছেন। আমরাই কি এত হীন যে, তোমাকে শুধু শুধু খাটাইব?

খুড়া। বেশ, তবে যা ইচ্ছা হয় দিয়ো।

মাতা। তোমার না লইতে ইচ্ছা থাকে, আমরা তোমার মা'র নামে তোমার বেতন মাসে মাসে পাঠাইয়া দিব।

খুড়া। হাঁ, তাই দিয়ো; আমি আর চাকরীর টাকা হাতে করিব না।

পিতা। আর এক কথা। তুমি সেখানে ইঁহাকে বউঠাকরুণ বলিয়া ডাকিতে পারিবে না।

খুড়া। তবে কি বলিব?

পিতা। 'মা' বলিবে।

খুড়া। তা উনি ত মা! 'জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা, জ্যেষ্ঠভার্য্যা সম মাতা।' বড় ভাই যখন বাপের তুল্য, তখন বড় ভাজ মা নয় ত কি?

সংস্কৃত শ্লোক গণেশখুড়ার মুখ হইতে নির্গত হইতে শুনিয়া পিতা হাসিয়া বলিলেন—"হাঁ ভাই, এইবার ঠিক বলিয়াছ।"

মা বলিলেন—"আর ইঁহারও নাম ধরিতে পাইবে না।"

"বেশ, শুধু দাদা বলিব।"

"না—তাও বলিতে পাইবে না।"

"তবে কি বাবা বলিব ?"

"তা কেন ? হয় হুজুর, আর তা বলিতে যদি না পার, শুধু 'বাবু' বলিবে।

"বাবু, হুজুর, কি দাদার চেয়ে বেশী মানের কথা হইল ?"

"হোক, না হোক, তোমাকে বলিতে হইবে।"

"আর হরিহরকে ?"

"খোকাবাবু বলিবে। নাম তুমি কাহারও ধরিতে পাইবে না।"

"কেন, ওরা কি সব আমার ভাসুর যে, নাম ধরিতে পাইব না।"

"তামাসা রাখ। যা বলিলাম করিতে পারিবে ?"

"চাকরী করিতে গেলেই কি এইরূপ করিতে হয়।"

"স্থানবিশেষে করিতে হয়। উনি ত আর যে সে লোক ন'ন। উনি হাকিম—দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। উঁহার সঙ্গে তোমার যে কোন সম্বন্ধ আছে, একথাও কেহ জানিবে না। জানিলে মানে খাট হইতে হইবে।"

গণেশখুড়া এই স্থানে কথা বন্ধ করিয়া শুধু সানুনাসিক সুরে গানের ভাঁজ করিতে লাগিল।

মাতা বলিলেন—"ঠাকুরপো, পারিবে ত ?"

"আর ঠাকুরপো কেন মা-লক্ষ্মী! সম্পর্কটা এইখান থেকে শেষ করিলেই ভাল হয়।"

"পারিবে না ?"

"কস্মিন্ কালেও না।"

এই বলিয়াই খুড়া তাহার তলপীটি মাথায় লইয়া ঝপাঙ্ করিয়া জলে পড়িল। সেথানে জল তাহার এক বুক হইবে। গণেশ হাঁটিয়া খালের

পাড়ের উপর উঠিল। পিতা বলিলেন—"গণেশ! পাঁচটা টাকা সঙ্গে লইয়া যাও।"

খুড়া উত্তর করিল না—মুখও ফিরাইল না। "তারা কোন অপরাধে" গায়িতে গায়িতে খালের ধার ধরিয়া চলিয়া গেল।

(১৭)

এইবারে হুগলীতে আসিয়াছি। এখানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতা সহর অতিক্রম করিয়াছি। বিপুলপ্রবাহিণী ভাগীরথীর বক্ষে প্রায় একটা পূরাদিন অবস্থিতি করিয়াছি। বাঁধা নিয়মের পরিবর্ত্তনশীল গ্রামের বালক একেবারে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন দেখিয়াছে। কূপ-মণ্ডূক ঘুম হইতে উঠিয়া একবারে সাগরে পড়িয়াছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ তাহার নাসিকারন্ধ্র আক্রমণ করিয়াছে, তথাপি সে সাগরের বিশালতার মধুরতা ভুলিতে পারিতেছে না।

হুগলী কলিকাতার মত সহর নয়, তথাপি সে আমাদের গ্রামের তুলনায় বড় সহর। তাহার উপর কলিকাতারই মত ভাগীরথী তাহার গাত্রস্পর্শ করিয়া চলিয়াছে। আমি এত বড় নদী পূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই। যেখানে আমাদের বাসস্থান নির্ণীত হইয়াছিল, সে স্থানটা হাকিম-দিগেরই বাসপল্লী। তাহার কিছু দূরে বড় বড় উকীলেরা বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিল। হাকিমপাড়া ও উকীলপাড়া একরূপ পরস্পর সংলগ্ন ছিল। সুতরাং সেস্থানটা একরূপ পাকা সহরেরই মত দেখাইত। অদূরে কাছারী কাছারীর সন্নিকটেই ভাগীরথী। মধ্যে একটি সুসংস্কৃত পথ। পথের, উভয় পার্শ্বে ঝাউগাছের সারি। আমি বহুকালান্তর হইতে কথা

কহিতেছি। সুতরাং স্মৃতি সম্বন্ধে কিছু বিভ্রম হইতে পারে। সহৃদয় পাঠক বর্ণনার ক্রটী ক্ষমা করিবেন।

আমার মত বন্য পল্লীবাসী বালকের পক্ষে এইরূপ সহরই যথেষ্ট। আমি নূতন মানুষ হইতে নূতন দেশে আসিলাম। পর্ণকুটীরবাসী ব্রাহ্মণ-পুত্র প্রথমে সভয়ে অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিল। যখন ভয় ঘুচিল, তখন পৈতৃক খড়ের ঘরখানি অল্পে অল্পে মমতাবিচ্ছিন্ন হইয়া দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

সে দিন মনে পড়ে। মনে করিতে গেলে কতকগুলা অশ্রুবিন্দু আমার চক্ষুকে আবৃত করিয়া ফেলে। তথাপি গৈরিকাঞ্চলে মুছিয়া আমি তাঁহাকে যথাসাধ্য পরিষ্কার রাখিয়াছি। কেন রাখিয়াছি? সে দৃশ্য পুনর্দ্দর্শনের সময় আসিয়াছে'। মহাভারতে শুধু বাসুদেবচরিত্র পড়িলে চলিবে না। ভীষ্ম-যুধিষ্ঠিরাদিকে শুধু দেখিলে দেখা সম্পূর্ণ হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে দুর্য্যোধনকে দেখিতে হইবে, শকুনি দুঃশাসনাদির সহিত পরিচয় করিতে হইবে। নতুবা মহাভারত পাঠ সম্পূর্ণ হইবে না। দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের মর্ম্ম বুঝিবে না। আর বুঝিবে না, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে হতাবশিষ্ট সদ্রৌপদী যাজ্ঞিক পঞ্চভ্রাতার মহাপ্রস্থান।

হুগলীতে আসিবার দুই চারি দিন পরেই পিতা আমাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। স্কুলে পাঠারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই আমার নূতন সঙ্গী জুটিল! তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই উকীলের ছেলে। দেশী হাকিমের পুত্রও যে ছিল না এরূপ নহে, তবে তাহাদের সংখ্যা অনেক কম। সকলেই এক ক্লাসে পড়িতাম না। দুই একজন উঁচু নীচু ক্লাসের ছাত্র লইয়া আমরা এক দল হইলাম। তাহাদের ভাবাভাব আমার গ্রাম্য সঙ্গীগুলির ভাষা

ও ভাব হইতে স্বতন্ত্র। প্রথম প্রথম আমি সলজ্জভাবে তাঁহাদের সহিত মিশিতাম। ক্রমে দিনের পর দিন যখন আমার সঙ্কোচভাব দূর হইয়া আসিল, এবং আমি নগরবাসে বিশেষরূপে অভ্যস্ত হইলাম, তখন আমার সহচরগুলির মধ্যে আমিই প্রকৃত নেতৃত্ব প্রাপ্ত হইলাম।

মাতারও দিন দিন পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। আমার পিতামহীর শাসনে আমাদের পল্লীগৃহে মা যেরূপ ভাবে দিন যাপন করিতেন, হুগলীতে আসিবার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি সে ভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। পিতার সপরিবারে আসিবার সংবাদ পাইয়া, আমাদের আসিবার দুই দিন পরেই হাকিম ও উকীল-মহিলারা মায়ের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। প্রথম দিন ব্রীড়ানম্র অবগুণ্ঠনবতী সঙ্কোচশীলা কুলবধূর সহিত তাঁহাদের প্রগল্ভ সম্ভাষণের সুবিধা হইল না।

মাসৈক সময়ের মধ্যে মায়ের এই সমস্ত লজ্জা-সঙ্কোচ দূর হইয়া গেল। একমাস পরে একদিন স্কুল হইতে ফিরিয়া দেখি, মা হাস্য-পরিহাসে ও প্রগল্ভতায় অপর মহিলাদের সমকক্ষ হইয়াছেন। আরও দুই চারি দিন পরে, আমি যেমন বালকবৃন্দের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছি, রমণীমণ্ডলী মধ্যে তাঁহারও সেই রূপ লাভ হইল। মা স্বভাবতঃ অতি বুদ্ধিমতী ছিলেন। অল্পদিবসের মধ্যেই তিনি সহরের আদবকায়দায় সুশিক্ষিতা হইয়া উঠিলেন।

যাক্, এসব পরিবর্ত্তনের কথা আর কহিব না। পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন, পরদিবসের অবস্থার তুলনায় পূর্ব্বদিবস বহু পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। এ পরিবর্ত্তনের ইতিহাস বলিয়া লাভ নাই; বক্তারও নাই— শ্রোতারও নাই। যুবকবৃন্দ এ ইতিহাস শুনিয়া নাসিকা সঙ্কুচিত করিবে।

আর সেই পরিবর্ত্তন-যুগের পরিবর্ত্তিত বৃদ্ধ কপোলকণ্ডূয়নে মৃদুহাস্তে পূর্ব্ব-যুগের বাঙ্গালীজীবনের স্বপ্নকথা গাঢ়তর নিদ্রায় ঢাকিয়া দিবে।

বলিয়া ফল কি? নবীন শ্রোতা বুঝিবে না। অধিকন্তু গোঁড়া বামুনের বামনাই বলিয়া রহস্য করিবে। প্রবীণ বন্ধু বুঝিলেও, যদি ফিরিতে ইচ্ছা করে, ফিরিতে পারিবে না। খাঁটি দুগ্ধ অম্লস্পর্শে দধিতে পরিণত হইয়াছে। দুগ্ধ দধি হয়। দধি আর দুগ্ধ হয় না।

হুগলীতে এক বৎসর কাটিল। দৈনন্দিন পরিবর্ত্তনে এই এক বৎসরেই আমরা নূতন জীবে পরিণত হইয়াছি। এই এক বৎসরে পিতামহীর সঙ্গে আমাদের সকল সম্বন্ধই এক রূপ বিচ্যুত হইয়া গিয়াছে।

পিতামাতা দেশে যে আর ফিরিবেন না, এটা স্থির হইয়া গিয়াছে। আমারও ফিরিতে আর ইচ্ছা নাই। নিম্নবঙ্গের, বিশেষতঃ আমাদের 'দক্ষিণ' দেশের পথগুলা বর্ষাকালে বড়ই দুর্গম হইয়া থাকে। কখনও কোন দিন গ্রামে ফিরিবার ইচ্ছা হইলে, আমার সে দুর্গম পথের কথা মনে পড়িত। অমনি সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাটাও যেন কর্দ্দমাক্ত হইয়া যাইত।

(১৮)

পিতার চাকরী হইবার পূর্ব্বে ঠানদিদির সঙ্গে কিছুদিন মাতার বড়ই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। পিতামহী জানিবার পূর্ব্বেই মাতা এই চাকরীর সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলেন। পিতা এ গূহ্য কথা মাতা ব্যতীত আর কাহারও কাছে প্রকাশ করেন নাই। সেই জন্য পূর্ব্ব হইতেই তিনি হাকিমের গৃহিণী হইবার উপযোগিনী হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

মা আবার "অন্য-পূর্ব্বা" কন্যা। পূর্ব্ব কথিত সম্বন্ধের পর যদি

বালকের মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে কন্যাকে 'অন্য-পূর্ব্বা' বলে। তাহার বিবাহ সমাজে নিষিদ্ধ না হইলেও, কখন প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইত না। এরূপ কন্যার প্রায়শঃ 'মৌলিকে'র ঘরে বিবাহ হয়। পিতামহ কিঞ্চিৎ অর্থপ্রাপ্তির আশায় পিতার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। মাতার অধিক বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। আমার মাতামহ মুঙ্গেরে জেলার হাকিমের পেস্কারী করিতেন। দেশ হইতে অনেক দূরে থাকিতেন বলিয়া তিনি কন্যার যথাসময়ে বিবাহ দিতে পারেন নাই। মাতার যে বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, সে সময়ে তত অধিক বয়সে বিবাহ লোকের চক্ষে একটা বিস্ময়ের বিষয় ছিল।

জন্মাবধি কাছারীর সান্নিধ্যে বাস করিতেন বলিয়া, হাকিমী সম্বন্ধে মাতার একটু আধটু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। সেই অভিজ্ঞতার ফলে, তিনি হয়ত কোন একটি হাকিমপত্নীকে আদর্শ করিয়া আপনাকে গঠিত করিতেছিলেন।

স্বামীকে নির্দ্দেশ করিয়া বাবু অভিধানে সম্বোধন, কিঞ্চিৎ গাম্ভীর্য্যের সহিত লোক সহ আলাপন, এবং রন্ধনাদি হিন্দুললনার অত্যাবশ্যক কার্য্যে পরনির্ভরতা এইরূপ কতকগুলি সদ্‌গুণ অবলম্বনে তিনি চেষ্টিত ছিলেন। সেই জন্য গোপনে তিনি ঠানদিদির সঙ্গে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঠানদিদি আসিয়া মায়ের কবরীবন্ধনের সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার দ্বারা মায়ের রন্ধন-কার্য্যটিও নিষ্পন্ন হইতে লাগিল। মায়ের এইরূপ কার্য্যে ঠানদিদির যে বিশেষ অর্থসাহায্য হইত, তাহা নহে। তবে তাঁহার ভবিষ্যতে সাহায্য প্রাপ্তির আশা ছিল। সে কথা শুনিয়া ঠানদিদির আশা হইয়াছিল, এই সময়ে মাকে সাহায্য করিলে, তাঁহার পুত্র গণেশ ভবিষ্যতে একটা

চাকরী পাইবেই। মাও বোধ হয় তাহার চাকরীর একটা আভাস দিয়াছিলেন।

পিতা ও মাতার কথাবার্ত্তায় বুঝিয়াছিলাম, গণেশ খুড়াকে আনিতে পিতার ইচ্ছা ছিল না। তিনি তাহাকে বুদ্ধিহীন গণ্ডমূর্থ বলিয়াই জানিতেন। সে এখানে আসিয়া কি চাকরী করিবে? অথবা আমাদেরই কি উপকারে আসিবে? বিশেষতঃ তাঁহাকে আনিলে আমাদের অনেকটা সম্ভ্রম নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। দেশে সে আমাদের আত্মীয়ের মধ্যে একজন বিশিষ্ট আত্মীয়। আমার অতি দরিদ্র প্রপিতামহ শুদ্ধমাত্র কৌলীন্য সম্বল লইয়া পূর্ব্বে ইঁহাদিগেরই এক আত্মীয় কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; এবং বিবাহসূত্রে গণেশ খুড়ারই এক খুল্লপ্রপিতামহের ভূমিসম্পত্তিতে অধিকার পাইয়াছিলেন। খুঁড়া আমার পিতামহের মাতুলবংশীয়। সুতরাং তাহার সম্পর্ক আমাদের অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না।

এইজন্য পিতা তাঁহাকে কর্ম্মস্থানে আনিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। মাতাও পিতা এবং আমি ছাড়া, শ্বশুরকুলের আর কাহারও সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা নয়, আমাদের গ্রামের কুটুম্বদের মধ্যে কেহ তাঁহার এই নব-স্বাধীনতা-সুখলাভের অন্তরায় হয়।

পিতামহীর অস্তিত্বে মা দেশে গৃহিনীপণা করিতে পারেন নাই। পিতার উপার্জ্জনের একমাত্র অধিকারিণী হইয়া ইচ্ছামত সে অর্থের সদ্ব্যয় করিতে সমর্থ হন নাই। পিতামহী কখন পিতামহের উপার্জ্জনের টাকা হাতে পান নাই বটে, কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে যে সমস্ত ব্রতাদি গ্রহণ করিতেন, পিতামহ সেগুলি সুসম্পন্ন করিয়া দিতেন। সে সমস্ত কার্য্যে প্রভূত অর্থব্যয় হইলেও, তিনি তাহাতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত

হইতেন না। গোবিন্দ ঠাকুরদা' পিতামহীকে এই সকল কার্য্যে প্ররোচিত করিতেন।

দূর্ব্বাষ্টমী, তালনবমী, অনন্তচতুর্দ্দশী—নানাজাতীয় সংক্রান্তি—এমন ব্রত নাই, যাহা পিতামহী গ্রহণ করেন নাই। এসকল ব্রতের কতকগুলা আমি দেখিয়াছি, কতকগুলার কথা শুনিয়াছি। তবে পিতামহীর মহা-সমারোহের জগদ্ধাত্রী পূজাটা এখনও আমার বেশ মনে আছে। মূর্খজনোচিত অর্থের অসদ্ব্যয় মাতা অত্যন্ত মানসিক ক্লেশের সহিত নিরীক্ষণ করিতেন। জগদ্ধাত্রীপূজার উদ্‌যাপনের বৎসরে সহস্রাধিক কাঙ্গালীকে অন্নদান করা হইয়াছিল। তাই দেখিয়া মায়ের এরূপ অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইয়াছিল যে, তিনি মুখ ফুটিয়া পিতাকে বলিয়াছিলেন—"বুড়ী আর আমাদের খাইবার জন্য কিছু রাখিবে না দেখিতেছি।" পিতা বলিয়াছিলেন—"উপায় নাই। বুড়ী আর গোবিন্দখুড়া যতদিন না মরে, ততদিন অর্থের বিষম অপব্যয় নিবারণ করিতে পারিব না।"

বুড়ী মরিল না, উদ্‌যাপনের পর বৎসর বুড়া মরিল। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীর সকল ব্রতেরই একেবারে উদ্‌যাপন হইল।

সেই সমস্ত উৎসব-ব্যাপারে গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকগুলাই সাগ্রহে যোগদান করিত। এইজন্য মা আমাদের গ্রামের নামটার উপর পর্য্যন্ত চটিয়াছিলেন। অনেকবার নামের উদ্দেশে মৌখিক শতমুখী প্রহার করিয়াছিলেন। এমন কি, হুগলীর 'ঘোলঘাটে' নৌকা হইতে নামিবার সময়ে, মায়ের চরণতলে যেখানে এক বিন্দু গ্রামের মাটি লুক্কায়িত ছিল অথবা ভক্তিবশে চরণে জড়াইয়াছিল, মা সে সমস্ত মৃত্তিকা জাহ্নবীজলে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু মানুষের ইচ্ছা এক, বিধাতার ইচ্ছা

আর। আমাদের গ্রামের সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইলে কি হইবে? বিধাতার ইচ্ছা নয়, গ্রাম আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে। "তা হইলে ত আমি এই অপ্রীতিকর কাহিনীর বর্ণনার দায় হইতে রক্ষা পাইতাম। মা'ই দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবার প্রধান বাধা। কর্ম্মবিপাকে সেই মাকেই আবার বাধ্য হইয়া দেশের সঙ্গে হুগলীর সম্বন্ধের ঘটকালী করিতে হইল।

আমরা হুগলীতে আসিবার পূর্ব্বেই পিতা তাঁহার পূর্ব্বের বাসা পরিত্যাগ করিয়া এই বাসাই মনোনীত করিয়াছিলেন। বাসাটি আজি-কালিকার 'বাংলা'র ধরণে প্রায় বিঘে তিনেক জমীর মধ্যস্থলে একেবারে পরস্পর-সংলগ্ন কতকগুলা ঘর। বাংলার আকৃতি সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, প্রায় সেইরূপ। ইহাকে নূতন করিয়া বর্ণনা করিবার কিছু নাই। দেখিতে সুদৃশ্য বটে। ফ্লোরের উপর বাড়ী। একতলা হইলেও দোতলার কার্য্য করিয়া থাকে। কেন না, ফ্লোরটা এত উঁচু যে, তাহার তলে ভৃত্যাদি সুশৃঙ্খলে বাস করিতে পারে।

সুদৃশ্য হইলেও বাড়ীটি কিন্তু তখনকার হিন্দু-গৃহস্থের বাসের পক্ষে সেরূপ সুবিধার ছিল না। সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ফুলের বাগান। পশ্চাতে কিছু দূরে রান্নাঘর। রান্নাঘর কেন—বাবুর্চিখানা।

পূর্ব্বে কোন সাহেব ইঞ্জিনীয়র বাংলাখানা নিজের জন্য প্রস্তুত করিয়া-ছিলেন। সমস্ত জমীটা ঈষদুচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা। ফুলবাগানের পশ্চাৎ হইতে প্রাচীর-গাত্র পর্য্যন্ত কতকগুলা আমকাঁঠালের গাছ। গাছগুলা ঘন-সন্নিবিষ্ট হওয়ায় জঙ্গলের আকার ধারণ করিয়াছে।

ইঞ্জিনীয়র সাহেব এরূপভাবে গাছগুলি রোপণ করেন নাই। তিনি যখন কর্ম্মাবসরে পেন্সান্ লইয়া বিলাত চলিয়া যান, তখন বাংলাটি জনৈক

উকীলকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। উকীল মহাশয় জিনিষের অপব্যয় দেখাটা বড় পছন্দ করিতেন না। বাড়ীর মধ্যে এতটা মৃত্তিকা অকর্ম্মণ্য থাকিতে দেখিয়া, তিনি তাহাতে আম কাঁঠাল লীচুর চারা যেখানে যেরূপ সুবিধা বুঝিয়াছিলেন, রোপণ করিয়াছিলেন। গাছগুলা শৈশবাবস্থায় পরস্পরের কাছাকাছি ছিল। এখন বড় হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন—আলিঙ্গন বলি কেন—আক্রমণ করিয়াছে। তাহাতে গাছগুলার ক্ষতি হউক না হউক, স্থানটা জঙ্গলের ভাব ধারণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ যেখানে রান্নাঘর, তাহার পশ্চাদ্‌ভাগটাএকেবারে অরণ্যানীতে পরিণত হইয়াছিল।

এইজন্য এখানে বাসের সঙ্গে সঙ্গেই রাঁধুনী-বিভ্রাট ঘটিল। ব্রাহ্মণ আসে আর চলিয়া যায়। কেহ, সাহেবের বাড়ী ছিল বলিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিতেই চাহে না। কেহ বা দুইদিন কাজ করিয়াই ঘরের নির্জ্জনতায় ভীত হইয়া প্রস্থান করে। শেষে লোক খুঁজিতে খুঁজিতে পিতার আরদালীর প্রাণ যায় যায় হইল।

এস্থলে বলিয়া রাখি, পিতার আসিবার পূর্ব্বে উপর্য্যুপরি দুইজন ফিরিঙ্গী ডেপুটি ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর ধরিয়া সপরিবারে এখানে বাস করিয়াছিল। তাহাদের অবস্থানচিহ্ন বাড়ীর ভিতরের সকল স্থান হইতে সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া যায় নাই। যে স্থানটায় তাহাদের মুরগী-পেরুগুলা থাকিত, সে স্থানগুলা আমাদের আসিবার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত অপরিষ্কৃত ছিল। তখনও পর্য্যন্ত বামুনগুলা একেবারে বামনাই ছাড়িতে পারে নাই। অথবা অন্য জাতি গলায়-পৈতা-বামুন সাজিয়া রাঁধুনীবৃত্তি অবলম্বন করে নাই।

এই সকল কারণে এখানে বাসের কিছুদিন পরে পিতা বাসস্থান পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু বাড়ীখানা মায়ের বড়ই পছন্দ

হইয়াছিল। তাহার উপর যে সকল মহিলা মাঝে মাঝে মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় এক বাক্যে বাড়ীখানির প্রশংসা করিতেন। যে ভাড়ায় ইহা পাওয়া গিয়াছিল, অন্যত্র সেরূপ ভাড়ায় সেরূপ বাটী মিলা দুর্ঘট। এই সকল কারণে আমাদের আর বাসস্থানের পরিবর্ত্তন করা হইল না।

তথাপি মা গণেশখুড়াকে আনিবার ইচ্ছা করিলেন না। তিনি আমার মাতামহকে পত্র লিখিলেন। মাতামহ উত্তর লিখিলেন, তিনি দেশে আসিয়া নিজেই রাঁধুনীর অভাবে বিপদে পড়িয়াছেন। দেশে আসিবার পর হইতেই আমার মাতামহীর শারীরিক অবস্থা ভাল নহে। নিত্যই তাঁহার মাথা ঘুরে। পশ্চিমা অথবা উড়িয়া ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবারও উপায় নাই। তাহা হইলে জ্ঞাতিকুটুম্ব কেহই তাঁহার গৃহে জলগ্রহণ করিবে না। অথচ ঈর্ষান্বিত জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে কেহ এক দিনও আসিয়া তাঁহার রুগ্ন পরিবারকে দুইমুঠা অন্ন রাঁধিয়া দিবে না। অনেক দিন মাতামহকে নিজে হাত পুড়াইয়া রাঁধিয়া খাইতে হইয়াছে। মাতামহী একটু সুস্থ হইলেই মুঙ্গেরেই ফিরিবার তিনি ব্যবস্থা করিবেন।

অগত্যা গণেশখুড়ার আশ্রয় লওয়া ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর রহিল না। গণেশখুড়াকে পাঠাইবার জন্য পিতা পিতমহীকে পত্র লিখিলেন। হুগলীতে আসার পরেই পিতা তাঁহাকে পৌছান সংবাদ দিয়াছিলেন। তিনি নিজ হাতে লিখেন নাই। আমাকে দিয়া লিখাইয়াছিলেন। শেষে নিজের নামটা দস্তখত করিয়াছিলেন এইমাত্র। এবারে স্বহস্তে তিনি পত্র লিখিয়াছেন।

পিতা কি লিখিয়াছেন, জানি না, তবে আমরা সকলেই সপ্তাহ যাবৎ

পত্রের উত্তরের অপেক্ষায় বসিয়া আছি। ইহার মধ্যে আরদালী যে বামুনটাকে আনিয়া দিয়াছিল, সেটা সাহসী ও নিরভিমান হইলেও তাহার রান্না আমাদের কাহারও পছন্দ হইল না। বিশেষতঃ মায়ের। তিনি ত তাহার প্রস্তুত ব্যঞ্জন মুখেই তুলিতে পারিলেন না। মাতা একদিন রন্ধন সম্বন্ধে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিলেন। উপদেশ শুনিবার পর তাহার রন্ধন-মাধুর্য্য কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় হইয়া পড়িল। সেই 'অতি'র উল্লাসে আত্মহারা হইয়া মা বড় একটা রুই মাছের মুড়াযুক্ত ঝোলের বাটি পুরস্কার-স্বরূপ বামুনকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। বামুন পাঁচিল ডিঙ্গাইয়া পলাইল।

ইহার পর নিরুপায়ে মাকে দুই দিন রাঁধিতে হইয়াছে, রাঁধিয়া তাঁহার মাথা ধরিয়াছে! বাবার চিঠি লিখিবার সপ্তম দিবস সন্ধ্যার পর আমরা দোকান হইতে খাবার আনাইয়া ভক্ষণ করিতেছি, এমন সময় বাহিরে ফটকের কাছে কুকুরগুলা চীৎকার করিয়া উঠিল।

আমাদের পরিচারকবর্গের মধ্যে এক চাকর, এক ঝি এবং কোম্পানী-দত্ত এক আরদালী। বাড়ীখানার উদ্‌বাস্তু বড় বলিয়া আরও দুই চারিজন লোক বেশি থাকা আমাদের পক্ষে প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু পিতার তখনও পর্য্যন্ত দুই শত টাকার অধিক বেতন ছিল না বলিয়া অধিক লোক রাখা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি দুইটা বিলাতী কুকুর পুষিয়া তাহাদের স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেগুলা রাত্রি-কালে প্রহরীর কার্য্য করিত।

সেদিন সে সময়ে ভৃত্য ও আরদালী কেহই বাড়ীতে ছিল না। তাহারা রাঁধুনীর অন্বেষণে সহরের মধ্যে গিয়াছিল।

কুকুর দুইটা আকারে ছোট ছিল। কিন্তু তাহাদের চীৎকার-শক্তি তাহাদের আকৃতির অসংখ্যগুণ অধিক ছিল। তাহাদের চীৎকারে অনেকদিন আমি মধ্যরাত্রিতে ঘুম হইতে শিহরিয়া উঠিয়াছি। আজ তাহারা ফটকের কাছে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। সন্ধ্যার অবকাশে উকীল-মোক্তার প্রভৃতি ভদ্রলোকদিগের মধ্যে কেহ না কেহ প্রায়ই পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। কুকুরগুলা ভদ্রলোক চিনিত। তাহারা ফটক পার হইয়া আসিলে চীৎকার করিত না।

সেদিন কৃষ্ণপক্ষ! হয় দ্বিতীয়া—না হয় তৃতীয়া। কিছুক্ষণ পরেই চাঁদ উঠিবে বলিয়া আমরা ফটকে আলোক দিই নাই। কুকুরের অস্বাভাবিক চীৎকার শুনিয়া, এবং নীচে কেহ নাই জানিয়া, আমরা মনে করিলাম, বুঝি বাড়ীতে চোর প্রবেশ করিয়াছে।

মা পিতাকে বলিলেন—"কুকুরগুলা এত চেঁচায় কেন দেখিয়া আইস।'

"বুঝি চোর বাড়ীতে ঢুকিয়াছে।"

"সে কিগো! তুমি হাকিম—তোমার বাড়ীতে চোর!"

"চোর ঢুকিবার কারণ হইয়াছে। আমি আজ কয়দিন ধরিয়া চোর-গুলার কঠিন কঠিন শাস্তি দিতেছি। বিশেষতঃ আজ একটা দাগী ছিঁচকে চোরকে পাকা ছয়টি মাস জেল দিয়াছি। আমার শাস্তি দিবার ধূম দেখিয়া সাহেব এই ছয়মাসের মধ্যেই আমাকে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়াছেন। সেই জন্য চোর বেটাদের আমার উপর আক্রোশ হইয়াছে।"

মাতা সভয়ে বলিয়া উঠিলেন—"ওগো! তবে কি হবে?"

মাতার ভয় দেখিয়া আমিও ভয়কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম।

পিতা বিশেষ রকমের একটা আশ্বাস দিতে পারিলেন না। বলিলেন — "তাইত! চাকর-আরদালী কেহই যে বাড়ীতে নাই!"

এমন সময় ঝি ভিতরের বারাণ্ডা হইতে "বাবু! বাবু" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

আমরা মধ্যের হলঘরে বসিয়াছিলাম। ব্যাপারটা কি জানিতে তখন পিতা অথবা মাতা কাহারও সাহস হইল না। তাঁহারা আমাকে ধরিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত একেবারে পার্শ্বের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঝিও আমাদের অনুসরণ করিল।

পিতা তাহাকে ব্যস্তভাবে হলঘরের দ্বার বন্ধ করিতে আদেশ করিলেন।

সে বলিল—"বন্ধ করিতে হয় তোমরা কর। ঝি বলিয়া কি আমার প্রাণ প্রাণ নয়? কতকগুলা লোক হুড় হুড় করিয়া বাহির হইতে রান্নাঘরের দিকে ছুটিয়াছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র মাতা ভয়ে পিতাকে জড়াইয়া ধরিলেন। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। দারুণ ভীতিবশে পিতারও বসন অর্দ্ধস্রস্ত হইয়া গেল। এমন সময় বাহিরে শব্দ উঠিল, "চোর—চোর।" পিতা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কেবল আরদালীকে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

ঘরে চোর-দস্যুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার অস্ত্র একটি পিস্তল ছিল। কিন্তু ভীতিবিহ্বল পিতা তাহা আর হাতে করিবার সময় পাইলেন না। "চোর—চোর" শব্দ শুনিয়া প্রত্যুৎপন্নমতি ঝিটা যদি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া না দিত, তাহা হইলে আমাদের আত্মরক্ষার আর কোনও উপায় ছিল না।

সত্যসত্যই যদি সে দিন প্রতিহিংসাপরায়ণ কোন দস্যু আমাদের

বাড়ীতে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে তাহারা অক্লেশে গলাটিপিয়া আমাদিগকে মারিয়া রাখিয়া যাইতে পারিত।

কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যবশে সে দিন আমাদের বাড়ীতে চোর প্রবেশ করে নাই। ঝি দরজা বন্ধ করিতে না করিতে বাহির হইতে আরদালী ডাকিল—"হুজুর!"

পিতা ভিতর হইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"চোরের কি হইল?"

আরদালী বলিল—"তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছি।"

তখন পিতা কাপড়খানা গুছাইয়া পরিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ঝি দরজা খুলিল। মাতা চোর অথবা আরদালী কাহাকেও না দেখিয়াই, চোর ধরিবার বিলম্বের জন্য আরদালীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

পিতা ঘর হইতে মুখ বাড়াইয়া প্রথমে চোরের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। চোর ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া আমার কিন্তু যথেষ্ট সাহস হইয়াছে। আমি একেবারে একলম্ফে ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

আরদালী, চাকর ও দুই তিনজন বাহিরের লোক চোরকে ধরিয়াছিল। পিতা চোরটা সুচারুরূপে ধৃত হইয়াছে দেখিয়া সন্তর্পণে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাহারা চোরকে ভিতর:দিক হইতে আনিয়াছিল। ভিতরের বারান্দায় আলোর বেশি জোর ছিল না। এই জন্য ঘর হইতে চোরের মুখ ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল না। আমিও পিতার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছি।

চোর ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া, ঝিও পার্শ্বের কামরা হইতে হলঘরে আসিয়াছে। মা কিন্তু এখনও বাহির হন নাই। দ্বারের পার্শ্বেই হলঘরের

কোণে বাবার ছড়ি থাকিত। চোরকে প্রহার করিবার সঙ্কল্পে তিনি সর্ব্বাগ্রে সেই ছড়ি হাতে করিলেন।

চোরকে একটু মিষ্ট আপ্যায়নে তুষ্ট করিয়া যেমন তিনি ছড়িগাছটি উঠাইয়াছেন, অমনি চোর "অঘোর দা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

সমস্ত রহস্য তখন প্রকাশিত হইল। চোর এই বারে উচ্চহাস্যে বলিয়া, উঠিল "দোহাই দাদা, আমাকে মেরো না। আমি গণেশের মা'র গণেশ।"

১৯

গণেশ খুড়া যে এরূপভাবে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবে, ইহা আমাদের মধ্যে কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। যাই হ'ক, তাহার প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য আমরা সকলেই লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইলাম।

পিতা হাতের ছড়িটা পশ্চাৎ দিকে মেজের উপর নিক্ষেপ করিলেন। মাতাও মুহূর্ত্তমধ্যে গৃহমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ভৃত্য ও আরদালী তাহার উভয় হস্ত ধরিয়াছিল। চোর ধরিবার সহায়তা করিতে বাহিরের দুই জন লোক তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। প্রকৃত রহস্য অবগত হইয়াই তাহারা লজ্জায় খুড়াকে পরিত্যাগ করিয়া, সেস্থান হইতে পলাইল। যাইবার সময়, চোর-ধরার পুরস্কার-স্বরূপ তাহারা ঝির কাছে গোটাকতক তীব্র তিরস্কার উপহার প্রাপ্ত হইল।

পিতা ও মাতা উভয়েই তাহার এই লাঞ্ছনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। এবং মনে কিছু ক্ষোভ না রাখিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন।

মাতা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, আমি খুড়ার হাত ধরিয়া, তাহাকে হলঘরে লইয়া আসিলাম।

ঘরের মেজেটা মাদুর দিয়া বাঁধান ছিল। মধ্যস্থলে কতকগুলা চেয়ার-বেষ্টিত একটি গোল টেবিল। আমি সেই টেবিলে পুস্তকাদি রাখিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়াশুনা করিতাম।

আমি খুড়াকে একখানা চেয়ারে বসিতে বলিলাম। খুড়া বসিল না। বলিল—"আমার কাপড় চোপড় সব নষ্ট হইয়াছে। আমি স্নান না করিয়া আর বসিতেছি না।"

পিতাও মাতা উভয়েই প্রকৃত শুচিতা ও পবিত্রতা সম্বন্ধে তাহাকে যথেষ্ট উপদেশ দিলেন। কোনও ফল হইল না। কিসে যে সে অপবিত্র হইয়াছে, তাহা গণেশ-খুড়া বলিল না। ক্ষণ-পূর্ব্বের লাঞ্ছনার একটিও কথা তাহার মুখ হইতে নির্গত হইল না।

পিতা বুঝিলেন, খুড়ার ভয় এখনও দূরীভূত হয় নাই। তিনি তাহাকে নানা অভয় বাক্য শুনাইলেন। মা শুনাইলেন। তাহাদের দেখাদেখি আমিও শুনাইলাম। তবু খুড়া স্নানের জেদ ছাড়িল না। অধিকন্তু তাহাকে স্পর্শ করিয়াছি বলিয়া, আমাকেও সে স্নান করিতে অনুরোধ করিল।

অগত্যা পিতাকে খুড়ার স্নানের ব্যবস্থা করিতে হইল। যে আরদালী তাহাকে চোর বলিয়া ধরিয়া আনিয়াছিল, পিতা তাহাকেই খুড়ার সঙ্গে গঙ্গায় পাঠাইলেন। মা-গঙ্গার তীরে আসিয়া খুড়া পুষ্করিণীতে স্নান করিতে চাহিল না।

ইহার কিছু পূর্ব্বেই টেবিলের উপর খাবার রাখিয়া আমরা আহারে বসিয়াছিলাম। ভুক্তাবশিষ্টগুলা টেবিলের উপরেই পড়িয়াছিল। পূর্ব্বে

দেশে মাকে কখন পিতার সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে দেখি নাই। বরং তাঁহার আহারের সময়ে ঘটনাক্রমে পিতা যদি কোনও দিন উপস্থিত হইতেন, অমনি জননী অবগুণ্ঠনবতী হইয়া ভোজন হইতে নিবৃত্ত হইতেন। এখানে তাঁহার আর কাহাকেও সরম দেখাইবার প্রয়োজন ছিল না, লোকলজ্জারও ভয় ছিল না। নির্জ্জন-বাসের ফলে, এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনোপযোগী মনের বলে, আমরা গ্রাম্য কুসংস্কারগুলা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি।

অন্য দিন আহারের সময়ে কুকুর দুইটা উপস্থিত থাকিত। এবং আহার-শেষে যখন আমরা আসন পরিত্যাগ করিতাম, তখন সেই দুটা পাত্রে মুখ দিয়া, যাহা কিছু তাহাদের খাদ্যযোগ্য অবশিষ্ট থাকিত, তাহাই তুলিয়া লইত। বাড়ীতে রক্ষক কেহ ছিল না বলিয়া, সে দুটাকে আজ বাহিরে রাখা হইয়াছিল। বিশেষতঃ আজ আহারের স্থান পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অন্য দিন ভিতর দিকের বারাণ্ডায় আমাদের আসন হইত। আজ আমরা ঘরের ভিতরে টেবিলে আহার করিয়াছি। আমাদের আসনগুলা উন্নতির সমানুপাতে মাটি ছাড়িয়া চেয়ারে উঠিয়াছে। কুকুর দুইটা অগ্রে এস্থান নির্ণয় করিতে পারে নাই। গণেশ-খুড়া চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই তাহারা হলঘরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ মাত্রেই তীব্র ঘ্রাণ-শক্তি-বলে আহার্য্যের সন্ধান পাইল। অমনি দুইটাতেই লাফাইয়া টেবিলের উপর উঠিল।

পিতা এতক্ষণে গণেশ-খুড়ার গৃহত্যাগের কারণ বুঝিলেন। তিনি মাকে বলিলেন,—"এ টেবিলটা পরিষ্কার না করিয়া, গণেশকে এখানে আনা অন্যায় হইয়াছে।" মাও বোধ হয়, কারণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি

পিতার কথায় কোনও উত্তর না করিয়া, টেবিল পরিষ্কার করিবার জন্য ঝিকে ডাকিলেন। উত্তর পাইলেন না। আবার ডাকিলেন। তথাপি ঝি উত্তর দিল না।

দুই বারের আহ্বানে ঝির উত্তর মিলিল না দেখিয়া পিতা বলিলেন—"সে বোধ হয় নিকটে নাই। তাহার ফিরিবার অপেক্ষা না করিয়া, তুমিই টেবিলটা পরিষ্কার করিয়া ফেল। ফিরিয়া গণেশ এগুলা দেখিতে না পায়।"

"তুমি কি মনে করিয়াছ, মূর্খটা এইগুলা দেখিয়াই আপনাকে অপবিত্র মনে করিয়াছে ?"

"তাহাতে আর সন্দেহ আছে ? সে ফিরিলেই বুঝিতে পারিবে।"

মা আর একবার ঝিকে ডাকিলেন। উত্তর পাইলেন না। অগত্যা তাঁহাকেই টেবিল পরিষ্কার করিতে হইল।

পিতা এইবারে ভৃত্যটাকে ডাকিলেন। ডাকিবামাত্র ভৃত্য পাঁচু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। পিতা তাহাকে ভিজা গামছা দিয়া টেবিলটা মুছিয়া ফেলিবার আদেশ করিলেন। আর বলিলেন—"টেবিল সাফ করিয়াই কুকুর দু'টাকে শিকলে বাঁধিয়া বাহিরে লইয়া যা। দেখিস্—কোন রকমে এ দুইটা যেন আজ ঘরের মধ্যে প্রবেশ না করে।"

মাতা বলিলেন—"তুমি মিছামিছি এমন ভয় পাইতেছ কেন ?"

পিতা এ কথায় কোনও উত্তর করিলেন না। ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য্য করিতে পাঁচুকে আদেশ করিলেন। টেবিল পরিষ্কার করিয়া, কুকুর দুইটাকে সঙ্গে লইয়া, পাঁচু গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

মা পিতার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—"কিছু ভয় নাই। গণেশ আসিলেই আমি তাহাকে জলের মত সমস্ত বুঝাইয়া দিব।"

"পারিলেই ভাল"—এই বলিয়াই পিতা বিশ্রামার্থ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

আমার পরিধানে একটা ঢিলা পায়জামা ছিল। মায়ের ছিল সেমিজ। অতি অল্পদিন মাত্র হিন্দুর গৃহে সেগুলার প্রচলন হইয়াছে। অতি অল্প-সংখ্যক হিন্দু-পরিবারই সেগুলার ব্যবহারে সাহসী হইয়াছে। তাহাদেরও মধ্যে অনেকেই নিমন্ত্রণাদি ব্যাপার ব্যতীত অন্য সময়ে তাহা পরিধান করিত না। মাও প্রথম প্রথম সসঙ্কোচে সেমিজের ব্যবহার করিতেন। ইদানীং শিক্ষার জন্য একজন মেম ও একজন খৃষ্টান দেশীয় মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হওয়াতে মাতা সর্ব্বদা সেমিজ ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।

পিতা প্রস্থান করিলে, মা আমাকে বলিলেন—"হরিহর! পায়জামটা ছাড়িয়া কাপড় পরবি আয়!"

মাতার আদেশানুযায়ী আমি তাঁহার সঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বেশ-পরিবর্ত্তন করিলাম। মাতাও বেশপরিবর্ত্তন করিলেন। তদন্তে উভয়েই গণেশ-খুড়ার প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম।

আমি রহিলাম কেন? খুড়াকে দেখিয়াই আমার জন্মভূমির প্রীতি আকুল আবেগে জাগিয়া উঠিয়াছে। পিতামহীর সংবাদ লইবার ইচ্ছা হইয়াছে। মা যে কেন রহিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

পিতা কিন্তু শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। শয্যায় তাঁহাকে স্থিরভাবে শয়ান দেখিয়া অনুমান করিলাম, তিনি ঘুমাইয়াছেন।

(২০)

আমাদের বাসা হইতে রশী দুই অন্তরেই গঙ্গার ঘাট। স্নানের জন্য অধিক সময় নষ্ট না করিলে, সেখান হইতে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়া

আসা যায়। নির্দ্দিষ্ট ঘাটে স্নান না করিয়া, যদি কেহ সোজাসুজি পথ ধরিয়া, আমাদের বাসা হইতে গঙ্গাতীরে যাইতে চায়, তাহা হইলে আরও অল্প সময়ের মধ্যে যাতায়াত চলে। আমাদের বাসা ও গঙ্গাতীরের মধ্যে সে সময় এক ওলন্দাজ ফিরিঙ্গীর বাগানবাড়ী ছিল। সদর রাস্তার উপরে সেই বাগানের ফটক। সেই ফটক হইতে আরম্ভ করিয়া, গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত একটি সরল পথ। এই পথ-অবলম্বনে গঙ্গার তীরে আরও অল্প সময়ের মধ্যে উপস্থিত হওয়া যাইত। তবে সে পথটায় যে সে চলিতে অধিকার পাইত না। হাকিমের পুত্র বলিয়া, আমি অথবা আমাদের সম্পর্কীয় যে কোন লোকের সে পথে চলিবার নিষেধ ছিল না। যদি বাগানের ফটক বন্ধ না থাকে; তাহা হইলে গণেশ-খুড়াকে সেই পথ-অবলম্বনে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য পিতা আরদালীকে উপদেশ দিয়াছিলেন। গণেশ-খুড়াকেও শীঘ্র শীঘ্র স্নান সারিয়া ফিরিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। গণেশ-খুড়া ফিরিল না। আর আরদালীও ফিরিল না। ঝি যে কোথায় গেল, তাহারও সন্ধান নাই!

অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া মায়ের চোখে তন্দ্রা আসিল। মা নিজের অবস্থা আমাতে আরোপ করিয়া বলিলেন—"আর কেন হরিহর? কতক্ষণ তার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবি—ঘুমা।"

এই বলিয়াই মাতা হাতের উপর মাথার ভর দিয়া, একটা বালিসের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমি শয়ন করিলাম কি না, তাহা দেখিবার তাঁহার অবসর রহিল না। দেখিতে দেখিতে তিনি প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

আমার কিন্তু ঘুম আসিল না। ঘুমাইবার দুই একবার চেষ্টা করিলাম। চেষ্টা বিফল হইল।

একঘণ্টা—দুইঘণ্টা—দেখিতে দেখিতে ঘড়ীতে দশটা বাজিল। সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ। অথচ সমস্ত দ্বারই খোলা রহিয়াছে।

চুপ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া থাকায় ক্রমে কষ্টবোধ হইতে লাগিল।

পিতার সারাদিবসের পরিশ্রম। তিনি শয়নের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমাইয়াছেন। এখন তাঁহার নাসিকাধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছিল।

অবকাশ পাইয়া আমি ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিলাম; এবং পা টিপিয়া টিপিয়া হলঘরে উপস্থিত হইলাম।

তখনও ঘরে বাহিরে আলো জ্বলিতেছিল। রাত্রিও অধিক হয় নাই। গ্রীষ্মকাল—জ্যৈষ্ঠ মাসের রাত্রি। সবেমাত্র দশটা বাজিয়াছে।

হলঘরে প্রবিষ্ট হইয়া, আমি বাহির বারান্দার দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, সমস্ত দ্বারই মুক্ত। অথচ বাড়ীটা যেন জনশূন্য।

টেবিল পরিষ্কার করিয়া কুকুর দু'টাকে সঙ্গে লইয়া, চাকর পাঁচুও যে সেই বাহিরের দিকে গিয়াছে, সেও আর ফিরিয়া আসে নাই।

ঘর ছাড়িয়া এবার আমি বাহিরের বারান্দায় আসিলাম। সেখানে আসিয়া দেখি, বারান্দার এককোণে মেঝের উপর একটা বালিশ মাথায় দিয়া, পাঁচু অগাধ নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছে।

সকলকেই ঘুমাইতে দেখিয়া, আমার মনে সহসা ভয়ের সঞ্চার হইল। নিঃশঙ্কচিত্তে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়াছিলাম। এখন বাহির হইতে ভিতরে ফিরিতে গাটা কেমন কাঁপিয়া উঠিল। আমার পাঁচুকে জাগাইবার

প্রয়োজন হইল। পাছে পিতা ও মাতার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে কোন সাড়াশব্দ না করিয়া, শুধু করস্পর্শে তাহাকে উঠাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম।

নিকটে গিয়া তাহার গায়ে হাতটি দিতে যাইতেছি, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে অতি ধীরে এবং অনুচ্চকণ্ঠে কে আমাকে ডাকিল—"খোকাবাবু!"

পিছন ফিরিয়া দেখি—ঝি। সে আমাকে আর কোনও কথা কহিবার অবকাশ দিল না। আমাকে ফিরিতে দেখিয়াই বলিল—"মা ও বাবা কি করিতেছেন?"

"ঘুমাইতেছেন।"

"বেশ হইয়াছে। বিধাতা কৃপা করিয়াছেন। ও বোকাটাকে জাগাইবার প্রয়োজন নাই। তুমি আমার সঙ্গে এস।" "কোথায়?"

"এখানে বলিব না। এখনি জানিতে পারিবে। দেরী করিলে কাজের ক্ষতি হইবে।"

"যদি বাবা কিংবা মা ইহার মধ্যে জাগিয়া উঠেন?"

"উঠেন, আমি তার ব্যবস্থা করিব। তোমার কোনও ভয় নাই।"

কৌতূহলপরবশ হইয়া আমি ঝির অনুসরণ করিলাম।

বারান্দা হইতে নামিয়া উঠানে পা দিতেই ঝি আমার হাত ধরিল। ধরিয়া বলিল—"খোকাবাবু! এইবারে তোমাকে আমার কোলে উঠিতে হইবে।" আমি বলিলাম—"কেন?"

"আমি তোমাকে একবার ফটকের বাহিরে লইয়া যাইব। দেশ থেকে তোমাদের এক আত্মীয় আসিয়াছেন। তিনি তোমাকে একবার দেখিবেন।"

কে আত্মীয় না বুঝিলেও আত্মীয়ের নাম শুনিবামাত্র আমি ঝির কোলে উঠিলাম।

ফটক পার হইয়া ঝি সদর রাস্তায় পড়িল। তারপর কিছুদূর পূর্ব্বমুখে চলিল। যেখানে সেই প্রশস্ত পথ উত্তর-দক্ষিণে লম্বা আর একটু সরু পথের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে, ঝি সেইখানে উপস্থিত হইয়াই কাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—"বাবা ঠাকুর! আনিয়াছি।"

এই বলিয়াই ঝি কোল হইতে আমাকে নামাইয়া, সেই চৌমাথার পথে দাঁড় করাইল।

সেখানে একটি আলোক স্তম্ভ ছিল। ভূমিতে পা দিয়াই দেখিলাম, আলোক-স্তম্ভে ভর দিয়া কে একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। সে ব্যক্তি ঝিয়ের কথা শুনিবামাত্র আমার দিকে অগ্রসর হইল। নিকটে আসিবামাত্র আমি চিনিতে পারিলাম। তিনি অন্য কেহ নহেন—সার্ব্বভৌম ম'শায়।

আমাকে দেখিয়াই ব্রাহ্মণের চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল। পথের লণ্ঠন হইতে নির্গত আলোক-রশ্মিতে আমি তাহা সুস্পষ্টই দেখিতে পাইলাম। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি যেন স্পন্দহীনের মত দাঁড়াইয়াছি! আমার মুখ হইতে একটিও বাক্য নির্গত হইতেছে না। নির্নিমেষ নেত্রে আমি কেবল তাঁর মুখের পানে চাহিয়া আছি। সে অবস্থা আজিও পর্য্যন্ত আমার মনে সুস্পষ্ট জাগিয়া আছে। ব্রাহ্মণ আমাকে দেখিয়া, প্রথমে কোনও কথা কহিতে পারিলেন না। আমারই মত কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর ঝিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"মা! কি বলিয়া যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

ঝি একথার কোনও উত্তর না দিয়া আমাকে বলিল—"কার কাছে

তোমায় আনিয়াছি, বুঝিতে পারিতেছ খোকা বাবু? নাও, ঠাকুরকে প্রণাম কর।"

ঝির আদেশ-মত আমি ব্রাহ্মণকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিতে যাইতেছিলাম। ব্রাহ্মণ নিষেধ করিলেন। বলিলেন—"বাবা, একটু অপেক্ষা কর।"

তাঁহার হাতে একটা গঙ্গাজলপূর্ণ কমণ্ডলু ছিল। আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াই, তিনি কমণ্ডলু হইতে কিঞ্চিৎ জল আমার মস্তকে নিষিক্ত করিলেন; এবং তাঁর পশ্চাতের পথপার্শ্বস্থ একটা বকুল বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"ব্রাহ্মণী, কন্যাকে লইয়া আইস।"

আমি বিস্ময়বিমুগ্ধ—হাঁ করিয়া, বকুল বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। সেস্থানটায় বেশ অন্ধকার। বিশেষতঃ আমরা আলোকের কাছে অবস্থিত ছিলাম বলিয়া অন্ধকার গাঢ়তর বোধ হইতেছিল। প্রথমে আমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ব্রাহ্মণও বোধ হয়, দেখিতে পাইলেন না। তিনি একটু ক্রোধের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"কি করিতেছ? বিলম্বে কি আমার সমস্ত ধর্ম্ম নষ্ট করিবে!"

অমনি দেখিলাম, সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া, ক্রোড়স্থা একটি বালিকাকে লইয়া, যথাসম্ভব দ্রুতপদে এক রমণী আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন।

বালিকা পট্টবস্ত্র-পরিধায়িনী। তাঁহারও মুখে অবগুণ্ঠন।

তাহারা কে এবং কিজন্য এখানে এরূপ ভাবে উপস্থিত হইল, তখনকার বালকের বুদ্ধিমত্তায় আমি সে সময় কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

আমি হতভম্বের ন্যায় তাহাদের পানে চাহিয়া রহিলাম। ঝিও কিছু বুঝিতে পারে নাই। সেও আমারই মত হতভম্ব। আমি কি জানি কেন

তাহার পানে ফিরিয়া দেখি, সেও আমারই মত হাঁ করিয়া, আমার পানে চাহিয়া আছে।

তাঁহাদের পানে ফিরিয়া দেখি, রমণী বালিকাকে কোল হইতে নামাইয়াছেন। এ দিকে ব্রাহ্মণ গলার পুঁটুলি হইতে কি একটা দ্রব্য বাহির করিতেছেন।

দ্রব্যটি বাহির হইবামাত্র আমি বুঝিতে পারিলাম,সেটি একটি শালগ্রাম-শিলা। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম বলিয়া অতি শৈশবেই শালগ্রামের সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছে। উপনয়ন সংস্কারের পর আমি দুইএক দিন তাহার পূজা করিয়াছি। মোটামুটি পূজার পদ্ধতিও শিখিয়াছি। সুতরাং সেই গোল প্রস্তরখণ্ডটি দেখিবামাত্র তাহাকে নারায়ণ বলিয়া বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না।

এক হস্তে শালগ্রাম, অন্যহস্তে কমণ্ডলু লইয়া ব্রাহ্মণ যেন বিশেষ অসুবিধায় পড়িলেন। বলিলেন—"তাইত! এ সময় গণেশ নিকটে থাকিলে বড়ই ভাল হইত।"

এই কথায় অবগুণ্ঠনবতী রমণী বলিলেন—"তাহার আসিবার উপায় নাই। তাহার সঙ্গে একটা লোক রহিয়াছে।"

"বেশ—মা দাক্ষায়ণি! তুমিই কমণ্ডলুটা হাতে কর।"—এই বলিয়াই ব্রাহ্মণ পট্টবস্ত্রাবৃতা বালিকার হস্তে কমণ্ডলু প্রদান করিলেন।

আমি বিস্মিত বিস্ফারিত নেত্রে কেবল তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিতেছি।

ব্রাহ্মণ ক্ষিপ্রতার সহিত উত্তরীয়াঞ্চল হইতে কতকগুলা পুষ্প বাহির করিলেন। বাহির করিয়াই কমণ্ডলু হইতে আবার কিছু জল লইয়া

বালিকার মস্তকে প্রদান করিলেন। তৎপরে বাম হস্তে আমার জানু স্পর্শ করিয়াই আমার মস্তকে পুষ্প নিক্ষেপ করিলেন।

অতি ক্ষিপ্রতার সহিত এই সকল ও আনুসঙ্গিক আরও অনেকগুলা কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া গেল।

সর্ব্বশেষে ব্রাহ্মণ আমার দক্ষিণ হস্তে শালগ্রাম রক্ষা করিলেন। এতক্ষণের কার্য্য সকল নীরবেই নিষ্পন্ন হইতেছিল। সকলের নিঃশ্বাস-গুলাও বুঝি নীরবতা-ভঙ্গের ভয়ে যে যার অধিকারীর হৃদয় মধ্যে আত্ম-গোপন করিয়াছিল। এইবারে ব্রাহ্মণ কথা কহিলেন। বলিলেন—"হরিহর! একবার প্রণব উচ্চারণ কর।"

প্রণব কিরূপভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে, তিনি বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার উপদেশানুযায়ী আমি প্রণব উচ্চারণ করিলাম। হৃদয়ের আবেগেই হউক, অথবা অন্য যে প্রকারেই হউক, তাহা এমন ভাবে আমার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল যে, উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান যেন স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সে স্পন্দন আমি সুস্পষ্ট অনুভব করিলাম। অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে আমারও সর্ব্বশরীর স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

উচ্চারিত বাণী শ্রবণমাত্র ব্রাহ্মণ অবগুণ্ঠনবতী রমণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"ব্রাহ্মণী! নিরাশ হইও না। কন্যাকে ভাগ্যহীনা ও তাহাকে গর্ভে ধরিয়া নিজেকেও ভাগ্যহীনা মনে করিও না। আমি যে ইষ্টদেবের নাম স্মরণ করিয়া, এই বালককে কন্যাদানে প্রতিশ্রুত হইয়া-ছিলাম, তিনি আমাকে অপাত্রে কন্যাদানে প্ররোচিত করেন নাই।"

এই সময়ে রমণীর কণ্ঠ হইতে অতি মৃদু রোদন-শব্দ আমি যেন শুনিতে

পাইলাম। ব্রাহ্মণ সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া, আমাকে বলিলেন—"নাও বাপ, এইবারে একবার সপ্রণব নারায়ণ-মন্ত্র উচ্চারণ কর। আমি সে মন্ত্র জানিতাম। তিনি আদেশ করিতে না করিতে আমি বলিয়া উঠিলাম —ওঁ নমো নারায়ণায়।

ব্রাহ্মণ আমার উচ্চারণ শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। তিনি উল্লাস আর ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। শিলাখণ্ড মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, তিনি আমার কুক্ষিদেশ বাহুনিবদ্ধ করিলেন। এবং তিনি কি করিতেছেন—আমি বুঝিতে না বুঝিতে আমাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তারপর বলিলেন— "ব্রাহ্মণি! কন্যাকে কোলে কর।"

আমাকে বলিলেন—"হরিহর! এইবারে তোমাকে যে কথা বলিব, তাহা বিশেষ করিয়া প্রণিধান কর। তুমি জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ ঋষি গৌতমের গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমার বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।"

আমি উত্তর করিলাম—"বলুন।"

"তুমি মনে কর, তোমার হৃদয়-মধ্যে নারায়ণ বাস করিতেছেন।

আমি প্রথমে এ কথার কোনও উত্তর দিলাম না। চোক বুজিয়া হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত নারায়ণকে খুঁজিতে লাগিলাম।

আজ বহুকালের কথা। তারপর কত বৎসর সুখেদুঃখে, সম্পদে-বিপদে কতবার কত প্রকারে হৃদয়-মধ্যে নারায়ণের অনুসন্ধান করিয়াছি। আজিও পর্য্যন্ত করিতেছি। কিন্তু সে রাত্রি সাধু ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, নারায়ণ খুঁজিতে আমার যে অবর্ণনীয় আনন্দের অবস্থা হইয়াছিল, সত্য বলিতে কি, সে অবস্থার কণাও যদি এখন আমার লাভ হইত, তাহা হইলেও আমি আমাকে কৃতার্থ মনে করিতাম।

সে অবস্থার ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র আমার মনে জাগিয়া আছে। কেহ বুঝিতে চাহিলে, তাহাও বুঝাইতে আমার সাধ্য নাই।

সে অবস্থার একমাত্র অবশিষ্ট সাক্ষীর মুখে শুনিয়াছি,আমাকে নারায়ণ খুঁজিতে আদেশ করিয়া, আবার ব্রাহ্মণ যখন সম্বোধন করেন, তখন তিনি উত্তর পান নাই। আমাকে কোলে রাখিয়া, বহুক্ষণ স্থির ভাবে তিনি আমার উত্তরের অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

তাঁহার কথায় ষোলআনা-বিশ্বাসে অনুসন্ধান করিতে গিয়া, ভাগ্যবান বালক বুঝি সেদিন নারায়ণের দর্শন লাভ করিয়াছিল। সংসারভোগপুষ্ট দুর্ব্বল বৃদ্ধের সে অবস্থা বুঝিবার সামর্থ্য নাই।

কতক্ষণ পরে জানি না, সংজ্ঞার পুনরাবর্ত্তনে আমি তিনবার নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিয়াছিলাম।

ব্রাহ্মণ তাহা শুনিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন—"হরিহর! তুমি ধন্য। তোমাকে কোলে করিয়া আমি ধন্য। তোমাকে যে আজ আশ্রয় করিতে আসিয়াছে, সে বালিকাও ধন্য। তারপর শুন। যিনি তোমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, মনে কর, সেই নারায়ণই পূর্ণ চৈতন্যে এই শিলা-মূর্ত্তির ভিতরে অবস্থিত রহিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি শালগ্রামটি আমার দক্ষিণ হস্তে প্রদান করিলেন।

আমি সেই ছিদ্রবিশিষ্ট শিলাখণ্ডের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম। কিন্তু সে শিলাখণ্ড আমার দৃষ্টিগোচর হইল না। আমার বোধ হইল, যেন এক অপূর্ব্ব সরোবর মধ্যে অপূর্ব্ব কমলাসনসন্নিবিষ্ট, কেয়ূরবান, কনক-কুণ্ডলবান এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় বালক—যেন কতকালের পরিচিত সঙ্গী—ঈষৎ হাস্যমুখে আমাকে বলিতেছে, "কি ভাই হরিহর! আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?"

আমি উত্তর করিলাম—"তুমি নারায়ণ !"

ইহার কতক্ষণ পরে জানি না, সেই রাত্রির অন্ধকারে শালগ্রাম-নিবদ্ধ আমার হস্তে সেই পট্টবস্ত্র-পরিহিতা অবগুণ্ঠনবতী বালিকার কোমল হস্ত রক্ষিত হইল।

রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব-গদগদ-কণ্ঠে ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন—"দাক্ষায়ণি! মা আমার! এই তোমার স্বামী। স্বামী নারায়ণ। এই হরিহর-নামধারী নারায়ণের করে আমি আজ তোমাকে নিবেদন করিলাম।"

এই বলিয়াই তিনি বালিকার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দিলেন। আমাদের চারি চক্ষুর মিলন হইল।

উল্লাসে আমার সর্ব্বশরীর স্পন্দিত হইয়া উঠিল। উল্লাসে স্খলন-ভয়ে বালিকা স্পন্দিত হস্তে সবলে আমার নারায়ণযুক্ত হস্ত চাপিয়া ধরিল। অবগুণ্ঠনবতী রমণীর অতি মৃদু উলুধ্বনিতে হুগলি সহরের একটি নির্জ্জন পথে আমাদের বিবাহ-কার্য্য নিষ্পন্ন হইল। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী আর দাক্ষায়ণী এই তিনজন সাক্ষী। বাহিরের সাক্ষী এক শূদ্রাণী। সে চিত্রপুত্তলিকার মত আমাদের বিবাহ-ব্যাপার দেখিতেছিল। আর কেহ জানিল না। এ অপূর্ব্ব সংযোগ-কথা আজিও পর্য্যন্ত আমাদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে সংগোপনে সংরক্ষিত রহিয়াছে।

দানান্তে ব্রাহ্মণ আমাকে কোল হইতে নামাইলেন। তারপর হস্ত হইতে শিলাটি গ্রহণ করিলেন। লইয়া বালিকার অঞ্চলে বাঁধিলেন। স্ত্রীলোকের শালগ্রাম-স্পর্শ নিষিদ্ধ, সেই বালককাল হইতেই আমি জানিতাম। কিন্তু সার্ব্বভৌম কি তাহা জানিতেন না ?

শিলা-বন্ধন শেষ হইলে ব্রাহ্মণের আদেশে বালিকার হাত ধরিয়া

আমি সপ্তপদ গমন করিলাম। এইখানে ব্রাহ্মণী আমাদের উভয়কে ধান্য ও দূর্ব্বা-দানে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এই সময়ে দূরে জনসমাগম অনুমিত হইল। ব্রাহ্মণ তখন নিজেও কিঞ্চিৎ ক্ষিপ্রতার সহিত আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, ঝিকে বলিলেন—"মা! ইহজন্মে তোমার উপকার বিস্মৃত হইব না।"

এই কথা শুনিয়াই ঝি দণ্ডবৎ ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে পতিত হইল। বলিল—"দেবতা! অমন কথা মুখেও আনিবেন না।"

"যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, স্মরণ রাখিব। তুমি মা, আমার জাতিকুল রক্ষা করিয়াছ।"

"আমি শূদ্রের মেয়ে! তবে জন্মজন্মান্তরে বুঝি কিছু পুণ্য করিয়াছিলাম। নইলে আমি এই অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিতে পাইলাম কেন?"

ব্রাহ্মণ তাহাকে কিছু পুরস্কার দিতে চাহিলেন। সে কাঁদিয়া ফেলিল—পুরস্কার গ্রহণ করিল না। বলিল—"ঠাকুর! আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার ধর্ম্মে মতি থাকে।"

ব্রাহ্মণ মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর বলিলেন—"আর নয় মা, বালককে গৃহে লইয়া যাও। নিষ্ঠুরা মাতা জানিতে পারিলে, বালকের ও তোমার লাঞ্ছনা হইবার সম্ভাবনা।"

"কিছু ভয় নাই। আপনার আশীর্ব্বাদে সব গুছাইয়া লইব।"

এই বলিয়া ঝি আমাকে কোলে উঠাইয়া লইল।

কর্ম্মবশে এ অপূর্ব্ব সুখসঙ্গ আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। ব্রাহ্মণ কন্যা ও পত্নীকে লইয়া পথের একদিকে চলিয়া গেলেন। ঝি আমাকে কোলে করিয়া বিপরীত দিকে লইয়া চলিল।

গৃহে ফিরিয়া দেখি, বাড়ীখানা যেন এক বিরাট সুষুপ্তি আশ্রয় করিয়াছে। নিদ্রিত কুকুর দুইটার পার্শ্ব দিয়া, সুষুপ্ত ভৃত্য পাঁচুর মস্তকে পাদস্পর্শ করাইয়া, সুনিদ্রিত পিতার নাসিকাধ্বনি শুনাইয়া, মোহাচ্ছন্ন জননীর পার্শ্বে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে উপস্থিত হইয়া, ঝি সন্তর্পণে আমাকে শয্যায় শয়ন করাইল।

অতি প্রত্যুষে একটা বিচিত্র স্বপ্ন-দর্শন-শেষে সহসা কার যেন আহ্বানে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। "হরিহর! বাবাজী! খোকা বাবু!"

ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখি, সম্বোধন-কর্ত্তা অপর কেহ নহে—গণেশের মা'র গণেশ।

(২১)

প্রাতঃকালে খুড়া-রহস্য প্রকাশিত হইল। খুড়ার আহ্বানে আমিই সর্ব্বপ্রথম ঘর হইতে বাহিরে আসি। আসিয়া দেখি, খুড়া অর্দ্ধসিক্ত বস্ত্রে বাহির বারাণ্ডার মেজের উপর বসিয়া আছে। জানুদ্বয় বাহুদ্বয়ে আবদ্ধ করিয়া, পা দুইটি ভূমি হইতে ঈষৎ উপরে তুলিয়া, চেয়ারে ঠেস দিবার মত বসিয়া আছে। তার দেহ অনাবৃত—একখানি গামোছা পর্য্যন্ত কাঁধে ছিল না। বসিয়া বসিয়া আমাদের বাসার অনতিদূরস্থ একটা বকুল বৃক্ষের পানে চাহিয়া আপনার মনে শিষ দিতেছিল। আর আরদালী কার্ত্তিক, বারান্দার সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ সোপানে পা দিয়া, খুড়াকে যেন পাহারা দিতেছিল।

আমি বারান্দায় পা দিবামাত্র কার্ত্তিক ঈষৎ অবনত হইয়া আমাকে সেলাম করিল। খুড়া তাহা দেখিতে পাইল। অমনি সে জানু হইতে

হাত ছাড়িয়া, আমার দিকে মুখ ফিরাইল। এবং কার্ত্তিকেরই মত সম্ভ্রম দেখাইয়া আমাকে সেলাম করিল। তাহার সেলাম দেখিয়া, আমি অপ্রতিভের মত দাঁড়াইলাম। বহুকালের পর গুরুজন-দর্শন, সমাজের রীতি-অনুসারে তাহাকে প্রণাম করা উচিত ছিল। কিন্তু আমি তাহা করিতে পারিলাম না। দুই কারণে পারিলাম না। খুড়া কি করিতে আসিয়াছে, আমার জানা ছিল। আরদালীর সুমুখে রাঁধুনী বামুনের কাছে মাথা হেঁট করিতে মনটা কেমন 'কিন্তু' করিতে লাগিল। দ্বিতীয় কারণ—খুড়াকে প্রণাম করিলে, মাতার কাছে তিরস্কৃত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল।

আমি প্রণাম করিলাম না। তৎপরিবর্ত্তে তাহাকে ভিতরে আসিতে অনুরোধ করিলাম। খুড়া শুনিতে পাইল না, কি শুনিয়াও শুনিল না, বুঝিতে পারিলাম না। সে আবার মুখ ফিরাইয়া বকুল বৃক্ষের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমিও তার দেখাদেখি বকুলের পানে চাহিলাম। চাহিবামাত্র একটা স্পন্দন, দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তারাভেদ করিয়া, হৃদয়দেশে একটা প্রবল ঝঙ্কার তুলিয়া দিল। কাল আমি এই বকুলেরই তলসমীপে আমার ক'নের হাত ধরিয়া এক বিচিত্র লীলা করিয়া আসিয়াছি! মনে হইতেই আমি বকুলের পানে আর একবার সাগ্রহদৃষ্টিতে চাহিলাম। বকুলের শুধু মাথা সেখান হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। দেখিয়া আমার বোধ হইল, বকুল যেন মস্তক অবনত করিয়া স্নিগ্ধঘন-মধুর নীরবতায় তলদেশের আমাদের পূর্ব্বরাত্রির লীলার ধ্যান করিতেছে।

বোধ মাত্রেই আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। মাথাঘোরার সঙ্গে সঙ্গে

আমার উপাধি-বোধেরও বিপর্য্যয় ঘটিল। আমি যে ডেপুটীর পুত্র, তাহা ভুলিয়া গেলাম। সম্মুখের বকুল আসঙ্গলিপ্সায় আমাদের গ্রামস্থ তাহার অগণ্য বকুল সহচরকে আনিয়া, বারাণ্ডার সম্মুখস্থ আকাশ পাতায় পাতায় ঢাকিয়া দিল। আমার মনে হইল, সেই অপূর্ব্ব শান্তিময় ছায়াতলে আনন্দময় খুড়া, ঘটকচূড়ামণির মূর্ত্তিতে আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। আমাকে কোথাও যেন দেখিতে না পাইয়া আকাশপানে চাহিয়া আছে।

আমি ধীরে ধীরে খুড়ার সমীপে উপস্থিত হইলাম। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ করিলাম। চরণে করস্পর্শে খুড়ার যেন চৈতন্য হইল। চোক নামাইয়া খুড়া আমার মুখের পানে চাহিল। চাহিয়াই ঈষৎ হাসির সহিত আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল—"হরিহর! কি আর বলিব! জগদম্বার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তুমি দীর্ঘজীবী হও।" কথা বলিতে বলিতে গণেশ-খুড়ার চোখে জল আসিল।

আমি বলিলাম—"কাকা! রাত্রিতে তোমার বড়ই লাঞ্ছনা হইয়াছে।"

"কিছু হইয়াছে।—মিছা কথা কহিব কেন, হরিহর! তবে তোমার মুখ দেখিয়া সে সমস্ত ভুলিলাম। আমি তোমার গণ্ডমূর্খ কাকা। অধিক কথা তোমাকে আর বলিতে পারিলাম না।"

"ইহার জন্য বাবা, মা—উভয়েই মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছেন।"

এ কথায় খুড়া আর কোনও উত্তর করিল না। আমার মনে হইল, তাহার বিশ্বাস হইল না। আমিও এক প্রকার মিথ্যা কহিয়াছি। পিতামাতার মর্ম্মকথা কিছুই না জানিয়া, শুদ্ধমাত্র অনুমান অবলম্বনে, ঐরূপ

বলিয়াছি। আমার বিশ্বাস ছিল, মানুষমাত্রেই খুড়ার ওইরূপ অবস্থায় দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারে না।

যাহা হউক, সে অপ্রিয় আলোচনায় নিরস্ত হইয়া, আমি খুড়াকে ঘরে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলাম।

খুড়া ঘরে প্রবেশ করিতে চাহিল না। বলিল—"না। আমি এখানে বেশ বসিয়াছি। তুমি এক কাজ কর। তোমার বাপের নামে একখানা পত্র আনিয়াছি। তাঁহাকে দিয়া আইস।"

এই বলিয়া সিক্ত বস্ত্রাঞ্চল হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া খুড়া আমাকে দিল। অগত্যা আমি পিতাকে দিবার জন্য পত্রখানা হাতে লইলাম।

খুড়ার নিকট হইতে অধিক দূর যাইতে হইল না। দুই চারিপদ চলিয়া আসিতেই পিতার কণ্ঠস্বর আমার শ্রুতিগোচর হইল। বুঝিলাম, তিনি শয্যাত্যাগ করিয়াছেন। মায়েরও কথা শুনিলাম। বোধ হইল, পিতামাতায় একটা বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে। দূর হইতে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। কেবলমাত্র এই বুঝিলাম, কথাটা খুড়ার সম্বন্ধেই হইতেছে। পিতা খুড়াকে হুগলীতে আনিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; শুধু মায়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাহাকে আনাইতে চিঠি দিয়াছিলেন।

মায়ের শেষ কথাটামাত্র আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। মা বলিতেছিলেন—"যাইতে হয়, তুমিই যাও। আমার যাইতে দায় পড়িয়াছে। তোমার দেশের লোক। খোসামোদ করিতে হয়, তুমিই কর। আমি করিতে যাইব কেন? আমি তোমাদেরই জন্য চিঠি লিখিতে বলিয়াছি।"

ইহার পরেই পিতা তাঁহার শয়নকক্ষ হইতে বাহিরে হলঘরে

আসিলেন। মাতা গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন না। প্রতিদিন বেলা পর্য্যন্ত ঘুমান তাঁহার অভ্যাস ছিল। আমার অনুমান হইল, পিতাকে বিদায় করিয়া, তিনি আবার শয়ন করিয়াছেন।

পিতা বারান্দার দিকেই আসিতেছিলেন দেখিয়া আমি আর অগ্রসর হইলাম না। চিঠিখানা হাতে করিয়া কার্ত্তিকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। যেখানে সে দাঁড়াইয়াছিল, সেখান হইতে পিতার আগমন দেখা যায় না।

আমাকে নিকটে পাইয়া কার্ত্তিক জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ খোকাবাবু, ও ঠাকুরটি আপনাদের কে ?"

আমি কোনও উত্তর দিতে না দিতে পিতা বারান্দায় পদক্ষেপ করিলেন। কার্ত্তিক অমনি মস্তক ভূমিলগ্নপ্রায় করিয়া তাঁহাকে সেলাম করিল।

গণেশ-খুড়াও পিতার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল ; এবং কার্ত্তিকের দেখাদেখি তাহারই অনুকরণে পিতাকে সেলাম করিল।

পিতার মুখে তখনও নিদ্রাভারচিহ্ন বিদ্যমান ছিল। খুড়ার আচরণে তাহা আরও যেন ভারী হইয়া উঠিল। তিনি খুড়াকে প্রথমে কিছু না বলিয়া, আরদালীর দিকে মুখ ফিরাইলেন; ফিরাইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কি রে ! তোর এমন অবস্থা কে করিল ?"

কার্ত্তিক করযোড়ে উত্তর করিল—"হুজুর ! গোলামকে এখন সে কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। করিলে উত্তর দিতে পারিব না ; বাপ-মায়ের বড় পুণ্য ছিল, তাই হুজুরের হুকুম তামিল কর্‌তে পেরেছি।"

পিতা। বলিস্ কি !

কার্ত্তিক। ইহার পরে বলিব। আপাততঃ ঠাকুরকে একখানা বস্ত্র দিন। ঠাকুরের কাপড়-চোপড় সব জলে ভাসিয়া গিয়াছে।

পিতা আমাকে একখানা বস্ত্র আনিতে আদেশ করিলেন। আদেশ শুনিবামাত্র গণেশ-খুড়া বলিয়া উঠিল—"না হুজুর, প্রয়োজন নাই। খোকাবাবুর হাতে আপনার নামের এক পত্র দিয়াছি। সেইখানা লইয়া, আমাকে কৃতার্থ করুন। একটা উত্তর পাইলে আরও কৃতার্থ হই।"

গণেশ-খুড়ার এ কথাতেও পিতা কোন উত্তর করিলেন না, অথবা তাহার পানে চাহিলেন না। তিনি কার্ত্তিককে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাল যে রাঁধুনীর সন্ধানে তোরা দু'জন চলিয়া গেলি, তার কি করিয়া আসিলি?"

কার্ত্তিক বলিল—"খুব ভাল একজন রাঁধুনী পাইয়াছি। খাজাঞ্চীবাবু তাহাকে যোগাড় করিয়াছে। সে আগে একজন হাকিমেরই ঘরে চাকরী করিত। সব রকমের রসুই তাহার জানা আছে। মাহিনা কিছু বেশী চায়।"

"তাহাতে কোন আটক হইবে না। তুই কাপড় ছাড়িয়া এখনি তাহাকে লইয়া আয়।"

কার্ত্তিক সিঁড়িতে দ্রুত নামিতে লাগিল। উঠানে পা দিতে না দিতে, পিতা আবার তাহাকে ডাকিলেন। কার্ত্তিক আবার ফিরিল। পিতা তাহাকে গোপনে কি বলিতে অভিলাষ করিলেন। আমি থাকিলে তাঁহার বলার সুবিধা হইবে না বুঝিয়া, বোধ হয়, পিতা আমাকে খুড়ার জন্য আবার কাপড় আনিতে আদেশ করিলেন।

কাপড় আনিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, মা আবার ঘুমাইয়াছেন।

যেখানে কাঠের আনালায় পিতার কাপড় থাকিত, আমি নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে সেইখানে গেলাম এবং পিতার পরিধেয় বস্ত্রের মধ্য হইতে একখানি উৎকৃষ্ট ফরাসডাঙ্গার কালাপেড়ে কাঁচি ধুতি গ্রহণ করিলাম। ধুতি চুনট করা কোঁচান। কার্ত্তিক কাপড় কোঁচাইতে পারদর্শী ছিল বলিয়া, পিতা তাহাকেই সমস্ত কাপড় কোঁচাইতে দিতেন।

কাপড় লইয়া দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, এমন সময়ে মায়ের ঘুম ভাঙিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হরিহর ?"

"কাপড়।" "কার জন্য ?" আমি আসল কথাটা গোপন করিয়া বলিলাম—"বাবা চাহিয়াছেন।" "তা, তুমি লইয়া যাইতেছ কেন ?" "আমাকেই লইয়া যাইতে বলিয়াছেন।" "কি কাপড় দেখি।"

আমি দেখাইলাম। মা কাপড়খানা দেখিয়াই বলিলেন—"বাবু কি বাহিরে যাইবেন ?"

"না।" "তবে ?" "একখানা কাপড় লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। আমি এইখানাই লইয়াছি।" "সে পাগলটা কোথায় আছে ?"

আমি যেন বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোন্ পাগল!"

"গণেশের মা'র গণেশ। যেটাকে রসুইয়ের জন্য আনাইয়াছি।"

মা আমার দুষ্টামী বুঝিয়াছিলেন কি না জানি না। তিনি কিন্তু আমাকে প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করিবার অবকাশ দিলেন না। শুধু গণেশ বলিলেই আমি আবার জিজ্ঞাসা করিতাম, কোন্ গণেশ। ইতিপূর্ব্বে গণেশ নামে আর এক 'বামুন' আমাদের বাড়ী মাসখানেক চাকরী

করিয়াছিল। তাহারও একটু পাগলামীর-ছিট্‌ ছিল। আমাদের গ্রামেও গণেশ নামে চারি পাঁচজন লোক ছিল তাহাদের এক একটি নিজস্ব নির্দ্দিষ্ট গুণানুসারে এক একটা বিশেষ বিশেষ বিশেষণ ছিল। যথা,— পোড়া গণেশ, বাঘা গণেশ, গোবর গণেশ ইত্যাদি। কি জন্য যে, তাহারা এইরূপ বিশেষণ-লাভ করিয়াছিল, তাহা কাহারও বড় একটা জানা ছিল না। পোড়া গণেশ পোড়া ছিল না, বরং সুপুরুষই ছিল। তবে বিশেষণটি যোগ দিলেই কে যে কোথাকার, তাহা আমাদের কাহারও বুঝিতে বাকী থাকিত না। সেইরূপ গণেশের মা'র গণেশ, এই কথা বলিলেই আমাদের গ্রামমধ্যে খুড়ার সম্যক্‌ পরিচয় হইত।

"গণেশের মা'র গণেশ" এই কথা শুনিবামাত্র আমাকে বলিতে হইল, —"বারান্দায় আছে।" "বাবু?" "তিনিও সেইখানে আছেন।" "আর কে আছে?" "আর ছিল আরদালী।" "এখন নাই?" "বাবা তাকে কাপড় ছাড়িবার জন্য চলিয়া যাইতে বলিয়াছেন।" "কাপড় আমার হাতে দিয়া তাঁকে ডাকিয়া আন।"

কি করি; মায়ের হাতে কাপড়খানা রাখিয়া, পিতাকে ডাকিতে চলিলাম।

আমার ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া, পিতা ঘরে ফিরিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়াই কাপড়ের কথা তুলিলেন। আমি যাহা বলিবার বলিতে না বলিতে মা ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন—"কি বলিতেছ?"

"গণেশের জন্য একখানা কাপড় চাহিতেছি।"

"কেন, গণেশ কি উলঙ্গ আসিয়াছে?"

"তাহার কাপড়ের পুঁটুলি গঙ্গায় ভাসিয়া গিয়াছে। সে নিজেও

ভাসিয়া যাইত; কার্ত্তিক গঙ্গায় নামিয়া অতি কষ্টে তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছে।"

"মরিলেই ভাল হইত। হতভাগাটা কিছুতেই ত আমাদের কথা শুনিল না। যাক্, তুমি কি সেই জন্য ছেলেকে কাপড় আনিতে হুকুম করিয়াছ?"

পিতা যেন অপ্রতিভ হইলেন। এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মাতা বলিতে লাগিলেন—"এই বুদ্ধিতে তুমি হাকিমী কর? রাঁধুনী বামুনের পরিচর্য্যা করিতে ছেলেকে হুকুম কর! কেহ ছিল না বলিতেছ। কার্ত্তিক ছিল না?"

"কার্ত্তিক থাকিলে কি হইবে? তাহাকে ত আর গণেশের কাপড় ছুঁইতে দিতে পারি না!"

"কেন গো! সে বাগ্‌দী বলিয়া? এ দেশের বাগ্‌দীর আচার-ব্যবহার তোমাদের দেশের বামুনগুলার চেয়েও শতগুণে ভাল। আমি কার্ত্তিকের জল নিঃসঙ্কোচে খাইতে পারি। কিন্তু তোমাদের দেশের বামুনের হাতের জল খাইতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।"

পিতা মায়ের এই কথায় ভ্রূ আকৃষ্ট করিয়া, অর্দ্ধবদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"কর কি! আস্তে কথা কও। সে এই বারান্দায় বসিয়া আছে।"

ঠিক এমনি সময়ে খুড়া গাহিয়া উঠিল—

"দোষ কারো নয় গো মা!
আমি স্বখাদ-সলিলে ডুবে মরি শ্যামা!"

মাতা চমৎকৃতের মত দাঁড়াইলেন। পিতাও যেন একটু বিচলিত

হইলেন। গান কিন্তু বেশীক্ষণ হইল না। গোটাকতক হাঁচি আসিয়া এই এক কলিতেই খুড়ার গান বন্ধ করিয়া দিল।

পিতা বলিলেন—"গণেশ শুনিতে পাইল না কি!"

"পেলেই বা। আমি ত আর কাহাকেও ভয় করিয়া বলিতেছি না। যা সত্য—তাই বলিতেছি।"

এই বলিয়া মা কাপড়খানা হাতে তুলিয়া পিতাকে দেখাইলেন। বলিলেন,—"এই কাপড় কি গণেশকে পরিতে দিতে হইবে? এই সাত টাকার ধুতি পরিয়া সে রাঁধিবে?"

পিতা কাপড় দেখিয়াই শিরঃকণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিলেন—"ওকে কাপড় আনিতেই বলিয়াছি। বোকাটা যে ওই কাপড় আনিবে, তা কেমন করিয়া বুঝিব!"

"বোকা ও হইতে যাইবে কেন—বোকা তুমি। বালক—ও কি জানে?"

"বেশ, তুমি যা জান তাই কর। গণেশকে একখানা কাপড় দাও। দেখ, একদিনের জন্য সে আসিয়াছে। ইহার মধ্যে একটা গোল বাধাইও না।"

"একদিনের জন্য কেন? সে কি চাকরী করিবে না?"

"একদিনই কেন, এক দণ্ড বলিলেও চলে। ওপারে নৈহাটীতে তার কুটুম্ব আছে। সে সেইখানেই যাইবে।"

মায়ের দম্ভে যেন আঘাত লাগিল। গণেশ-খুড়া চাকরী করিবে না, ও আমাদিগকে 'বাবু' 'হুজুর' বলিতে পারিবে না বলিয়া, ডোঙ্গা হইতে জলে ঝাঁপ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল; সেই গণেশ ফিরিয়া চাকরী

করিতে আসিয়াছে। চাকরী করিলেই বোধ হয়, মায়ের অভিমান বজায় থাকিত। তাহা হইবে না, খুড়া থাকিবে না শুনিয়া মা যেন কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইলেন। অন্ততঃ তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া এইটাই আমার বোধ হইল।

মা বলিলেন,—"সে কি তোমাকে বলিয়াছে, চাকরী করিবে না?"

"স্পষ্টতঃ বলে নাই। কথার-ভাবে বুঝিয়াছি। আর সে চাকরী করিতে চাহিলেও আমি করিতে দিব না।"

"কেন? স্বদেশবাসীর উপর সহসা এত রাগ হইল কেন?"

"আমি ভাল রাঁধুনী-বামুন পাইয়াছি।"

"দিনকতক তাহাকে দিয়া রাঁধাইলেই আমার মনের আক্ষেপ মিটিত।"

"আক্ষেপ মিটাইতে পারিতে, যদি দেশে আর আমাদের না ফিরিতে হইত। সে থাকিলে তোমার আরদালী যখন তখন যে সে ঘরে ঢুকিতে পারিবে না, রান্নাঘরের ত্রিসীমা মাড়াইতে পাইবে না। বাজার হইতে খাবার আসিবে না। মেম সাহেবকে কিছুদিনের জন্য সেলাম ঠুকিতে হইবে।"

"তবে সে আসিয়াছে কেন?"

"কেন আসিয়াছে বুঝিতেছি!"

এই বলিয়া পিতা ভিতর-বারান্দার দিকে চলিয়া গেলেন।

(২২)

তখন সবেমাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে। ঝি-চাকর—উভয়েই ঘুমাইতে-ছিল। আমরা রোজ রোজ বেলায় ঘুম হইতে উঠি বলিয়া, চাকরটাও বেলা

পর্য্যন্ত ঘুমাইত। কিন্তু ঝি প্রতিদিন প্রত্যুষেই উঠিত। মায়ের শয্যা-ত্যাগের পূর্ব্বে সে ঘরের অনেক কাজ সারিয়া রাখিত।

আজ প্রথম, মায়ের ডাকে ঝির নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে একটু সশঙ্ক-ভাবে চোখ মুছিতে মুছিতে মায়ের কাছে ছুটিয়া আসিল।

সে কাছে আসিতেই মা তাহাকে একটু মৃদু তিরস্কারের ভাবে বলিলেন—"এমনি করিয়া ঘুমাইয়া কি তুই মনিবের চাকরী করিবি?"

"আজ একটু উঠিতে বেলা হইয়াছে। আর আপনি যে আজ এমন সময় উঠিবেন, তা জানিতাম না।" "তাহা হইলে জেগে ঘুমাইতেছিলি বল্?" "না মা, ঘুমাইতেছিলাম।" "মিথ্যা কথা বলিতেছিস্ কেন্?" "মিথ্যা কেমন করিয়া জানিলে?"

"তোর চোখ দেখিয়া বুঝিতেছি। তোদের কাজ দেখিবার জন্যই আমি আজ সকাল-সকাল উঠিয়াছি।"

দেশে আমি সময়ে অসময়ে মায়ের কথায় কথা কহিতাম। মায়ের যে কাজটা আমার অন্যায় বলিয়া বোধ হইত, আমি প্রতিবাদ করিতাম। সেখানে পিতামহ ও পিতামহীর আশ্রয় ছিল। এখানে একমাত্র মায়ের আশ্রয়। মার কথা অনর্থক অন্যায় হইতেছে দেখিয়াও আমি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলাম না।

ঝি কি একটা উত্তর করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার দৃষ্টি আমার উপর পড়িয়া গেল। কি জানি, কি বুঝিয়া, সে বলিতে নিরস্ত হইল। তখনও ঝি-চাকরের আজিকালিকার মত গুমর বাড়ে নাই। এক রাঁধুনী-বামুন ছাড়া আর সকলই সুপ্রাপ্য ছিল। তাহাদের বেতনও এখনকার মত অধিক ছিল না। আমার বোধ হয়, নিজের

দরিদ্র অবস্থা স্মরণ করিয়া, সে মায়ের এই অযথা কঠোর বাক্য-প্রয়োগে ক্রোধ দেখাইতে সাহস করিল না। কেন না আমি বুঝিয়াছি সে মিথ্যা কহে নাই। সে মস্তক অবনত করিয়া নীরবে মার সম্মুখে দাঁড়াইল।

ঝি আর কোনও কথা কহিল না দেখিয়া, মা বলিলেন—"যা,—এবার মাপ করিলাম। মিছা কথায় মনিবের কথার উত্তর দিবার বেয়াদবী দ্বিতীয় বার যেন দেখিতে না পাই।"

ঝি প্রস্থানোদ্যতা হইল। মা বলিলেন—"দাঁড়া। আমার কাজ আছে। তোর একখানা থান কাপড় লইয়া আয়।"

"পরিয়া আসিব ?" "না; হাতে করিয়া আন্।"

"আপনার সঙ্গে কোথাও কি যাইতে হইবে ?"

"না। আগে লইয়া আয়। কি জন্য, তার পরে বলিতেছি।"

ঝি কাপড় আনিতে গেল। ইত্যবসরে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গণেশের সঙ্গে তোর কি কোনও কথা হইয়াছিল ?"

"কথা হইতে না হইতে বাবা আসিয়া পড়িলেন। তাঁর আদেশে আমি খুড়ার জন্য——।" "খুড়া" বাক্য উচ্চারিত হইতে না হইতে মা হস্ত দ্বারা আমার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। কাপড় আনিবার কথা আর মুখ হইতে বাহির হইল না। "খুড়া কে মূর্খ!—হুঁসিয়ার! আমি যা শুনিলাম; চাকর-দাসীদের মধ্যে আর কেহ যেন এ কথা শুনিতে না পায়। শুনিলে আমাদের মাথা কেটে হইবে। হুগলীতে আর আমরা থাকিতে পারিব না।"

এই সকল বিপদ-বিভীষিকার কথা শুনিয়া, আমি মনে করিলাম, না জানি কি গর্হিত কার্যই করিয়াছি। আমাদের হুগলী-বাস উৎখাত

করিতে কোথা হইতে খুড়ারূপে এক প্রকাণ্ড কোদাল আসিয়াছে! আমি একেবারে দাঁতে দাঁত দিয়া চুপ করিলাম। ঝি অচিরে কাপড় লইয়া আসিল।

বস্ত্র ঝির পরিধেয়; অর্দ্ধ মলিন। ঝি বিধবা বলিয়া তাহাতে পাড় ছিল না। মা সেই বস্ত্র খুড়াকে দিবার জন্য ঝিকে আদেশ করিলেন। ঝি মায়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল, সে আদেশের অর্থ বুঝিতে পারিল না। মা বলিলেন—"হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলি কেন? বামুনকে দিয়ে আয়।"

ঝি বলিল—"কেন?" "কাপড় আবার কি জন্য দিয়া আসে?"

"তা তো জানি;—কিন্তু পরিবে কে?"

"ওই বামুনই পরিবে—আবার কে! বোকা বামুন গঙ্গায় ডুব দিতে গিয়া পুঁটুলি হারাইয়া আসিয়াছে। ভিজে কাপড়ে বসিয়া আছে বলিয়া, বাবু তাহাকে একখানা কাপড় দিতে বলিয়াছেন।"

"আমার কাপড়, বামুনকে পরিতে দিবে কিগো!"

"কেন, দোষ কি? তোতে আর তাতে বেশি তফাৎ কি? তুই দেড় টাকা মাহিনা পাস্, সে বড়-জোর না হয়, তিন টাকা পাইবে!"

ঝি স্থিরদৃষ্টিতে মায়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল; কিছুক্ষণের জন্য কে যেন তাহার কণ্ঠরোধ করিয়াছে। ঝি উত্তর করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কথা যেন বাহির হইতেছে না।

মা তাহাকে এইরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন—"হাঁ করিয়া, ডাইনের মত মুখের পানে কি দেখিতেছিস্? আমাকে গিলিয়া খাইবি না কি?"

তথাপি ঝি কথা কহিল না; মায়ের মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া

রহিল। সে কি যেন মাকে বলিবে, কিন্তু বলিবার সাহস আসিতে আসিতে আসিতেছে না।

তাহাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া, মাও যেন কিছু শঙ্কিত হইলেন। অনেক সময়ে নির্ব্বাক্-লাঞ্ছনা উচ্চ-চীৎকারের কলহকে পরাস্ত করে। এ ক্ষেত্রেও তাই হইল; ঝিয়ের অবজ্ঞার দৃষ্টির কাছে মা পরাভব স্বীকার করিলেন; বলিলেন—"বেশ, তুই দিতে না পারিস্, কাপড় আমাকে দে।"

এইবারে ঝি কথা কহিল। অতি মৃদুতার সহিত সে মাকে বলিল—"হাঁ মা! তুমি কি?"

মা বোধ হয়, ঝির প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। আমি কিন্তু বুঝিয়াছিলাম। ঝিয়ের পরবর্ত্তী প্রশ্নে, আমি যে বুঝিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম।

মা বলিলেন—"কি মানে কি?"

"বাবু ত শুনিয়াছি ব্রাহ্মণ; কিন্তু তুমি কি?"

এই কথা শুনিবামাত্র মার চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি তদ্দণ্ডেই ঝিকে একটা কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেন।

ঝি কিন্তু তাহাতে চিত্তের বিন্দুমাত্রও বিচলন প্রদর্শন করিল না। সে বলিল—"ক্রোধ কর, কটু বল, তাহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই। আমি তাঁতির মেয়ে। এক সময় আমাদের বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব হইত। দৈব-দুর্ব্বিপাকে আজ আমাকে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত অবস্থাপন্ন আমার অনেক কুটুম্ব আছে। আমার এক বোন-ঝি জামাই তোমারই স্বামীর মত হাকিম।"

মা চমকিয়া উঠিলেন। আমি দেখিলাম, ঝি তাহা লক্ষ্য করিল না। সে বলিতে লাগিল—"আমি, আমার মর্য্যাদা ও অভিমান বজায় রাখিতে, তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করি নাই। গতর খাটাইয়া খাইব, তবু জ্ঞাতি-কুটুম্বের কাছে মাথা হেঁট করিতে পারিব না, বলিয়া তোমাদের দ্বারে আসিয়াছি। জানি—থাকিলে আমার নিন্দা হইবে না। কিন্তু তোমাদের ভাবগতি দেখিয়া এখানে কয়দিন হইতেই আমার সন্দেহ হইয়াছে;—সন্দেহ কেন, ভয় হইয়াছে। ভাবিতেছি, ব্রাহ্মণ ভাবিয়া কার বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করিতে আসিলাম।"

মা বলিলেন—"তোর কি মনে হয়?"

ঠিক এই সময়ে গণেশখুড়া গাহিয়া উঠিল—

"ছুয়ো না রে শমন আমার জাত গিয়েছে।"

গাহিতে গাহিতে হল-ঘরের দ্বারের সমীপে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরের মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়াই খুড়া পিতাকে লক্ষ্য করিয়া, ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"কই হুজুর?—চিঠি দাও। আমি আর অধিক বিলম্ব করিতে পারিব না।"

মাতা তাহার সম্বোধনের কর্কশতা অনুভব করিয়া বলিলেন—"মূর্খ! এ তোমার বন্য বর্ব্বরের দেশ নয়। একটু আস্তে কথা কহিতে জান না!"

মায়ের কথা শুনিয়াই গণেশ ঘরের ভিতরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল এবং মাকে দেখিবামাত্রই, আমাদের বেলায় যেরূপ করিয়াছিল, সেলাম করিল।

মা তাহার এইরূপ রহস্যাভিনয়ে ক্রোধ-সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার অধর কম্পিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু তিনি মুখ হইতে কোন কথা বাহির করিতে না করিতে গণেশ-বলিয়া উঠিল—"ক্রোধ করিতেছ কেন, মা লক্ষ্মী? তোমার বাগ্‌দী আরদালীই আমাকে এই সব শিখাইয়া দিয়াছে। কাল আমি তোমাদের এখানে খানা খাইতে দেখিয়াছিলাম; দেখিয়া বাহির হইতেই চুপিচুপি পলাইবার চেষ্টায় ছিলাম। ফটকের মুখে কুকুর দুইটা আমাকে আক্রমণ করে। তাহাদের হাতে রক্ষার উপায় না পাইয়া, তোমাদের মুরগীর ঘরে ঢুকিয়াছিলাম। তার পর কয়বেটাতে পড়িয়া আমাকে ধরিয়া চোরের মার মারিয়াছে।"

মাতা মস্তক অবনত করিলেন। খুড়া বলিতে লাগিল—"এখনও কি মা লক্ষ্মী, তোমার রাগ মিটিল না?"

"'মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি'—যেমন কাজ করিয়াছ, তাহার ফল পাইয়াছ।"

"তা যা বলিয়াছ। আমার কা'ল বড়ই মূর্খামী হইয়াছে। দাদার আশ্রয়ে আসিতেছি বুঝিয়া বাড়ীতে লাঠি গাছটি ফেলিয়া আসিয়াছি।"

"লাঠি আনিয়া আমাদের মাথা ভাঙিয়া দিতে নাকি?"

"আগে তোমার ওই কুকুর দু'টার মাথার ঘি বাহির করিতাম।"

"কুকুরের গায়ে লাঠি ঠেকাইলে, তখনই শ্রীঘরে যাইতে হইত। কুকুর দুইটির দাম দুইশো টাকা। তোমার ভিটামাটি বিক্রী করিলেও ওর দাম উঠিত না।" "বটে!"

"তোমার ভাগ্য, যে কুকুরের গায়ে হাত দাও নাই। দিলে আর বাবুর কাছে তোমার দয়া পাইবার কোন প্রত্যাশা থাকিত না।"

"আর তোমার কাছে?"

মা উত্তর করিলেন না। খুড়া কিন্তু উত্তর শুনিবার জেদ ধরিল।

একবার—দুইবার তিনবার। আমরা—ঝি ও আমি, হতভম্বের মত দেখিতেছি। তৃতীয় বারের পরেও যখন খুড়া উত্তর শুনিবার জেদ ছাড়িল না, তখন মা অত্যন্ত ক্রোধের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"আরদালী!"

আরদালী আসিল না। তৎপরিবর্ত্তে ভিতর দিক হইতে আমার পিতৃদেব ছুটিয়া আসিলেন।

মা ও খুড়ার কথাবার্ত্তা বোধ হয়, তিনি ভিতর-বারান্দা হইতে শুনিয়াছিলেন। তাই, আরদালীর নাম শ্রুতিগোচর হইবামাত্র ব্যাপার কিছু কঠিন হইতেছে বুঝিয়া, শৌচাদিকার্য্য সম্যক্ শেষ না করিয়াই, ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন। একখানা তোয়ালে ও সাবান হাতে পাঁচুও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে।

পিতা গৃহে প্রবেশ করিবামাত্রই গণেশ-খুড়া বলিয়া উঠিল—"মেম সাহেব! তোমার ওই আরদালী হুজুর আসিয়াছেন। উহাকে কি হুকুম করিবে কর। আমি উঁহারই সম্মুখে জোর করিয়া আবার বলিতেছি—আগে তোমার ওই কুকুর দুইটার মাথার ঘি বাহির করিতাম; তার পর যে যে—"

এই বলিয়া, খুড়া, কার্ত্তিক-পাঁচু প্রভৃতি যে যে ব্যক্তি পূর্ব্বরাত্রে তাহাকে বন্দী করিয়াছিল, সকলেরই বাপগুলার মুখে ঘৃণিত পিণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া, তাহাদেরও মুণ্ডপাতের সম্ভাবনা ছিল, তাহা বুঝাইয়া দিল।

সত্বর পত্রের উত্তর দিবার আভাস দিয়া, পিতা কিঞ্চিৎ ব্যগ্রতার সহিত খুড়াকে দ্বারদেশ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন।

আমাদের এখানে অবস্থানে খুড়ার নাসিকারন্ধ্র যে বিশেষ উৎপীড়িত হইতেছে, ইহা বুঝাইয়া খুড়া পত্রের প্রতীক্ষার নিজস্থানে ফিরিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আসার জন্য পিতা প্রথমে পাঁচুকে তিরস্কার করিলেন। তারপর ঝিকে ও তাহাকে স্থানত্যাগের আদেশ করিলেন।

তাহারা চলিয়া গেলে, পিতা মাকে বলিলেন—"তুমি কি আমাকে দেশে ফিরিতে দিবে না?"

মায়ের তখনও ক্রোধের উপশম হয় নাই। পিতার কথা, শুনিবামাত্র তিনি উগ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"এখনি যাও। আমি কি তোমাকে ধরিয়া রাখিয়াছি?"

"আমার উপর ক্রোধ করিতেছ কেন? এ আপদ্ কি আমি জুটাইয়াছি?"

"তাই ত চুপ করিয়া আছি। তা না-হ'লে কাণ ধরাইয়া মূর্খটাকে বাটীর বাহির করিয়া দিতাম। হতভাগার এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার কুকুরের মাথায় ঘি বাহির করিবে বলে? হতভাগা জানে না, ওর চেয়ে আমার কুকুরের দর বেশী।"

"বামুনের ছেলে হ'য়ে গণ্ডমূর্খ। ওর কথায় তুমি কাণ দাও! তোমাকে আর কি বলিব! বর্ত্তমান সভ্যতা যে কি, তাহা ওদের বংশে কখন শোনে নাই। তুমি এবং তোমার কুকুর যে কি বস্তু, তা ও কেমন করিয়া বুঝিবে?"

গণেশ খুড়া এই সময় আবার দ্বার-দেশে আসিয়া উপস্থিত। মা কি তাহাকে বলিতে যাইতেছিলেন। পিতা খুড়ার দিকে মুখ ফিরাইয়া পিছন হইতে হস্তের ইঙ্গিতে তাঁহাকে কথা বলিতে নিষেধ করিলেন; এবং বলিলেন—"গণেশ! চিঠির জবাব দেশে পাঠাইয়া দিব।"

গণেশ বলিল—"তবে সেলাম। জেঠাই মাকে কি বলিব?"

"কিছু বলিতে হইবে না।"

"না দাদা! একটা বলিব। বলিব—জেঠাই মা। আমি বাঁদর বটি কিন্তু তুমি যাকে গর্ভে ধরিয়াছ, তার মত আজও আমি মগ্‌ডালে উঠিতে পারি নাই।"

"কি বল্‌লি উল্লুক ?"

উল্লুক উত্তর করিল না।—"দোষ কারও নয় গো মা!" গান গায়িতে গায়িতে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল।

পিতা, বোধ হয়, খুড়াকে শাস্তি দিবার অভিলাষী ছিলেন। মা এবারে তাঁর হাত ধরিলেন। বলিলেন—"গণ্ডমূর্খকে যাইতে দাও।"

"না, একটু আমার শক্তির পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য। নহিলে আমার দেশে যাওয়া সম্ভব হইবে না।" "তবে একটু দেখাইয়া দাও।"

ঠিক এমনি সময়ে উঠানে একটা কুকুর প্রথমে চীৎকার ও পরে আর্ত্ত-নাদ করিয়া উঠিল। কার্ত্তিক দ্রুতপদে গৃহ প্রবিষ্ট হইয়া বলিল—"হুজুর! বামুন কুকুরকে পদাঘাতে বিষম আহত করিয়াছে।"

পিতা গণেশকে আবদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। আরদালী ছুটিল। আমি, পিতা ও মা, তিনজনেই বাহির বারান্দায় ছুটিয়া আসিলাম।

দেখিলাম, আহত কুকুরের মুখ হইতে রক্ত নির্গত হইতেছে—অপরটা পলাইয়াছে।

গণেশ-খুড়া ফটকে পা দিবামাত্র কার্ত্তিক তাহাকে ধরিল। যেমন ধরা, অমনি খুড়া হতভাগ্যের গালে এমন এক চপেটাঘাত করিল যে, সেই আঘাতেই তাহাকে মাথায় হাত দিয়া ভূমিতে বসিতে হইল।

পিতার ক্রোধ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তিনি নিজেই নীচে নামিয়া

খুড়ার গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করিতে চলিলেন। খুড়া তখন ফটক পার হইয়া পথে পা দিয়াছে।

পিতা বলিলেন—"যাবি কোথা মূর্খ? তোকে আমি জেলে দিব।"

"এস দাদা, এস। চিরদিনের জন্য যাতে তোমার মুখ আর দেখিতে না হয়, তার ব্যবস্থা কর।" এই বলিয়া গণেশ পিতার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

আমি ও মা, উভয়েই বারান্দায়। সেখান হইতে পিতাকে ফটক পার হইতে দেখিলাম। গণেশ তখন সগর্ব্বে বলিতেছে—"এস দাদা, এস আমি দু'টি হাত বাড়াইয়া আছি।"

ফটক পার হইয়াই—সেই বকুল, সেই বকুল! গণেশ পিতাকে বকুলের দিক্ দেখাইয়া দিল।

পিতা স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইলেন। আমরা শুনিতে পাইলাম—"অঘোরনাথ! নিরপরাধকে পরিত্যাগ কর। সকল অপরাধের অপরাধী আমি। শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ কর, আমাকে দাও।"

সে মধুর পরিচিত স্বর আজ এক বৎসর পরে শুনিতেছি। সেই স্বরাকর্ষণে সমস্ত বৎসরটা যেন গুটাইয়া দণ্ডে পরিণত হইয়াছে—সুন্দর হুগলী সহর তাহার ভিতর কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে

আমি ছুটিলাম। কে মা—কোথায় মা—ভুলিয়া গেলাম। উন্মত্তের মত সিঁড়ি হইতে নামিয়া, তখনও অর্দ্ধমূর্চ্ছিত কার্ত্তিককে পায়ে ঠেলিয়া, পিতাকে পশ্চাতে ফেলিয়া,—সেই বকুল—সেই বকুল—উন্মত্তের মত আমি বকুলতলে ঠাকুরমাকে জড়াইয়া ধরিলাম।

২৩

বহুদিনের কথা। যথাযথ স্মরণ করিতে মস্তিষ্ক-নিষ্পীড়নে অলৌকিক স্মৃতিশক্তিসম্পন্নেরও সর্ব্বশরীরে অবসাদ আসে। তবু সেদিনের ঘটনা আমি সম্পূর্ণ স্মরণ রাখিয়াছি। এখনও যেন তাহা পূর্ব্বদিনের ঘটনা বলিয়া আমার মনে হইতেছে। তাহার পর আজ! মধ্যে যেন দিনের ব্যবধান বিলুপ্ত হইয়াছে! প্রভাতে জাগরণ-মুখে এক একটা ক্ষুদ্র অনুপলের স্বপ্ন যেমন যুগব্যাপী জীবনকে কুক্ষিগত করে, আমার মনে হয়, গত রাত্রিতে আমিও সেইরূপ একটা স্বপ্ন দেখিয়াছি। মনে হইতেছে, কাল সন্ধ্যায় আমি একাদশ বর্ষীয় বালক ছিলাম। আজ সূর্য্যোদয়ে শয্যা হইতে উঠিয়া দেখি, রাত্রির সেই বিপুল শক্তিধর স্বপ্ন অগণ্য তরঙ্গে আমাকে উত্থিত নিপতিত করিয়া, আমার জীবনের সমস্ত রস নিজের অঙ্গে বিলীন করিয়া লইয়াছে—আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এ বৃদ্ধ দেহে আর কৈশোর-যৌবনের লীলাভারবহনের শক্তি নাই। তাহা আমাকে স্পর্শমাত্রেই দুষ্ট চপল শিশুর মত নখপ্রহারে আমার শুষ্ক দেহকে জর্জ্জরিত করে; অথচ পরিত্যাগ করা দুরূহ! শিশুকে কোল হইতে ভূমিতে নামাইতে মন যায় না। সেই জন্য সে দিনের কথা আমি বলিব। একদিকে পিতা ও মাতা, অন্যদিকে পিতামহী; আমি মধ্যে পড়িয়া, উভয়ের সম্মিলন পথ অবরোধ করিয়াছি। পুত্রমুখ-দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী মাতার দৃষ্টিপথ রোধ করিতে বল্মীক-স্তূপ বিশাল শৈলের আকার ধারণ করিয়াছে। কেমন করিয়া করিয়াছে বলিব।

আমি পিতামহীকে জড়াইয়া ধরিলাম, কিন্তু তাঁহাকে পাইলাম না।

পিতার সক্রোধ সম্বোধনে তাঁহাকে ধরিবার সঙ্গে সঙ্গেই পরিত্যাগ করিতে হইল।

পিতা পিতামহীর দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন। এবং তখনও পর্য্যন্ত পিতামহীর সঙ্গে সংলগ্ন আমার কর্ণ ধরিয়া আমাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

অপমানে ও কর্ণের যাতনায় আমি মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইলাম। কি জানি কেন, চক্ষু হইতে আমার জল নির্গত হইল না।

পিতামহীর কথা আমার কর্ণগোচর হইল। "তুমি কি আমার সঙ্গে সম্পর্ক পর্য্যন্ত রাখিতে চাও না, অঘোরনাথ?"

"সম্পর্ক তুমি রাখিতে দিলে কই?" "আমি রাখিতে দিলাম না!"

"তোমার সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা করিবার আমার অবসর নাই। যদি এখানে আসিবার জন্যই তোমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল, তাহা হইলে একটু ভাল পরিচ্ছদ পরিয়া আসিলে না কেন?"

"বিধবার আবার কিরূপ বেশ পরিচ্ছদ হয়?"

পিতা এ কথার কোনও উত্তর না করিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া আবার আমার কাণ ধরিলেন। তবে এবার সবলে ধরিলেন না—অতি সন্তর্পণে ধরিয়া বলিলেন—"মূর্খ! কাল তোমার পরীক্ষা! তুমি এমনি করিয়া সময় নষ্ট করিতেছ!"

এই কথার পরেই তিনি একবার পিতামহীর দিকে মুখ ফিরাইলেন। বলিলেন—"বেলা হইতেছে। এখনি এ পথে লোক চলাচল করিবে। যদি আসিতে হয় বাসায় চল। এখানে এরূপভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে, আর লোকে পরিচয় জানিলে আমার মাথা হেঁট হইবে। এটা আমার দেশ নয়—চাকুরীস্থল।"

"ভয় নাই অঘোরনাথ, পরিচয় দিয়া এখানে—শুধু এখানে কেন—আর কোনও স্থানে তোমার মাথা হেঁট করিব না। এখন হইতে আমি মনে করিব, তোমার মত পুত্রকে আমি গর্ভে ধারণ করি নাই।" কথা শেষ না করিয়াই যেন পিতামহী খুড়াকে ডাকিলেন—"গণেশ।"

খুড়া অনেকটা দূরে গঙ্গাতীরে যাইবার পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, পিতামহীর আহ্বানে সে দ্রুতগতি নিকটে আসিল।

গণেশকে নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া পিতা বলিয়া উঠিলেন—"সকাল-বেলায় পথের মাঝে একটা মিছা হাঙ্গাম বাধাইয়া কেন মা আমাকে অপদস্থ করিবে—বাসায় চল। আমাকে আগে হইতে না জানাইয়া এরূপ ভাবে তোমার আসা কি উচিত হইয়াছে? কি জন্য এবং কাহার প্ররোচনায় আসিয়াছ, আমি কি বুঝি নাই? নাও, ক্রমে এ পথে লোকের সমাগম হইতেছে। এখানে এরূপ ভাবে আর দাঁড়াইয়ো না। তিরস্কার করিবার কিছু থাকে, ঘরে আসিয়া কর।" ইত্যবসরে খুড়া আমাদের সমীপস্থ হইল। পিতামহী পিতার কথার কোনও উত্তর না দিয়া আবার বলিলেন "গণেশ!"

খুড়া আসিয়াই পিতামহীর মুখ দেখিয়া কি একটা বুঝিয়া লইল। বলিল—"কি হইল জেঠাইমা?"

অবস্থানুযায়ী নিজের মর্য্যাদা রাখিতে হইলে, পিতার সেখানে আর অধিকক্ষণ অবস্থান দুরূহ হইয়া পড়িল। বাস্তবিকই সে পথে লোক উপস্থিত হইতেছিল। একে সেকালের হাকিম, তাহার উপর তখনকার গ্রামবাসী নিরক্ষর লোক। হাকিম পথে বেড়াইতেছে জানিলে, অমনি অমনি দেখিবার জন্য লোক জড় হইয়া যায়। এ কি না হাকিম সাহেব

একটা দীনবেশা বৃদ্ধার সঙ্গে পথে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে! একথা একজনেরও কর্ণগোচর হইলে, তখনি সেখানে রথ দোলের মত লোক জড় হইত। পিতার সেখানে আর মুহূর্ত্তও অপেক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"তবে তোমার যা অভিরুচি তাই কর। আমি আর থাকিতে পারিব না।" এই বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া বাসায় ফিরিতে উদ্যত হইলেন।

গণেশ বলিল—"দাদা!" পিতা উত্তর দিলেন না। পিতামহী বলিলেন—"কাকে দাদা বলিতেছিস্ গণেশ? ফিরিয়া চল্। ও কুলাঙ্গারের সঙ্গে আমাদের আর কোনও সম্পর্ক নাই।" তথাপি খুড়া বলিল—"একটা কথা শুনিয়া যাও।" পিতা এবারেও উত্তর না দিয়া চলিতে লাগিলেন।

আমি একবার সন্তর্পণে তাঁহার মুখের পানে চাহিলাম। দেখিলাম, পিতা বাড়ীর দিকে চাহিয়া পথ চলিতেছেন। আমিও তাঁহার দৃষ্টির অনুসরণে সে দিকে চাহিয়া দেখি, মা ফটক হইতে মুখ বাড়াইয়া আমাদের দিকে চাহিয়া আছেন। মনে করিলাম, মা'কে দেখিয়াই বুঝি পিতা অন্যমনস্ক হইয়াছেন। তাই খুড়ার কথা শুনিতে পান নাই। তাই তাঁহাকে বলিলাম—"খুড়া আপনাকে ডাকিতেছে।"

পিতা বলিলেন—"আমি শুনিয়াছি। তোমার ও কথায় কাণ দিবার প্রয়োজন নাই। একজন বাবু—বোধ হয় উকীল—এদিকে আসিতেছেন। এখানে তিনি পৌছিতে না পৌছিতে তোমার গর্ভধারিণীকে সাবধান করিয়া আইস।" এই বলিয়াই তিনি আমার হাত ছাড়িয়া দিলেন। দুই চারিপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই গণেশ খুড়ার ঈষদুচ্চ উচ্চারিত

কথা আমার কর্ণগোচর হইল—"একটা কথা—একটা কথা—আর তোমাকে বিরক্ত করিতে আসিব না।"

পিতাও ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"যা বলিবার, বাড়ীর ভিতরে আসিয়া বল্।"

"আমি ও ম্লেচ্ছের ঘরে আর প্রবেশ করিব না।"

"তবে ওইখান থেকেই মুখ ফিরিয়ে চলে যা। বাম্‌নাই বুজরুকি ঘরে গিয়া দেখা। ও সব এ চাকরীস্থানে চলিবে না। কি বলবি, আমি তা আগে থাকতেই বুঝতে পেরেছি।"

"না হাকিম দাদা, পার নাই। তুমি মনে করেছ, আমি সার্ভ্যোম-ম'শায়ের কন্যার জন্য তোমাকে অনুরোধ করতে এসেছি। ভয় নাই, তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।"

পিতা খুড়ার দিকে তড়িচ্চালিতের মত মুখ ফিরাইলেন। আমি শিহরিলাম। খুড়া যেন দ্বিগুণ উত্তেজনার সঙ্গে বলিয়া উঠিল—"অতি সৎপাত্রের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। সার্ভ্যোম-ম'শায়ের কন্যা যেরূপ লক্ষ্মী তাহার সেইরূপ নারায়ণ স্বামীই ভাগ্যে ঘটিয়াছে।" খুড়া প্রস্থান করিল। সে যে কি বলিতে চাহিয়াছিল, আর তাহার বলা হইল না। এই সময়ের মধ্যে ঠাকুরমাও কখন যে অন্তর্হিতা হইয়াছেন, আমরা কেহই তাহা জানিতে পারি নাই।

পিতার সঙ্গেই বাসায় ফিরিলাম। মা ইতিমধ্যে ফটক ছাড়িয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়াছেন। আমরা উপরে উঠিলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইল?" পিতা বারবার মাথা হেঁট করিয়াই আসিতে-ছিলেন। পিতামহীর শেষ কথায় এবং অলক্ষিত প্রস্থানে বোধ হয়

তাঁহাকে চিন্তিত করিয়াছে। তিনি মায়ের কথার উত্তর না দিয়া আমাকে বলিলেন,—"যা হরিহর, তোর ঠাকুরমাকে লইয়া আয়।" আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন আমি অতি উল্লাসে বারান্দা পরিত্যাগের উদ্যোগ করিতেছি, অমনি মা আমাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন? নিজেই ঘটকালি করিয়া, লক্ষীছাড়া বামুনের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিবে না কি?"

পিতা। সে ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে। তার কন্যার বিবাহ হইয়াছে।

মাতা। কে বলিল?

পিতা। গণেশ।

মাতা। তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি! তুমি সেই মিথ্যাবাদী মূর্খটার কথায় বিশ্বাস করিলে!

পিতা। বিবাহ হয় নাই?

মাতা। তোমার মা কেন আসিয়াছে, তাকি বুঝিয়াছ?

পিতা। তুমি কি কিছু বুঝিয়াছ?

মাতা। তাইত বলিলাম, তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি! তোমার মা একা আসে নাই সেই বুড়াও তাহার স্ত্রী-কন্যাকে সঙ্গে আনিয়াছে।

পিতা। বল কি!

মাতা। গণেশ ছেলে চুরি করিতেই কাল চুপি চুপি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল। আমার বড় গুরুবল তাই পারে নাই।

পিতা। কে তোমাকে বলিল?

মাতা। কার্ত্তিক সমস্ত জানিয়া আসিয়াছে।

পিতা এইবারে ঠাকুরমা'র ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা ভাল করিয়া

বুঝিলেন। বুঝিয়া যেন নিশ্চিন্ত হইলেন। বলিলেন—"যাক—যে মা সন্তানের মাথা খাইতে কুণ্ঠিত নয়, সে মা পথে পড়িয়া মরিলেও আর আমার কোন দুঃখ নাই।"

উপর্য্যুপরি কতকগুলা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে আমার শক্তি যেন বিলুপ্ত হইয়াছিল। পিতা মাতার কথা শোনার অপেক্ষা না করিয়া আমি ঘরে গিয়া পিতার শয্যায় শুইয়া পড়িলাম।

সে দিন শনিবার। পরের পর সোমবার দিন স্কুলে আমাদের ত্রৈমাসিক পরীক্ষা। পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে না পারিলে, পিতার মনস্তুষ্টি হইবে না। এই জন্য, বাড়ীতে আমাকে পড়াইবার জন্য, পিতা আমাদের শ্রেণীর মাষ্টার মহাশয়কেই শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অন্য অন্য সময়ে, তিনি সন্ধ্যাকালেই আমাকে পড়াইতেন। পরীক্ষা অতি সন্নিকট বলিয়া তিনি দুই একদিন প্রাতঃকালেও পড়াইয়া যান। আমার শয়নের অল্পক্ষণ পরেই, তিনি বাহির হইতে আমাকে ডাকিলেন—'হরিহর'! মাতা ও পিতা উভয়েই সেই সময়ে ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। আমাকে তদবস্থ দেখিয়া মাষ্টার মহাশয়ের কথা শুনিবামাত্র, পিতা বলিলেন—"কি রে! পড়া না করিয়া, এখানে আসিয়া শুইয়া রহিয়াছিস্ যে?"

আমি বলিলাম—"শরীরটে আমার কেমন করিতেছে।"

"কি করিতেছে?"

"তাহা বলিতে পারি না।"

তিনি তৎক্ষণাৎ, শয্যাপার্শ্বে আসিয়া, আমার গাত্র পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা করিবার কারণ, তখন হুগলীতে সবে মাত্র ম্যালেরিয়া দেখা

দিয়াছে! সহরে তখনও তাহার প্রকোপ সম্যক্ না হইলেও, সহরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলে সে বৎসর সে যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছে। সহরেও দুই চারিজন মরিয়াছে। বিশ-পঞ্চাশজনের প্লীহাজনিত উদর স্ফীতিও ঘটিয়াছে। তবে শীতের সঙ্গে, রোগের প্রথম আক্রমণের কাল গিয়াছে। তথাপি, আমার শরীরের অসুস্থতার কথা শুনিয়াই, পিতা আমার শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করিতে আসিলেন।

মাতা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জ্বর নয় ত?"

পিতা বলিলেন—"না।"

"যাক্—বাঁচিলাম। যে ডাইন ডাইনীর নজর পড়িয়াছে,—তাহাতে ছেলেটা আমার বাঁচিলে বাঁচি।"

এই বলিয়াই, মা আমাকে শুইয়া থাকিতেই আদেশ করিলেন। পিতাকে বলিলেন—"যাক্, ওর এখন আর আর পড়িবার প্রয়োজন নাই। তুমি মাষ্টারকে বলিয়া আইস। একজামিন্ হইবার পর, ইস্কুলের ছুটিটা হইয়া গেলে, আমি দিন কয়েকের জন্য ওকে ওর মামার বাড়ী লইয়া যাইব।'

আহারাদির যথাসম্ভব বন্দোবস্ত করিতে মাকে আদেশ দিয়া, পিতা বাহিরে গেলেন। মা, আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া, পিতার মত হস্তদ্বারা গাত্রস্পর্শ করিলেন। পরীক্ষায় বুঝিলেন, আমার জ্বর নয়। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি অসুখ করিতেছে?"

"বুঝিতে পারিতেছি না।"

"গাধাটা তোকে কিছু কি বলিয়াছিল?" "কিছু না।'

"ডাইনীবুড়ী" আমাকে কিছু বলিয়াছে, কি না, মা তাও জিজ্ঞাসা

করিলেন। আমি উত্তর দিলাম না। বাস্তবিক আমার ভিতরটা কেমন করিতেছে।

কি করিতেছে বুঝিতে না পারিলেও, এটা যেন আমার মনে হইতেছে, যেন কেমন একটা দুর্ব্বোধ্য রোগ আমাকে আশ্রয় করিতেছে। মা পরীক্ষায় তাহা বুঝিতে পারিলেন না। আমিও বুঝাইতে পারিলাম না। মা গাত্র হইতে হস্ত তুলিয়া বলিলেন—"অসুখ বোধ করে, শুইয়া থাক্। আজ আর স্কুল যাইবার প্রয়োজন নাই।"

তিনি গৃহত্যাগ করিতেছেন, এমন সময়ে ঝি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। মা ও তাহার কথোপকথনে বুঝিলাম, মা গোপনে সন্ধান লইবার জন্য, এবং আমাদের সম্বন্ধে কি কি কথা হয় শুনিবার জন্য, তাহাকে পিতামহীর কাছে পাঠাইয়াছিলেন। তাহার কথায় বুঝিলাম, পিতামহী নৌকায় আরোহণ করিয়াছেন। এক গণেশ খুড়া ছাড়া, তাঁহার সঙ্গে আর যে কেহ ছিল, তাহা ঝি বলিল না। পিতামহীর হুগলী-ত্যাগের কথা বিদিত হইয়া, মা যেন আপনাকে বিপন্মুক্ত বোধ করিলেন।

মাতা গৃহত্যাগ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে ঝি পৈতা সূতায় বাঁধা একটা তামার মাদুলী মায়ের হাতে দিয়া বলিল—"মা! এইটা দাদাবাবুর হাতে পরাইয়া দিন।"

মাতা সবিস্ময়ে বলিলেন—"কি এ?

"দেখিতেই ত পাইতেছ মা!"

"এ মাদুলী কে দিল?" "এক ব্রাহ্মণ।" "কেন?"

"তা জানি না। ব্রাহ্মণ এই মাদুলী দাদাবাবুর হাতে পরাইতে বলিয়া দিল। বাঁধিয়া দিবে তুমি। অন্যে বাঁধিলে ফল হইবে না। দাদাবাবুর

যদি কোনও গ্রহের আপদ থাকে, আমার বোধ হয়, এই মাতুলী পরিলে আর তা আসিতে পারিবে না।"

"কে সে ব্রাহ্মণ, তুই জানিস্?"

"আপনারা ব্রাহ্মণ। মিথ্যা কথা কহিব কেন মা,—তিনি দাদাবাবুর শ্বশুর।"

"শ্বশুর" কথা শুনিবামাত্র, মাতা সহসা-প্রজ্বলিত দারুণ ক্রোধে ঝিকে কটু বাক্য প্রয়োগ করিলেন। দ্বিতীয়বার একথা মুখে উচ্চারিত হইলে, তাহাকে গৃহ হইতে দূর করিবার ভয় দেখাইলেন; এবং মাতুলীটা ঘরের জানালা দিয়া বাগানের দিকে নিক্ষেপ করিলেন।

ঝি বলিল—"দূর করিতে হবে কেন মা,—আমি নিজেই চলিয়া যাইতেছি।"

"এখন কোথায় যাইবি? আর একটা ঝি না পাইলে তোকে ছাড়িবে কে?"

"বেশ মা, আর একটা ঝিয়ের সন্ধান দেখ। তবে আমি বলিয়া রাখি, এ গৃহে আর আমি চাকরী করিব না।"

"কোন্ চুলায় এমন সুখের চাকরী পাইবি?"

"চুলা আমার মিলিয়াছে। জীবনের শেষে একমাত্র চুলাই যখন সকলের আশ্রয়, তখন আমি একটু আগেই তাকে অবলম্বন করিব।"

ঝিয়ের এ হেঁয়ালী কথা, আমরা কেহই বুঝিলাম না। মা, তাহাকে আর কিছু না বলিয়া, চলিয়া গেলেন। ঝিও নীরবে মায়ের অনুসরণ করিল। আমার সঙ্গেও একটা কথা কহিল না।

সেই দিনের সন্ধ্যায়—কোথাও কিছু নাই—হঠাৎ আমার জ্বর আসিল।

(২৫)

প্রাতঃকালের ঘটনায় সমস্ত দিনটাই আমাদের একরূপ গোলমালে কাটিয়াছিল। গণেশ-খুড়ার প্রহারে কার্ত্তিকও কিছু হতভম্ব হইয়াছিল। সেইজন্য যে রাঁধুনি বামুনকে তাহার আনিবার কথা ছিল, তাহাকে সে আনিতে পারে নাই। অগত্যা মাকে নিজেই আজ পিতার জন্য অন্ন-প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

কাজের ব্যস্ততায় দিবসে মা আমার দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর পান নাই। অপরাহ্ণে আমার চক্ষু ছলছল করিতেছে দেখিয়া তিনি আমার গাত্র পরীক্ষা করিলেন। বুঝিলেন, আমার জ্বর হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে মাষ্টার মহাশয় আসিলেন। মাতৃ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনিও আমার নাড়ী-পরীক্ষা করিলেন। তিনিও বুঝিলেন জ্বর। তবে জ্বর অতি সামান্য। গাত্র ঈষদুষ্ণ। নাড়ী সামান্য চঞ্চল। আমার আর পড়া হইল না। পরীক্ষার মুখে পাঠের ব্যাঘাত হইল বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় আশ্বাস দিলেন, সামান্য সাবধানতায় পর দিবসেই আমি সুস্থ হইব।

সন্ধ্যার সময় পিতা কাছারী হইতে ফিরিতে না ফিরিতেই আমার জ্বরের সংবাদ পাইলেন। বস্ত্রপরিবর্ত্তনাদি করিয়া তিনিও একবার জ্বরের পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষায় বুঝিলেন, জ্বর অতি সামান্য—শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ হইতে এক ডিগ্রী বেশী। মাকে বুঝাইলেন—উত্তেজনাই ইহার কারণ। রাত্রিতে উপবাস দিলে, এবং একটু নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারিলেই পরদিন আর ইহা থাকিবে না।

মা এ আশ্বাসে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তিনি পিতাকে বলিলেন—"ডাক্তারকে ডাকিয়া দেখাও।"

মায়ের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া পিতা ডাক্তার-বাবুকে পত্র পাঠাইলেন। পত্রে তাঁহার আসিবার অনুরোধ না থাকিলেও ডাক্তারবাবু আমাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি হাঁসপাতালের ডাক্তার। সহরে তাঁহার বহুদর্শিতার ও চিকিৎসার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। তিনিও পরীক্ষায় বুঝিলেন, জ্বর অতি সামান্য। পিতার মুখে প্রাতঃকালের ঘটনা তিনি কতকটা অবগত হইলেন।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া, একমাত্র উত্তেজনাই আমার অসুখের কারণ স্থির করিয়া, তিনি ঔষধ পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিলেন না।

এক, দুই, তিন দিন—সেই সামান্য জ্বরের বিচ্ছেদ হইল না। পিতা চিন্তিত হইলেন। মাতা ব্যাকুল হইলেন। ডাক্তার বাবু এ দুই দিনও আসিয়াছেন। বিরাম না হইলেও জ্বর কিছু নয় বলিয়া তিনি জনক ও জননীকে আশ্বাস দিয়াছেন। জনক আশ্বস্ত হইয়াছিলেন কি না মনে নাই। জননী আশ্বস্তা হইলেন না। আমার পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

এ তিন দিনের মধ্যে বাড়ীর অপরাপর অবস্থা পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক হইয়াছে। রাঁধুনী আসিয়াছে। সে ব্যক্তি দুই দিনেই কার্য্যতৎপরতা ও রন্ধনকুশলতা দেখাইয়া মাকে তুষ্ট করিয়াছে। পাঁচু ও কার্ত্তিক যেমন কাজ করে, তেমনই করিতেছে। কেবল ঝি নাই। আমাদের নিকট হইতে প্রাপ্য বেতনাদির অধিকার পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া, রবিবার প্রাতঃকালেই সে চলিয়া গিয়াছে। বিকালে ঝিয়ের পরিবর্ত্তে অপর এক ঝি আসিয়াছে। আমি তাহাকে দেখিয়া তুষ্ট হই নাই।

ঝি আমাকে ভালবাসিত। চাকরীর জন্য প্রভু-পুত্রকে ভালবাসিতে হয় বলিয়া বাসিত না। কি জানি কেন, আমার প্রতি তাহার আন্তরিক একটা টান ছিল। আমাদের হুগলীতে আসার পূর্ব্বেই পিতৃ-কর্তৃক সে নিযুক্ত হইয়াছিল। সেই অবধি সে আমাদের কাছে ছিল। আমার জননীর তৎপ্রতি সময়ে সময়ে প্রযুক্ত অতি কঠোর বাক্য সহিয়াও সে আমারই জন্য গৃহ ত্যাগ করে নাই। সেই ঝি চলিয়া গেল। যাইবার সময় আমার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করিল না।

এই তিন দিবস জ্বরের জন্য যে একটা বিশেষ কষ্ট, তা আমি অনুভব করি নাই। কষ্টের মধ্যে এক কষ্ট—উপবাস। ডাক্তারবাবুর আদেশমত দুই দিন আমি ভাত খাইতে পাই নাই। দ্বিতীয় কষ্ট—ঝির অদর্শন। সে রাত্রিতে আমার ঘরে শয়ন করিত। তাহার কাজ সারিয়া আমার গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বে যদি না আমি ঘুমাইয়া পড়িতাম, তাহা হইলে সে আমাকে কত গল্প শুনাইত। ভূতের গল্প, পরীর গল্প, বিহঙ্গমা-বিহঙ্গমীর গল্প—নানা সামাজিক কথা—কত ইতিহাস এই সংবৎসরের মধ্যে সে আমাকে শুনাইয়া গিয়াছে। তন্তুবায়দিগের পূর্ব্ব-সৌভাগ্যের অবস্থা, দোলদুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকলাপ, পরে বিলাতী বস্ত্রের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে আকস্মিক দারিদ্র্য—দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য-দিগের ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারীতে অকালমৃত্যু এবং কালে তাহাদের ইন্দ্রভবনতুল্য অট্টালিকাদির ধ্বংস—এই সকল শোকোদ্দীপক ইতিহাসও সে আমাকে শুনাইতে বিরত হয় নাই। সেই ইতি-কথা হইতে বুঝিয়াছিলাম, একটি ধনাঢ্য বণিকের পৌত্রবধূ সর্ব্বস্বহারা ও অকালে স্বামীহারা হইয়া, অবশেষে একটি বন্য পল্লীর কুটীর হইতে একমাত্র

শিশুপুত্রকে শৃগালের মুখে সমর্পণ করিয়া, পেটের দায়ে আমাদের ঘরে দাসীবৃত্তি করিতে আসিয়াছে। এই এক বৎসরের সাহচর্য্যে আমি ঝিয়ের পরম প্রিয় হইয়াছিলাম। ঝিয়ের সঙ্গও আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। ঝিয়ের অভাবটা আমি যেন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম।

যাক্ সে কথা। ডাক্তারবাবু প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, চতুর্থ দিবসে জ্বরের বিরাম হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। তারপর পঞ্চম—ষষ্ঠ—সপ্তম—জ্বর গেল না। এইবারে ডাক্তার বাবুও চিন্তিত হইলেন। জ্বর কিন্তু সেই সামান্য। নিরেনব্বুই হইতে একশোর মধ্যে। তিনি বক্ষঃ, পৃষ্ঠ, উদর সমস্তই সযত্নে পরীক্ষা করিলেন। ফুসফুস্-যকৃতাদি কোনও যন্ত্রের তিনি দোষ দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং এই একজ্বরের কারণ-নির্ণয়ে তিনি অক্ষম হইলেন। তখন স্থির হইল, পর দিন সাহেব ডাক্তারকে আনাইয়া ডাক্তারবাবুকে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে হইবে।

ডাক্তারবাবু আমাকে শয্যাত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। নিষেধ সত্ত্বেও ঘরে কেহ না থাকিলে, আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া ঘরের ইতস্ততঃ বিচরণ করি। সপ্তম দিবসের অপরাহ্নে বিছানা ছাড়িয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দেখি, মা বাগানের ভিতর কি যেন একটা সামগ্রীর অন্বেষণ করিতেছেন। অন্বেষণে মা তন্ময়—কোনও দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। এ গাছের তলা হইতে ও গাছের তলা—কখন উদ্যানপার্শ্বস্থ পথে, কখন পরস্পরনিবদ্ধ গুল্মকুঞ্জে—কখন দাঁড়াইয়া, কখন বসিয়া, কখন বা অর্দ্ধাবনমিত দেহে তীব্রদৃষ্টিতে ভূপৃষ্ঠ যেন বিদীর্ণ করিয়া, মা কোন হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। প্রথমে

মায়ের এ অন্বেষণের মর্ম্ম আমি বুঝিতে পারিলাম না। অল্পক্ষণের পরেই সেইস্থানে মায়ের মাদুলী-নিক্ষেপের কথাটা আমার মনে হইল। স্মরণের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বুকটা কেমন যেন করিয়া উঠিল। এই সাত দিনের মধ্যে প্রথমতঃ আমি স্পষ্টতঃ দুর্ব্বলতা অনুভব করিলাম। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। পাছে মেজের উপর পড়িয়া যাই, এইজন্য তাড়াতাড়ি ফিরিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

শয়নের সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল। যেন একটা মোহ —বেশ মিষ্ট মোহ—আবেশকর! চক্ষু মেলিতে ইচ্ছা হইতেছে না! অথচ নিদ্রাতন্দ্রা কিছু নয়। মুদ্রিত পলকের ভিতরে আমি চাহিয়া আছি। আমার চোখের উপর দিয়া লাল, নীল, পীত প্রভৃতি বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট এক মনোহর চন্দ্রাতপ যেন আকাশপথে ভাসিয়া যাইতেছে! সে চন্দ্রাতপের যেন অন্ত নাই! তাহার বর্ণ-বৈচিত্র্যেরও ইয়ত্তা নাই।

পিতার শয়ন-কক্ষের পার্শ্বেই আমার ঘর। মধ্যে একটি বড় দরজা। পিতার ঘরের দিক হইতেই তাহাকে খোলা ও বন্ধ করা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আগে রাত্রিতে ঝি এই ঘরে আমাকে আগুলিয়া থাকিত। এই দুই দিন মা অবস্থান করিতেছেন।

আমার শয়নের বহুক্ষণ পরে মা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি বুঝিলাম, কিন্তু চক্ষু মেলিতে পারিলাম না। আমাকে ডাকিলেন—আমি উত্তর দিতে পারিলাম না। চক্ষু মুদিয়া মায়ের ক্রিয়াকলাপ আমি সমস্তই বুঝিতে পারিতেছি। মা শয্যা-পার্শ্বে আসিলেন। আমার বক্ষ ও মস্তকে করস্পর্শ করিলেন। তার পর পার্শ্বের গৃহে চলিয়া গেলেন। আমি ঘুমাইতেছি মনে করিয়া, আমাকে আর ডাকিলেন না।

ইহার পরেই পিতা কাছারী হইতে আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাছারীর কাগজপত্রাদিপূর্ণ-বাক্স-মাথায় কার্ত্তিক আসিল। পিতা প্রথমে তাঁহারই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই মাতাকে আমার স্বাস্থ্যসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন।

মাতা উত্তর করিলেন—"পোষাক ছাড়িয়া আগে একটু বিশ্রাম লও। তার পর নিজে দেখ। আমার মনে হইতেছে, হরিহরের আজ জ্বরের বিরাম হইতেছে। তাহার বুকে কপালে ঘাম; সে সুস্থ হইয়া ঘুমাইতেছে। তবে তুমি একবার না দেখিলে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না।"

পিতা আর বস্ত্র পরিবর্ত্তনের অপেক্ষা করিলেন না। আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়াই মায়েরই মত আমার বুকে ও কপালে হাত দিলেন। আমাকে একবার ডাকিলেন। আমি চোখ বুজিয়াই উত্তর দিলাম। জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কেমন আছি। ভাল আছি শুনিয়াই তিনি কার্ত্তিককে বলিলেন—"এখনি ডাক্তার বাবুকে খবর দে। বলে আয়, এখনি তাঁহাকে আসিতে হইবে।" কার্ত্তিক তাড়াতাড়ি বাক্স রাখিয়া ডাক্তারকে খবর দিতে ছুটিল। মাতা সন্ত্রস্তার মত জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি দেখিলে?

"খোকার জ্বর বিচ্ছেদ হইতেছে।"

"বাঁচলুম! তুমি যে ভাবে কার্ত্তিককে হুকুম করিলে, শুনিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছে।"

"জ্বরের বিরাম অবস্থা বুঝিলে ডাক্তারবাবু তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সংবাদ দিতে বলিয়াছিলেন।"

"তা হলে তোমাকে বলি—"

এই বলিয়া মাতা মাদুলী সম্বন্ধে সমস্ত কথা পিতাকে শুনাইলেন

আমি সেইরূপই চোখ বুজিয়া শুইয়া আছি। আমি শুনিতেছি ও দেখিতেছি। আমার চোখের উপর দিয়া ছবির পর ছবি ভাসিয়া যাইতেছে। আমি সে দৃশ্যের লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

মায়ের কথা শুনিয়া পিতা একটু মৃদুহাস্য করিলেন। হাসিতে হাসিতেই বলিলেন—"তুমি বেশ করিয়াছ। তুমি যে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার সৎসাহস দেখাইয়াছ, তাহাতে আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। বাড়ী হইতে আসিবার সময় শালতীতে উঠিবার মুখে বামুন আমার হাতে কতকগুলা ফুল দিয়াছিল। আমি তখনই সেগুলো জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম।"

মা বলিলেন—"সে বামুন দেখিয়াছিল ?"

পিতা বলিলেন—"না, মর্য্যাদার হানি হইবে বলিয়া আমি তাহাকে দেখাইয়া নিক্ষেপ করি নাই। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, করা উচিত ছিল। বামুনপণ্ডিতগুলার দেখিতেছি কিছুমাত্র বুদ্ধি নাই, মর্যাদা-বোধও নাই। এসমস্ত তাহারই কাণ্ড। গণ্ডমূর্খ গণেশ ও সেই বোকা বুড়ীকে ওই বামুনই সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। আনিয়া গণেশ আর বুড়ীকে সম্মুখে রাখিয়া, শিখণ্ডীর মত অন্তরাল হইতে সে আমাদের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছে।"

"মায়ের যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে! ছেলে একটা হাকিম! রাজা-জমীদার পর্য্যন্ত যাঁর কাছে মাথা নোয়ায়, সাহেব দেখিলে সেলাম করে, তার মা হ'য়ে বাগ্‌দিনীর মত হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় পরিয়া এখানে কেমন করিয়া আসিল ?"

"তার কথা আর তুলিয়ো না। অমন মায়ের বাঁচিবার আর প্রয়োজন নাই। হুগলী সহরে অনেকেই সেদিনের দুর্ঘটনার কথা জানিয়াছে।

হাকিমের দেউড়ী বলিয়া জনরব আমার বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই। নহিলে লোকলজ্জায় অস্থির হইয়া আজই আমাকে সহর ত্যাগ করিতে হইত।"

"হরিহর সারিয়া উঠুক। গর্ম্মির ছুটি পড়িলেই আমি কিছুদিনের জন্য উহাকে ওর মামার বাড়ী লইয়া যাইব। যত নষ্টের মূল সেই বামুন। সে কাণ্ডজ্ঞানহীন। আবার হয়ত আসিয়া কি বিভ্রাট বাধাইয়া বসিবে।"

"হরিহরকে আর লইয়া যাইতে হইবে না। আমি আর একটা গ্রেডে উঠিলাম। এবারে আমি মহকুমার মেজেষ্টারী করিতে পাইব। কোথায় যাইব, এখনও ঠিক হয় নাই। যেখানেই হ'ক, গ্রামের কাউকে আর সে খবর দিব না।"

ইহার পরেই বুঝিলাম, পিতা নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে, আমার কপালে একবার মাত্র অতি সন্তর্পণে করস্পর্শ করিয়াই মাতা তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

ঘর নিশীথের জনশূন্য প্রান্তরবৎ নিস্তব্ধ। আমি সে মধুর নিস্তব্ধতা এখন পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতেছি। আমার চক্ষুর উপর দিয়া পূর্ব্ববৎ সেই বিচিত্র বর্ণমালা ভাসিয়া যাইতেছে। মনে হইতেছে, যেন অসংখ্য বর্ণাভিমানী দেবশিশু আমার অপাঙ্গপার্শ্বে আমার দৃষ্টিসীমান্তে অবস্থিত এক নীলবর্ণ নদী-স্রোতে অবগাহন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিতেছে।

আমিও যেন তাহাদের একজন সঙ্গী। আমিও যেন সেই নদী-স্রোতে গা ভাসাইবার জন্য তাহাদিগেরই মত ব্যাকুলভাবে, তাহাদিগের অনুসরণ করিতেছি।

কিন্তু পা আমার চলিতেছে না। দেবশিশুগণ প্রতি পদক্ষেপে যেন

দূর হইতে আরও দূরে চলিয়া যাইতেছে। ক্রমে আমি সঙ্গিহীন হইয়া পড়িলাম। সেই সুবিস্তীর্ণ নীল প্রান্তরপথ দেখিতে দেখিতে জীবশূন্য হইল। আমার উল্লাস ভয়ে পরিণত হইল। আমি সঙ্গী খুঁজিবার জন্য চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম।

সেই অবস্থাতে আমার যেন অন্তশ্চক্ষুও মুদ্রিত হইয়া আসিল। আমি প্রাণপণে চোখ মেলিবার চেষ্টা করিলাম। পলক মুক্ত হইল না। তাহার উপরে কে যেন একটা বিশ মণ ওজনের পাথর চাপাইয়া দিয়াছে। আমার সম্মুখে আর কিছুই আমি দেখিতে পাইলাম না।

তৎপরিবর্ত্তে শুনিতে পাইলাম। শুনিতে পাইলাম, নীল প্রান্তরের নিস্তরঙ্গ বায়ুসাগরপারে কে যেন করুণ কণ্ঠে রোদন করিতেছে।

আমি উৎকর্ণ হইয়া রোদনের মর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। বুঝিতে পারিলাম না। স্বর পিতামহীর। আমার শ্রবণের আকুল আগ্রহে কর্ণরন্ধ্র লক্ষ্যে ছুটিয়া আসিতে ভাগীরথীর কুলকুল ধ্বনির ন্যায় এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতধারায় বাধা পাইয়া আবার সে সাগরপারে ফিরিয়া চলিল। কেবল তিনটি মাত্র কথা—ভাগীরথীর উজানবাহী বাণমুখে চরে প্রতি-হত তরঙ্গের ন্যায় তিনটি মাত্র উচ্ছ্বাস—আমার হৃদয়তটে আঘাত করিল।

"হরিহর, হরিহর, হরিহর।"

কে যেন আমাকে বুঝাইয়া দিল—"তোমার ক'নে গুরূপদিষ্টা হইয়া তোমার নাম জপ করিতেছে।"

আবেগে বোধ হয়, চক্ষুর পলকবদ্ধ অবস্থাতেই আমি শয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিলাম। উঠিতে পড়িয়া গিয়াছি। তারপর মৃদু-কর-স্পর্শ-

স্মৃতি। শুনিয়াছি, মাতা পতন শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। আমার আর কিছু মনে নাই।

ক্রমাগত সাতদিন আমি সংজ্ঞাহীন ছিলাম। শুনিয়াছি এই সাতদিন ডাক্তার সাহেব ও ডাক্তার বাবু উভয়ে প্রাণপণে আমার সংজ্ঞা ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। তাঁহাদের মতে আমি সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়াছি।

সপ্তম দিবসের রাত্রিশেষে আমার সংজ্ঞা ফিরিল। চোখ মেলিয়া দেখি আমার মুখের উপরে চোক রাখিয়া মাথার শিয়রে মা বসিয়া আছেন। উষ্ণ অশ্রুতে আমার কপোল সিক্ত হইতেছে।

তখন নেশা কাটিয়াছে, কিন্তু সেই স্বপ্নের ছবি মাথা হইতে একেবারে দূর হইয়া যায় নাই। চোখ মেলিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হইল, আমি যেন কোন্ দেশ হইতে কোন্ দেশে চলিয়া আসিয়াছি।

আমি ডাকিলাম—"মা!"

আমার সংজ্ঞার পুনরাবর্ত্তন মা লক্ষ্য করেন নাই। আমি 'মা' বলিতেই তিনি ব্যাকুলতার সহিত বলিয়া উঠিলেন "গোপাল! গোপাল! আমার নীলমণি!"

তাঁহার ব্যাকুলতায় উচ্চারিত কথা বুঝি পিতার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ছুটিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মাতা তাঁহাকে কথা কহিতে নিষেধ করিলেন। চাবির তোড়া অঞ্চল মুক্ত করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন; এবং বলিলেন—"শীঘ্র 'ষোল আনা' হরিহরের মাথায় ঠেকাইয়া দক্ষিণরায়ের নামে তুলিয়া রাখ।"

এই সময় কি জানি কেন, দক্ষিণ বাহুতে আমার হাত পড়িল। আমি বুঝিলাম, বাহুমূলে একটী মাতুলী বাঁধা রহিয়াছে।

মাতুলী-স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে আমার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এটা কি মা?"

মা উত্তর করিলেন—"মাতুলী।"

"আমি সেই বিষম দুর্ব্বল অবস্থাতেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম,- "কেন মা, তোমরা আমাকে বাঁচাইলে?"

মাতা কোনও উত্তর দিলেন না। পিতা বলিয়া উঠিলেন—"হরিহর! তোমার ঠাকুরমার কাছে তোমাকে পাঠাইয়া দিব। আর—আর—"

এইবারে মা বলিলেন—"তোমার ক'নের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিব।"

(২৬)

আমি হয়ত অমনি অমনিই আরোগ্য লাভ করিতাম। কিন্তু মাঝখানে একটা মাতুলী পড়িয়া গণ্ডগোল বাধাইল। সন্ন্যাস রোগে মৃত্যুই স্থির বুঝিয়া ডাক্তারেরা পিতা মাতাকে একরূপ প্রবোধ দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। এ কয়দিবস উদরে দুগ্ধ প্রবেশ করিতেছিল বলিয়া আমি জীবিত ছিলাম। শেষ দিবসে একবিন্দু জল পর্য্যন্ত গলাধঃকৃত হয় নাই। রাত্রি নয়টার সময় ডাক্তারেরা চলিয়া যাইবার পর হতাশ হইয়া পিতা শয্যার আশ্রয় লইয়াছিলেন। একমাত্র পুত্রের মৃত্যু দেখিতে তাঁহার হৃদয়-বলে কুলায় নাই। মা কিন্তু ধৈর্য্য হারাণ নাই। এইখানেই মায়ের মাতৃত্ব। স্বস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মা যদি একবার নিজমূর্ত্তি ধরেন, তখন সন্তানের কল্যাণে মঙ্গলময়ী সম্মুখস্থ বিশাল শৈলবাধাকেও উপেক্ষার চক্ষে

দেখিয়া থাকেন। তিনি সারারাত্রি লণ্ঠন হাতে সেই আম কাঁঠালের জঙ্গলে মাদুলীর অন্বেষণ করিয়াছেন। অন্বেষণকালে দক্ষিণরায়ের সম্মুখে তাঁহার পূর্ব্ব ধৃষ্টতার আচরণ স্মরণে আসিয়াছে। তিনি কাতরকণ্ঠে "ষোল আনা" পূজা মানত করিয়া সেই বন্য ঠাকুরের কাছে মাদুলী ভিক্ষা করিয়াছেন। রাত্রির শেষ যামে দক্ষিণরায় কৃপা করিয়াছেন—মায়ের চেষ্টা সফল হইয়াছে। মাদুলী-প্রাপ্তিমাত্র তিনি আমার দক্ষিণ বাহুমূলে বাঁধিয়া দিয়াছেন। বাঁধিবার অব্যবহিত পর মুহূর্ত্তেই আমি চোখ মেলিয়াছি।

এই এক কাকতালীয় ন্যায়ের ফাঁকিতে পিতামাতার দম্ভ চূর্ণ হইয়া গেল। আমার আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে নানাবিধ কারণ নির্ণয়ের অধিকার থাকিলেও তাঁহারা আমার হাত হইতে আর মাদুলী খুলিতে সাহসী হইলেন না। শুধু তাই নয়, উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেই তাঁহারা আমাকে দেশে লইয়া যাইবেন, ঠাকুরমার কাছে ক্ষমা চাহিবেন ও সার্ব্বভৌম-কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিবেন।

শুধু যে আমার অসুখই পিতামাতার মতি পরিবর্ত্তনের কারণ—ইহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। আমার মনে হয় গোবিন্দ-ঠাকুরদার মন্তব্যও এ পরিবর্ত্তনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

গণেশ-খুড়া পিতাকে দিবার জন্য যে চিঠি আনিয়াছিল, রোগমুক্তির তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দিবসে ভাগ্যক্রমে সেই চিঠি আমার চোখে পড়িয়াছিল। চিঠি ঠাকুরদা লিখিয়াছেন—অথবা লিখাইয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এইরূপ :— পিতা আমার পণ্ডিত বটে কিন্তু হিসাবনিকাশ সম্বন্ধে একেবারেই মূর্খ। ঠাকুরদার কাছে আমার পিতামহের গচ্ছিত এখনও অনেক টাকা আছে।

পিতা ও মাতা তাঁহার সততায় সন্দেহ করিয়াছিলেন বলিয়া এবং আমার ঠাকুরমার সে দিবসের কথায় তাঁহার নিজের মনে একটা বিশেষ রকমের সন্দেহ জাগিয়াছিল বলিয়া তিনি পিতার ন্যায্য প্রাপ্য সমস্ত টাকা পিতাকে দেন নাই। কিছু টাকা আমার পিতামহীর ব্যবহারের জন্য রাখিয়াছিলেন। সে টাকা পিতামহী স্পর্শ করেন নাই, পিতাকে দিতেই অনুরোধ করিয়াছেন। পিতামহের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের সময় ঠাকুরদা পিতার দেশে প্রত্যাগমন প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার শরীর ভগ্ন হইতেছে। পিতার মত শিক্ষিতের মনের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার ভয় হইয়াছে। যে কাল আসিতেছে, তাহাতে তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্রেরা যে, আমার পিতাকে ডাকিয়া টাকা অথবা দলীল পত্রাদি দিবে, ইহা তাঁহার বিশ্বাস হয় না। সেইজন্য তিনি পিতাকে সত্বর দেশে ফিরিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

পিতা এ পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু আমার জ্ঞান ফিরিবার পর কয়দিন পিতা ও মাতার মনোভাবের একটা আকস্মিক পরিবর্তন আমি যেন লক্ষ্য করিতেছি। আমার মনে হইতেছে, তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরে যেন একটু মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। যাক্, ইতিমধ্যে পিতা ও মাতা উভয়েই দেশে যাইতে উৎসুক হইয়াছেন।

সপ্তাহ পরে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি। পিতাও ছুটীর আবেদন করিয়াছেন। ছুটীর মঞ্জুর হইয়াছে। তৃতীয় দিবসের রবিবারে আমরা হুগলী পরিত্যাগ করিব।

সেই দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পিতা সবে মাত্র কাছারী হইতে আসিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার একখানি পত্র আসিল। ভাগ্যক্রমে

তাহারও মর্ম্ম আমি জানিতে পারিয়াছিলাম। সে পত্র লিখিয়াছেন বৈকুণ্ঠ পণ্ডিতমহাশয়। এ পত্রের মর্ম্ম বড়ই বিচিত্র। তিনি লিখিয়াছেন, কন্থার কন্থাকাল উত্তীর্ণ হয় দেখিয়া, আর পিতা বাল্যে কিছুতেই আমার বিবাহ দিবেন না বুঝিয়া, পাগল বামুন এক শালগ্রাম শিলার সঙ্গে কন্থার বিবাহ দিয়াছে। শুধু তাই নয়, দেশের লোকও এমনি পাগল, সেই বিবাহোৎসবে যোগ দিয়াছে। পণ্ডিতমহাশয়ও কৌতূহল পরবশ হইয়া সেই পাগলামী দেখিতে গিয়াছিলেন। কতকগুলি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। স্ত্রীলোককে নারায়ণ-শিলা স্পর্শ করিতে নাই বলিয়া দুই একজন পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় তাঁহাদের বুঝাইয়াছেন, তাঁহার কন্থা নারায়ণ-বরা—হইবে চিরব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারিণী। তাহার শালগ্রাম স্পর্শে দোষ নাই। কন্থার কুশণ্ডিকা হইবার পরেই দশমবর্ষীয়া বালিকাকে সব পাগলগুলা লক্ষ্মীজ্ঞানে প্রণাম করিয়াছিল। পণ্ডিতমহাশয় প্রণাম করিয়াছিলেন কিনা লেখেন নাই। তবে আরও এইরূপ পাগলামীর কথা তিনি লিখিয়াছেন। বালিকার কুশণ্ডিকা কার্য্য শেষ হইবার পর আমার মাতামহী তাহাকে আমাদের গৃহে আনাইয়াছিলেন এবং আমার পিতামহের সত্য অনুসারে তাহাকে আমাদের কুলভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। তাহাতেও একটা বিরাট সমারোহ ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। দেশের জমীদার হইতে দরিদ্র কৃষক পর্য্যন্ত সে বিরাটভোজে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। সেই সমারোহের প্রধান পাণ্ডা গোবিন্দ-ঠাকুরদা। গ্রামস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ বালিকার স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিয়াছেন।

পত্রের মর্ম্ম আমি পরে জানিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু পত্রের ক্রিয়া তার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই আমি অনুভব করিয়াছিলাম। এইদিনে

সর্ব্বপ্রথম পিতা ঈষৎ কঠোর ভাষায় মাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া পিতা ও মাতার তর্ক চলিতেছিল। আমি পার্শ্বের ঘর হইতে শুনিতেছিলাম। শুনিতেছিলাম কেন, শুনিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। এমন সময়ে বাহিরে কুকুর দুইটা সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। পিতা হুগলী ছাড়িবেন, এইজন্য কাছারীর উকীল-আমলার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবার সম্ভাবনা।

আর একদিন ঠিক এমনি সময়ে কুকুরের চীৎকার হইতে নানা অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছে বলিয়া, পিতা সন্ত্রস্তভাবে নিজেই বাহিরে ছুটিয়া গেলেন। আমি পিতার অনুসরণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম; মাতা এই সময়ে ঘরে ঢুকিয়া যাইতে দিলেন না —হাতে ধরিয়া বসাইলেন।

পিতা প্রস্থান করিলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁরে, আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবি ?"

আমি এ প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম —"তুমি কোথায় যাইবে ?" দেখিলাম তাঁহার চোক ছল ছল করিতেছে।

"কোথায় কোন চুলায় যাইব, তা কেমন করিয়া বলিব ? তোদের ঘরে আর আমার স্থান হইবে না।"

"বাবা কি তোমায় কিছু বলিয়াছেন ?"

"পাকে প্রকারে বলিয়াছেন বই কি। আমিই তোদের ঘর ভাঙ্গিয়া দিয়াছি। আমার জন্য বাবুর, দেশে—শুধু দেশে কেন লোক সমাজে, মুখ দেখান ভার হইয়া উঠিয়াছে। তিনি চাকুরী ছাড়িয়া দিবেন। শুধু তাই নয়, বিবাগী হইবেন। আমার অপরাধে তিনি বিবাগী হইবেন কেন! তুই আমাক ছাড়িয়া থাকিতে, পারিবি ?"

"কেন তোমাকে ছাড়িব ?"

"ছাড়িতেই হইবে। আমি থাকিতে তোদের ঘরে আর মঙ্গল হইবে না।"

"কোন্ পাষণ্ড একথা বলে ?"—আমরা চমকিতের মত দ্বারের দিকে চাহিলাম। দেখি, গোবিন্দ-ঠাকুরদা ধীরে ধীরে ঘরের দিকে প্রবেশ করিতেছেন। সঙ্গে গণেশ-খুড়া, তাহার পশ্চাতে পিতা। পিতার পশ্চাতে আমাদের পুরাতন ভৃত্য সদানন্দ। তাহার এক হাতে একটি ক্যাম্বিশের বড় ব্যাগ। বোধ হয়, তাহার ভিতরে ঠাকুরদা'র বস্ত্রাদি, অন্য হস্তে হুঁকা, তাহার পশ্চাতে পাঁচু। কার্ত্তিক বোধ হয়, ইহাদের অনুসরণে ঘরে প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই।

মাতা তাঁহাকে দেখিয়াই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া বৃদ্ধকে প্রণাম করিলেন। আমিও প্রণাম করিলাম।

বৃদ্ধের সেই সহাস্যবদন। বিশেষতঃ আমাদিগকে দেখিয়া, তাঁহার আনন্দ আজ যেন বার্দ্ধক্যের নিগড় ভাঙ্গিয়া, দন্তহীন মুখের ওষ্ঠাধরে শৈশবের মাধুর্য্য ঢালিয়া দিতে বসিয়াছে।

ঠাকুরদা—মা ও আমার মস্তকে করস্পর্শে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং মাকে বলিতে লাগিলেন, "কোন্ পাষণ্ড বলে তুমি থাকিতে দাদার ঘরে মঙ্গল হইবে না ? তুমি লক্ষ্মীরূপে দাদার গৃহে আসিয়াছিলে। মা ! আমি সাক্ষী—গ্রাম সাক্ষী। তবে আমি প্রধান সাক্ষী। দাদা কবে কি উপার্জ্জন করিয়াছেন, সমস্তই আমার খাতায় জমা আছে। অবশ্য বৌ-ঠাকুরাণীও লক্ষ্মী। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই দাদার

উন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু তুমি তাঁর চারগুণ লক্ষ্মী। তোমার আগমনের পর হইতে দাদা ঘরে ভারে ভারে টাকা আনিয়াছে। সব লেখা আছে। সে টাকায় জমি কিনিয়া, ধার দিয়া, যা করিয়াছি, সব লেখা আছে। দেশে চল মা, সমস্তই তোমাদের বুঝাইয়া দিব। আমার কাছে তোমাদের দশহাজারের বেশি টাকা আছে, একথা বলিতে ভরসা কর নাই। আমি শুনিয়া হাসিয়াছিলাম। তার চেয়ে ঢের বেশি, মা, ঢের বেশি। সব লেখা আছে।"

মা আর পূর্ব্বের মত বৃথা লজ্জায় নিরুত্তর রহিলেন না। তিনি উত্তর করিলেন—"টাকা আর চাই না। আপনার যে আশীর্ব্বাদ পাইয়াছি, তাই যথেষ্ট। মা আমার উপর রাগ করিয়া হুগলীতে আসিয়াও এঘরে প্রবেশ করেন নাই।" "সেটা মা, তাঁর বড়ই নির্ব্বুদ্ধিতা হইয়াছে।"

"কাকা-ম'শায় আপনি আমার কলঙ্ক মোচন করুন। নহিলে বাঁচিতে আমার আর ইচ্ছা নাই।" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মা ঠাকুরদার চরণযুগল ধারণ করিলেন।

গোবিন্দ-ঠাকুরদা মাকে আশ্বাস দিলেন। শুধু মাকে কেন, মাতৃদত্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া, আমাদের সকলকেই আশ্বাস দিলেন। আর আমরা সাহেব হইয়াছি বলিয়া, গণেশ-খুড়া তাঁহার কাছে যে মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছিল, তাহার জন্য মূর্খত্বের নানাজাতীয় বিশেষণে তাহার শ্রবণমূল চরিতার্থ করিয়া দিলেন।

গণেশখুড়া কোনও উত্তর না করিয়া, মেজের উপরে বসিয়া, ঠাকুরদার জন্য তামাকু সাজিতে আরম্ভ করিল। পাঁচু পিতার

আদেশে সদানন্দকে নিজের বসিবার স্থানে লইয়া গেল। সত্য কথা বলিতে কি, গোবিন্দ-ঠাকুরদার আগমনে বহুকাল পরে আমাদের হুগলীর বাসায় সেই পূর্ব্বযুগের আনন্দ ফিরিয়া আসিয়াছে।

এমন মহদাশয় ব্রাহ্মণ,—আমাদের ঘরে সাহেবিয়ানার নানা চিহ্ন বিদ্যমান থাকিতেও তিনি যেন সে সমস্ত দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না।

একবার কেবল কথায় কথায় গণেশ-খুড়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন —"শিরোমণির ছেলে কি ম্লেচ্ছ হ'তে পারে রে! ও যে হাকিম— দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—তাই ওকে সাহেবের পোষাক পরিয়া থাকিতে হয়। ওর ওই পোষাক তুলিয়া দেখ—দেখবি উহার ভিতরে গৌতমের সুবর্ণকান্তি ঝক্ ঝক্ করিতেছে।"

সে রাত্রিতে ঠাকুরদা-কর্তৃক মাতাই রন্ধনাদির ভার প্রাপ্ত হইলেন। বহুকাল পরে "মাতা অন্নপূর্ণা"র কল্যাণে গোবিন্দ-ঠাকুরদার আমাদের সম্মুখে ভূরিভোজন হইল।

পরবর্ত্তি রবিবারে রাত্রির প্রথম প্রহরে আমরা হুগলী হইতে রওনা হইলাম। সেদিন শুক্লানবমী। মাস জ্যৈষ্ঠ। সন্ধ্যা হইতেই একটা হুহু বাতাস ভাগীরথীর রজতধারাকে কোলে তুলিতে আসিয়া-ছিল। সেইজন্য ভাগীরথীবক্ষ বড়ই আন্দোলিত হইতেছিল। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে রওনা হইতে পারি নাই। তা করিলে আমরা রাত্রি থাকিতে থাকিতে কালীঘাটে পৌঁছিতে পারিতাম।

পৌঁছিতে পারিলে আমাদের সুখের সংসার দীর্ঘযুগব্যাপী নিরানন্দের ভাবে নিষ্পেষিত হইত না।

কালীঘাটে যখন পৌঁছিলাম তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছে। সেখানে আদি-

গঙ্গার ঘাটে এক আত্মীয়া রমণীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারই মুখে শুনিলাম, পিতামহী ও তাঁহার "পৌত্রবধূ" ও আর একটি স্ত্রীলোক সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বে স্নান সারিয়া দেবী-মন্দিরে গমন করিয়াছেন।

বলিতে হইবে না আমরা সকলেই তাঁহাদের দর্শনের আশায় উৎফুল্ল হইয়া, নৌকা হইতে অবতরণ করিলাম।

এইস্থানেই সর্ব্বপ্রথমে মাতা ও পিতা—সার্ব্বভৌমের কন্যার সহিত আমার সম্বন্ধ জানিতে পারিলেন। জানিতে পারিলেন, গোবিন্দ-ঠাকুরদা ও গণেশ-খুড়ার কাছে। আমাকে বাধ্য হইয়া সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইল। বকুল বৃক্ষের তলদেশে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল, যেরূপে ঘটিয়াছিল, ঠাকুর-দাদার সাহস ও পিতা-মাতার স্নেহের আশ্বাস পাইয়া আমি সব স্বীকার করিলাম।

তাহা শুনিয়া কি জানি কি এক সহসোদিত মমতায় মাতা ও পিতা উভয়েই ব্যাকুল হইয়া, তাঁহাদের খুঁজিতে দেবীমন্দিরের দিকে চলিলেন।

কিন্তু কোথায় তাঁহারা? দেবীমন্দিরে তাহাদিগকে পাওয়া গেল না। কালীঘাটের যেখানে যে চটি-দোকান, সব তন্নতন্ন করিয়া অন্বেষণ হইল। তাঁহাদের দেখা মিলিল না।

* * * *

দেশে ফিরিয়া ঘর খুঁজিলাম—ঠাকুরমা ঘরে ফিরেন নাই। সার্ব্বভৌমের কাছে সন্ধান লওয়া হইল। ব্রাহ্মণ বলিতে পারিল না।

তাঁহার সঙ্গে পিতার অনেক কথা হইয়াছিল। সে সব কথা কহিতে হইলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। পিতা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াও দীনবেশী সার্ব্বভৌমকে এতকাল চিনিতে পারেন নাই। এতদিন পরে পিতৃকর্তৃক

ব্রাহ্মণের মহত্ত্ব অনুভূত হইয়াছে। সত্যরক্ষার্থ ব্রাহ্মণ 'কন্যা'-আখ্যাধারিণী কুমারীকে "হরিহর" নামধারী নারায়ণকে নিবেদন করিয়া দিয়াছেন। নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কন্যার উপর মমতার অধিকার পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। স্বামীর সত্যপালনার্থ সে অধিকার গ্রহণ করিয়াছেন, আমার পিতামহী।

এক, দুই, তিন—দেখিতে দেখিতে সাতদিন চলিয়া গেল ঠাকুরমা ঘরে ফিরিলেন না। গোবিন্দ-ঠাকুরদা ব্যাকুল হইলেন, গ্রামশুদ্ধ লোক ব্যাকুল হইল। যে পিতামহী সকলের প্রাণ-স্বরূপিনী ছিলেন, এ সাত:দিনে তাঁহার কোনও সন্ধান মিলিল না। এইবারে পিতা বুঝিলেন, তাঁহার মা চিরদিনের জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি বুঝিলেন, শুধু তাঁহার কিংবা পুত্রবধূর উপর ক্রোধ করিয়া, তাঁহার জননী গৃহত্যাগ করেন নাই। কাম-লালসার নিঃশ্বাস-স্পর্শে পাছে এক অনাঘ্রাত দেব-নির্ম্মাল্য কলুষিত হয়, তাই তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছেন। সেই জন্য তিনি কোনও আত্মীয়কে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানান নাই। এমন কি, সাধু সার্ব্বভৌমকেও এসম্বন্ধে কোনও কিছু আভাষ দেন নাই। এক কপর্দ্দকও সঙ্গে লন নাই। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখি, যেখানের যে সামগ্রীটি, সেইখানেই পড়িয়া আছে। কেবল যাঁর উপর আমাদের গৃহদেবতার পূজার ভার আছে, তাহার হস্তে তিনি ঘরের চাবী দিয়া গিয়াছেন।

পিতা সমস্তই বুঝিলেন। বুঝিলেন, মাকে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। খুঁজিয়া পাইলেও তাঁহাকে গৃহে ফিরানো অসম্ভব। বুঝিয়া তিনি আপনাকে ধিক্কার দিলেন। শৈশব হইতে সেই অল্পভাষিণী অল্পাশিনী

জননীর স্থিরমূর্ত্তি তাঁহার মনে পড়িল। ফিরাইতে পারিবেন না বুঝিয়াও তিনি পিতামহীর অন্বেষণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

(২৭)

দেশে পদার্পণ করিয়াই শুনিলাম সত্যপালনের জন্য ব্রাহ্মণ সার্ব্বভৌম তাঁহার শিশুকন্যাটিকে বালক আমার হস্তে সমর্পণ করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সেই সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য পিতামহীও আমার বিবাহ দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন;—পত্রে পত্রে পিতাকে উত্যক্ত করিয়াছিলেন। সমস্ত গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ-শূদ্র, এমন কি দেশের কৃতবিদ্য জমীদার পর্য্যন্ত তাঁহাদের এই জেদের পোষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরও প্রেরিত অনেক অনুরোধ-পত্র পিতার নিকটে আসিয়াছিল।

কিন্তু পিতা কিছুতেই তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। এই এক বৎসরের মধ্যে তিনি দেশে ফিরিলেন না। এই বিবাহের ভয়েই পিতামহের 'সপিণ্ড' কার্য্য পর্য্যন্ত অনিষ্পন্ন রহিয়াছে। পাছে, লোকের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া, আমার বিবাহে সম্মতি দিতে হয়। পিতা সমস্ত লোকনিন্দার ভার চিরজীবনের জন্য বহন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এ বিবাহ না দিলে তাঁহাকে একঘরে হইতে হইবে, আমারও ভবিষ্যতে বিবাহ হওয়া দুর্ঘট হইবে—এরূপ অনেক বিভীষিকার পত্রও তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল। এ সকল ভয়-প্রদর্শনে পিতা ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার সঙ্কল্প, কিছুতেই এই বর্ব্বরোচিত সামাজিক প্রথার সম্মুখে তিনি পুত্রবলি দিবেন না।

পত্রে পিতামহীকে তিনি বহুবার সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করিয়া-

ছিলেন। পিতামহী তথাপি পিতাকে উত্ত্যক্ত করিতে নিরস্ত হন নাই। শেষে তাঁহার জেদ তাঁহাকে হুগলীতে পর্য্যন্ত উপস্থিত করিয়াছে। সেথনে পিতার কাছে তাঁহার কেবল তিরস্কার—দারুণ তিরস্কার—লাভ হইয়াছে।

ইহাও শুনিলাম, সার্ব্বভৌম স্বহস্তে পিতাকে এক পত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি পিতাকে তাঁহার সত্যরক্ষার জন্য সাগ্রহ অনুরোধ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন,—"সামান্য মাত্রও আড়ম্বর না করিয়া হরিহরের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ দাও। কেবলমাত্র আমার সত্যরক্ষা—আমার ধর্ম্মরক্ষা কর। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বিবাহের পর কন্যাকে তোমার গৃহে পাঠাইব না। তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার পুত্রের সঙ্গে অন্য কন্যার বিবাহ দিও। আমি আপত্তি করিব না। কেহ ভবিষ্যতে উৎপীড়ন না করে, তাহারও ব্যবস্থা আমি করিয়া যাইব। তুমি শুধু আমার সত্যরক্ষা করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর।"

পিতা এ পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দেন নাই। অতি অর্ব্বাচীনের মত লেখা বলিয়া, বোধ হয়, পত্রের উত্তর দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই। অগত্যা ব্রাহ্মণকে আমার সম্বন্ধে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

কিন্তু—সত্য কি? ব্রাহ্মণের সত্যরক্ষার কথা লইয়া দেশমধ্যে কিছুদিন ধরিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছিল—কিছুদিন গ্রামবাসীদিগের মধ্যে জল্পনা চলিয়াছিল। এ সত্য কি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সার্ব্বভৌম মহাশয় বিবাহ করিয়া বহুকালের মত দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। বালিকা পত্নীকে গৃহে রাখিয়া,

শাস্ত্রশিক্ষার জন্য ভারতের নানা দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। বেদ শিখিতে দ্রাবিড় পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া যখন তিনি দেশে ফিরিয়াছেন, তখন তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিজ্ঞা—স্বামীর স্মরণ মাত্র অবলম্বনে ব্রহ্মচর্য্যে পূর্ণাভ্যস্তা। এ ত্রিশ বৎসর একেবারে তিনি নিরুদ্দিষ্টের মত কালযাপন করেন নাই। এক এক চতুষ্পাঠী হইতে এক এক প্রকারের দর্শন শেষ করিয়া, তিনি এক একবার গৃহে ফিরিতেন। দিন কয়েকের জন্য গৃহে অবস্থান করিয়াই, আবার অন্যশাস্ত্র শিক্ষার জন্য অন্য দেশে যাইতেন।

কিন্তু তিনি আসিতেন ব্রহ্মচারীর বেশে। পিতামাতার চরণদর্শন করিতে, ব্রহ্মচারিণী পত্নীর পতি-দর্শনলালসা চরিতার্থ করিতে, তিনি মাঝে মাঝে এক একবার তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য না থাকিলে, একান্ত সত্যনিষ্ঠ না হইলে, বেদবেদান্তে কাহারও পূর্ণ অধিকার জন্মে না। সেই ব্রাহ্মণ সত্যরক্ষার জন্য কাতরভাবে আমার পিতার নিকট আমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

এ সত্য কি ? রোমীয় শাসনকর্ত্তা পাইলেট তাঁহার বিচারমন্দিরে আনীত বদ্ধহস্ত যিশুখৃষ্টকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"সত্য কি ?" কিন্তু তিনি ইহার উত্তর শুনিবার অপেক্ষা করিতে পারেন নাই; মহাপুরুষের শ্রীমুখ-বিনির্গত বাণী শুনিবার পূর্ব্বেই তিনি বিচারাসন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মনে হয়, সত্য শুনিতে তাঁহার সাহসে কুলায় নাই।

পিতৃসত্যপালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে গিয়াছিলেন। একথা ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা হিন্দুর একজনেরও বোধ হয় অবিদিত নাই। অথচ এখনকার জ্ঞানের হিসাবে তাঁহার চরিত্র

সমালোচনা করিলে, তাঁহাকে গণ্ডমূর্খ বলিয়াই আমাদের বোধ হয়। যেদিন রামচন্দ্র—ঋষি অষ্টাবক্রের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিলেন—"প্রজা-রঞ্জনের অনুরোধে যদি প্রাণসমা জানকীকেও বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাতেও আমি কুণ্ঠিত হইব না;"—ঠিক সেই দিনেই দুর্ম্মুখ প্রজার নিকট হইতে জানকী সম্বন্ধে দুঃসংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। ফলে জানকী নির্ব্বাসিতা হইলেন। সতীশিরোমণি একটা রজকের অনবধান-তায় উচ্চারিত তুচ্ছ কথায় জন্মের মত পতিসঙ্গ হইতে বঞ্চিতা হইলেন। পুরুষের এরূপ নিষ্ঠুরতা ত আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। অথচ সমগ্র হিন্দুর চক্ষে সেই রাম শান্ত, শাশ্বত, অপ্রমেয়, অনঘ!

দস্যুর অক্রমণ হইতে এক নিরীহকে রক্ষা করিতে অস্ত্র আনিবার জন্য, অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের সহিত অবস্থিতা দ্রৌপদীর ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে। ফলে দ্বাদশ বৎসরের জন্য তাঁহার নির্ব্বাসন!

এ তাঁহার স্বেচ্ছাগৃহীত শাস্তি। পরোপকার-প্রবৃত্তির দোহাই দিয়া, তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ, আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে গৃহে থাকিতে যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু সত্য!—সত্যভঙ্গভয়ে তৃতীয় পাণ্ডব গৃহত্যাগ করিলেন! কাহারও অনুরোধ রহিল না!

কেহ কি বলিতে পার, এ সত্য কি? বড় বড় কথা আমরা অনেক কহিয়াছি। এখনও অনেক বড় বড় কথা কহিতেছি। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," "সত্যমেব জয়তে", "নাস্তি সত্যাৎ পরোধর্ম্মঃ," "সত্যং বলং কেবলং"—এইরূপ মহাবাক্য আমরা মুখে কতবারই না উচ্চারণ করিয়াছি! কিন্তু যদি আমরা কোন সাধুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া,

হৃদয়ে হস্ত দিয়া, মুখের পানে চাহিয়া—প্রশ্ন করি, সত্য কি, আমার এখনও বিশ্বাস, প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনেকেরই হস্ত হৃদয়-প্রদেশ হইতে নামিয়া পড়ে। প্রশ্নের উত্তর শুনিতে সাহস থাকে না—পাইলেটের মত সাধুর মুখ হইতে উত্তর বাহির হইবার পূর্ব্বেই আমাদের স্থানত্যাগে বাধ্য হইতে হয়। যে শুনিবার জন্য দাঁড়াইতে পারে, তুমি বুঝিবে, তাহারও কতকটা সত্যের উপলব্ধি হইয়াছে।

হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং যখন এই বাংলায় আসিয়াছিলেন, তখন এখানে একটি লোককেও তিনি মিথ্যা-বাদী দেখিতে পান নাই। এই অপূর্ব্ব সত্যনিষ্ঠ জাতিকে তিনি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হাজার বৎসর পরে 'মিথ্যাবাদীর কীর্ত্তিস্তম্ভ' বলিয়া সেই বাঙ্গালীকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কাছে গালি খাইতে হইয়াছে। একথা শুনিলেই শরীর শিহরিয়া উঠে! অথচ যাঁহারা বলিয়াছেন, তাঁহারাও সত্য কি, এই প্রশ্ন করিলে প্রাচ্যের উত্তরের অপেক্ষায় ক্ষণেকের জন্যও দাঁড়াইতে সাহস করেন না।

বর্ত্তমান সভ্যতার অনুভূতির সীমান্তে অবস্থিত সেই সত্য এক সময় বাঙ্গালীর অবলম্বন ছিল। তাহার স্বরূপ কি, এখন আমাদের বুঝিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। যে কার্য্য এখন আমাদের পুরুষকারের সাধ্যায়ত্ত নহে, এখন আমরা কেবল তাহার দোষানুসন্ধানেরই চেষ্টা করি। এবং তৎপরিবর্ত্তে একটা মিথ্যার প্রতিষ্ঠায় আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের কার্য্যকলাপের উপর দোষারোপ করি।

সার্ব্বভৌম বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহার অনুপস্থিতির অবকাশে বাঙ্গালার প্রকৃতি কিরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবর্ত্তনের

সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর পূর্ব্ব চরিত্রের উপর দিয়া কি প্রবল ঝঞ্ঝা চলিয়া গিয়াছে। বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই তিনি এই বাগ্‌দান ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। কিছুদিন অবস্থানের পর এ পরিবর্ত্তন তাঁহার চোখে পড়িল। তিনি দেখিলেন, বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণগৃহ হইতে ব্রহ্মচর্য্য ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে। এখন যে ভাবে তাহাদের শিক্ষা, তাহাতে ব্রাহ্মণবালকের ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থারক্ষা বড়ই দুরূহ।

কিন্তু তখন আর উপায় নাই। কার্য্য আগে হইতেই নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গৃহদেবতার সম্মুখে ঘটস্থাপন করিয়া, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে তিনি আমাকে কন্যাদানের সঙ্কল্প করিয়াছেন। যেমন করিয়া হউক, সে সঙ্কল্প তাঁহার রক্ষা করিতেই হইবে।

সে সময়েও গ্রামবাসী তাঁহার সঙ্কল্পের মর্ম্ম সম্যক বুঝিতে পারে নাই। প্রতিজ্ঞারক্ষায় পিতার অনাস্থা দেখিয়া তাহাদের অনেকে দুঃখিত হইয়াছিল মাত্র। এমন কি, গোবিন্দ-ঠাকুরদাও বুঝিতে পারেন নাই, কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইবার দুই একমাস পরে কন্যার বিবাহ হইলে সার্ব্বভৌমের ধর্ম্মসম্বন্ধে কি অনিষ্ট হইবে! তিনি আমার সঙ্গে তৎকন্যার বিবাহের আশ্বাস তাঁহাকে দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—"অঘোরনাথকে বাধ্য করিবার উপায় আমার কাছে আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আপনার কন্যার বিবাহের জন্য আমি দায়ী রহিলাম। দুই দিনের বিলম্বে আপনি ভীত হইবেন না।"

ব্রাহ্মণ এ আশ্বাসে নিশ্চিত হ'ন নাই। আশ্বাস বাক্য কাণেও তুলেন নাই। তিনি ধর্ম্মরক্ষায় ব্যাকুল হইয়াছিলেন। 'আমার পিতা যদি আমার বিবাহ না দেন, তাহা হইলে, কি উপায়ে তাঁহার ধর্ম্মরক্ষা হয়, সেই উপায়

তিনি গোপনে গোপনে অনুসন্ধান করিতেছিলেন। একজন কেবলমাত্র তাঁহার সঙ্কল্পের মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণের মনের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি আমার পিতামহী।

পিতামহী বুঝিয়াছিলেন, পিতা সার্ব্বভৌমের কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিবেন না। যদিও দেন, তাহা এমন সময়ে দিবেন, যাহাতে ব্রাহ্মণের বাগ্‌দানের কোনও ফল হইবে না। তাঁহার ধর্ম্মরক্ষা হইবে না। তিনিই কেবল ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিতে পারেন নাই। কোন্ মুখে তিনি তাঁহাকে আশ্বাস দিবেন! ব্রাহ্মণের বিপদে, স্বামীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ না হওয়ায় তাঁহার যে দুঃখ, তিনি সে দুঃখ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন।

তিনি ব্রাহ্মণকে দেখিলে, কেবলই কাঁদিতেন। তাঁহার কাছে আশ্বস্ত হইতে আসিয়া, ব্রাহ্মণের তাঁহাকেই আশ্বাস দিতে হইত।

প্রতীকারের কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া পিতামহী ব্রাহ্মণের সমক্ষে কাঁদিতেন; এবং তাঁহার অন্তরালে কুলদেবতার কাছে তাঁহার ধর্ম্মরক্ষার প্রার্থনা করিতেন। অনেক দিনের প্রার্থনায়ও যখন কিছু ফল হইল না, বৃদ্ধা যখন দেখিলেন, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম আর কিছুতেই রক্ষা হয় না, তখন মনের আবেগে কুলদেবতার সম্মুখে তিনি এক সঙ্কল্প করিয়া বসিলেন। করযোড়ে দেবতার কাছে প্রার্থনা করিলেন—"ঠাকুর! বালিকার দশবৎসর উত্তীর্ণ না হইতে যেমন করিয়া হউক, হরিহরকে আনিয়া দাও। আমি চক্ষুর উপর ব্রাহ্মণের ধর্ম্মনাশ দেখিতে পারিব না। যদি না আন, তোমার সম্মুখে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি এই গৃহ পরিত্যাগ করিব।"

তাঁহার প্রতিজ্ঞার 'পর দিবসেই প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ পাগলের মত পিতামহীর নিকটে ছুটিয়া আসিলেন। এবং তাঁহার সম্মুখে এক শালগ্রাম-

শিলা স্থাপন করিলেন। শিলা স্থাপন করিয়া বাষ্পগদগদস্বরে বলিলেন—"মা! আমি হরিহর পাইয়াছি। আমার ধর্ম্মরক্ষা হইবার উপায় হইয়াছে! এই মাসেই বিবাহের এক প্রশস্ত দিনে তোমার এই পৌত্রের হাতে আমার দাক্ষায়ণীকে সমর্পণ করিব।" পিতামহী দেখিলেন শিলা—শিলা অপূর্ব্ব! তাহার একাংশ তুষার-শুভ্র। অপরাংশ ঘনকৃষ্ণ। একদিকে হরির—অপর দিকে হরের অঙ্গকান্তি।

অন্যে এই সকল কথা শুনিলে, তাঁহাকে পাগল মনে করিত। পিতামহী কিন্তু তাহা করিলেন না। সার্ব্বভৌমের জ্ঞানের উপর তাঁহার অণুমাত্রও সংশয় ছিল না। তিনি সমস্ত বুঝিলেন। ব্রাহ্মণের সত্যনিষ্ঠাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি নিজে শাস্ত্রানভিজ্ঞ হইলেও, এটা জানিতেন, সার্ব্বভৌমের তুল্য পণ্ডিত ও সাধু, সে দেশে—সে দেশে কেন—সমস্ত বঙ্গ-দেশে তখন একজনও ছিল না। পিতামহী পিতামহের কাছে একথা শুনিয়াছিলেন। স্বামি-বাক্যে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল।

সুতরাং সার্ব্বভৌমকে তিনি পাগল মনে করেন নাই। বুঝিয়াছিলেন, হরিহরের অভাবে এই শালগ্রাম-শিলাতেই তাঁহার পৌত্রত্বের আরোপ করিয়া, ইঁহাকেই ব্রাহ্মণ কন্যাদান করিবেন।

দেবতার উপর অগাধ ভক্তি থাকিলেও—এক শিলাকে লক্ষ্য করিয়া, ব্রাহ্মণের কন্যাদানের চিন্তা মনে উদিত হইবামাত্র পিতামহীর প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। হৃদয়ের আবেগে তিনি নয়নযুগলকে অশ্রুশূন্য করিতে পারিলেন না।

দেখিয়া ব্রাহ্মণ পিতামহীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ ত আনন্দের কথা! নারায়ণ পৌত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়া তোমার কোলে আসিতেছে!

তবে তুমি কাঁদিতেছ কেন মা?" পিতামহী উত্তর করিলেন—"আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। তবে কি জানেন ঠাকুর, আপনার মত আমার দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয় নাই। আপনি ইঁহাকে যেরূপ দেখিতেছেন, এ মমতান্ধের সেরূপ দেখিতে সামর্থ্য নাই। আমার অনুরোধ, এই দেবতাকে কন্যা-দানের পূর্ব্বে আপনি একবার আমার সঙ্গে হুগলী যান।" "বেশ যাইব!"

ঠিক এমনি সময়ে গণেশ-খুড়াকে হুগলী পাঠাইবার জন্য পিতামহীর কাছে পিতার পত্র আসিল। পিতামহীরও হুগলী-যাত্রার সুযোগ ঘটিল। যাত্রার ফল সমস্তই পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

(২৮)

এখন শুধু পিতামহীকে ও তৎসঙ্গে অভাগিনী সার্ব্বভৌম-কন্যাকে ঘরে ফিরাইবার কথা। "অভাগিনী"—তাহার ভাগ্য ভাল কি মন্দ, এ কথা বিচার করিবার কাহারও সে সময় অবসর ছিল না। তাহার বিবাহের তত্ত্ব বুঝিতেও অতি অল্প লোকেরই সে সময় সামর্থ্য ছিল। সার্ব্বভৌমের কন্যাদান-মহোৎসবের প্রকৃতি দেখিয়া, সে দেশের প্রায় সমস্ত লোকেই আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছিল। আত্মীয়স্বজন ব্রাহ্মণের মন রাখিতে এই বিবাহ-ব্যাপারে যোগ দিলেও, অনেকেই অন্তরালে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিল। দক্ষিণ রায়ের আস্তানার সম্মুখ হইতে যে প্রৌঢ়া রমণী আমাকে বনভোজন করাইতে আমলকীতলে রমণীমণ্ডলীমধ্যে উপস্থিত করাইয়াছিল— শুনিয়াছি, বিবাহের দিন হইতেই "দাখীর" শোকে অন্নজল ত্যাগ করিয়া সে একরূপ মরিতে বসিয়াছে।

আর দাক্ষায়ণীর মা? এতকাল আমি কেবল আমাদের দিক হইতেই

এ ইতিহাসের কথা বলিয়া যাইতেছি। সত্য কথা বলিতে গেলে, সে বালিকার সঙ্গে আজিও পর্য্যন্ত আমাদের যে সম্বন্ধ, তাহাতে আমাদের সে সম্পর্ক লইয়া, এতটা বাগাড়ম্বরের কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। যাহা কিছু বলিবার, তাহা সেই মহীয়সী রমণী সম্বন্ধে বলিলেই সমীচীন ও শোভন হইত। যাহা কিছু ক্ষতি হইবার তা তাঁহারই হইয়াছে! তাঁহার "বত্রিশনাড়ী" ছেঁড়া ধন আজ পথে পরিত্যক্ত হইয়াছে! সংসার পথে অগণ্য পথিক—সকলেই কি পথ দেখিয়া চলে? ধূলিধূসরিত এই অমূল্য রত্ন কত রূঢ় চরণতলে পড়িয়া যে পিষ্ট হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

পুত্র বলিতে—কন্যা বলিতে—বংশধর—এমন কি, ব্রাহ্মণদম্পতির সাধনার ফল বলিতে ওই একমাত্র কন্যা দাক্ষায়ণী; তাহার পরে অথবা পূর্ব্বে তাঁহাদের পুত্র কিংবা কন্যা কিছুই হয় নাই। এমন অমূল্যনিধি তাঁহাদের—বুঝি জন্মের মত—চোখের অন্তরাল হইয়াছে! এ বিয়োগ বালিকার মৃত্যুর সঙ্গে তুলনীয়,—না মৃত্যু হইতেও ভীষণ? মৃত্যুতে একটা সান্ত্বনা আছে। অন্য অন্য পুত্রকন্যাহীনের অবস্থার সঙ্গে নিজের অবস্থার একটা তুলনা আছে। পৃথিবীর দুঃখ বিয়োগের জ্বালা যন্ত্রণা বৈতরিণী পার হইয়া স্বর্গরাজ্যের অধিবাসীকে স্পর্শ করিতে পারিবে না বুঝিয়া, সময়ে সময়ে মনের একটা নিশ্চিন্ততা আছে। এমন কি, শোকের তীব্রতা কালবশে অপসারিত হইলে, হারানিধির স্মরণে নৈরাশ্যের মধুময় নিশ্বাস-স্পর্শের একটা অবসাদ আছে। সেই মমতাময়ী প্রিয়-স্মৃতি আকাশ-প্রান্তগামিনী অবিরাম হাস্যময়ী কাদম্বিনীর দূরাগত ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া কত আশ্বাস-কথা বায়ুসাগরে মিলাইয়া মিলাইয়া, "মধুতোঽপিচ মধুরং"

করিয়া নীরবতার মাদকতা মাখাইয়া, বিয়োগীর অন্তঃশ্রবণে ঢালিয়া দেয়!

কিন্তু এ বিয়োগ ত তাহা নয়! আমার প্রিয় জীবিত আছে—এ বিশাল ধরণীর কোন্ অন্তরালে, আমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে লুকাইয়া আছে! আমি দেখিবার জন্য ব্যাকুল অথচ তাহাকে দেখিতে পাইব না। একথা মনে করিতে গেলেই বিশাল ধরণী দেহসঙ্কোচে সমস্ত ভার কেন্দ্রস্থ করিয়া, যেন হৃদয়ের জীবন-স্পন্দনটাকে চাপিয়া ধরে! জীবন তখন একটা প্রচণ্ড যাতনার কারণ হইয়া উঠে। অথচ মরিতে সাহস নাই। কি জানি, মরণের পরমুহূর্ত্তেই যদি প্রিয়তম কাছে আসিয়া, আমাকে সম্বোধন করিয়া বসে!

এইরূপ দুর্ব্বিষহ জীবনভার বহন করিতে যিনি একমাত্র বালিকা কন্যাকে গৃহ হইতে কোন অজ্ঞাত দেশে বিদায় দিয়াছেন, সেই সাধ্বী জননীর কথা একটিও কি কহিতে পাইব না?

কেমন করিয়া কহিব! তখন আমি বালক—পিতামাতার মমতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ—বন্দী! গৃহের দ্বার হইতে বাহিরের পথে একটি পদও অগ্রসর হইবার আমার ক্ষমতা নাই। কাহারও নিকট হইতে তাহার অবস্থা জানিবারও আমার উপায় নাই। কেমন করিয়া বুঝিব, আপনাদেরই বা কেমন করিয়া বুঝাইব, কি ভাবে তাঁহার দিন যাইতেছে!

তথাপি কালস্রোতে প্রকৃতির পুষ্পাঞ্জলিদানের মত পরস্পরে অসম্বদ্ধ যে দুই একটা কথার গুচ্ছ সেই সময় ভাসিয়া আমার কাণে লাগিয়াছিল, তাহাই আমি বলিব। এবং এই বর্ণনা হইতেই সার্ব্বভৌম-পত্নীর মহত্ত্বের পরিচয় দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

অনেক কথা গণেশ-খুড়ার মুখেই শুনিয়াছি। আমাদের গ্রামত্যাগের পর হইতে খুড়াই একাকিনী পিতামহীর অনুচরের কার্য্য করিয়াছে। ভৃত্য সদানন্দ ও খুড়া—উভয়ে মিলিয়া—ঠাকুরমার যখন যা অভাব হইত, পূরণ করিত। ঠাকুরমার আদেশে তাহাকে মাঝে মাঝে সার্ব্বভৌমের বাড়ী যাইতে হইত। সেখানে সার্ব্বভৌম-গৃহিণীর সঙ্গে তাহার মাঝে মাঝে অনেক কথা হইত। দাক্ষিণাত্য-বৈদিকের "বাগ্‌দান" প্রথা বিবাহেরই সঙ্গে একরূপ তুলনীয়। পুত্র অথবা কন্যা—এ উভয়ের মধ্যে একজন মৃত্যুমুখে না পড়িলে, উভয়ের বিবাহ অবশ্যম্ভাবী। বর বাঁচিয়া থাকিতে বাগ্‌দত্তা কন্যার বিবাহ হয় নাই, ইহা আমাদের দেশে কেহ শুনে নাই। এই জন্য সার্ব্বভৌম-গৃহিণী এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবেন নাই যে, তাঁহার কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইবে না। বনভোজন দিবসে মহিলা-মণ্ডলী মধ্যে মায়ের আচরণ দেখিয়া, তিনি কেবল একটু শঙ্কিত হইয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন—"কোপন-স্বভাবা শাশুড়ীর হাতে পড়িয়া, তাঁহার প্রিয় নন্দিনীকে সময়ে সময়ে কিছু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। দাক্ষায়ণীর শ্বশ্রূ-সৌভাগ্য ঘটিবে না।"

এই জন্য আমাদের প্রথম মিলনের পর হইতেই তিনি কন্যাকে ভাবীশ্বশুর-গৃহবাসের জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন। শাশুড়ীর মেজাজ বুঝিয়া কেমন করিয়া চলিতে হইবে, কিরূপ ভাবে চলিলে, স্বভাবকে কিরূপ ভাবে গঠিত করিলে কোপন-স্বভাবারও প্রিয়পাত্রী হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল বিষয় লইয়া, তিনি কন্যাকে বধূর কর্ত্তব্য-শিক্ষা দিতেছিলেন; এমন সময় তিনি শুনিলেন, আমার পিতা তাঁহার কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিবেন না। অথবা যদি বিবাহ দেন, তাহা

হইলে, আমার বি, এ-পাশ করা না পর্য্যন্ত তিনি কোনমতেই বিবাহ দিতে পারিবেন না। সে সময় আমার বয়স হইবে, আন্দাজ একুশ এবং দাক্ষায়ণীর আঠারো কিংবা উনিশ। যদি প্রথম পরীক্ষায় পাশ না করিতে পারি, তাহা হইলে বয়স আরও অধিক হইবার সম্ভাবনা। এই দীর্ঘ সময় যদি সার্ব্বভৌম কন্যাকে অনূঢ়া রাখিতে পারেন, তবেই বিবাহ হইবে। নতুবা তিনি কন্যাকে অন্যপাত্রস্থা করিতে পারেন।

পিতা পিতামহীকে উক্ত মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং পত্রমর্ম্ম ব্রাহ্মণকে অবগত করাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই কথা শুনাইবার ভার গণেশ-খুড়ার উপর পড়িয়াছিল। খুড়ার নিকট হইতেই এই সময়ের ইতিহাস আমি সংগ্রহ করিয়াছি।

খুড়ার কথাতেই আমি তাহা প্রকাশ করিতেছি।

"আমি মূর্খ—গণ্ডমূর্খ। গণেশের মা'র পুত্র, এই গৌরবের উপাধি লইয়াই মত্ত। আমি নিজেকে লইয়া, আর নিজের সংসারের কাজকর্ম্ম লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতাম। অন্যের ঘরের ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন বুঝিতাম না। সুতরাং অঘোর-দা'র বাড়ীতে হরিহরের বিবাহ লইয়া কি যে গোলমাল চলিতেছে, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। মূর্খ বলিয়া আমার কোম্পানীর চাকরী করা ঘটিবে না, আর চিরকালের দাদাকে হুজুর বলা চলিবে না বলিয়া, আমি মনে মনে ভবিষ্যতের চাকরীকে ইস্তফা দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি।

"এখন আমি মাকে বুঝাইয়া, স্ত্রীকে বুঝাইয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছি। প্রথম প্রথম শালতী হইতে পলাইয়া আসিবার দরুণ উভয়েরই অনেক মুখনাড়া খাইয়াছিলাম। জেঠাইমা কৃপা করিয়া,

দাদার হাকিম হইবার ফলে নিজের অবস্থা দেখাইয়া, উভয়কে বুঝাইয়া দিয়াছেন। জেঠামশায়ের সপিণ্ডকরণে দাদা দেশে ফিরিল না দেখিয়া, মায়ের চক্ষু ফুটিয়াছে। এখন সকলের ভয় হইয়াছে, হঠাৎ কোন রোগ হইলে, নিঃসন্তান স্ত্রীলোকের মত লোকাভাবে বুঝি জেঠাইমাকে ঘরে মরিতে হয়!

"তাই গোবিন্দ-খুড়া আমাকে মায়ের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাতে খুড়া আমার সংসার-প্রতিপালনের ঝঞ্ঝাট্‌টাও মিটাইয়া দিয়াছে।

"আমি জেঠাইমা'র কাছে থাকি, কিন্তু তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার মনে বড়ই কষ্ট হয়। অমন বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, উপযুক্ত পুত্র, অমন সোনার চাঁদ নাতী, সব থাকিতে জেঠাইমার যেন কেহ নাই। আমার পাঁচ বছরের ছেলে এখন তাঁর একমাত্র আদরের পাত্র হইয়াছে! আমার তিন বছরের মেয়ে তাঁর ঘাড়ে পিঠে চাপিয়া, তাঁর পূজার সামগ্রী ফেলিয়া, তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিতেছে! দাদার বাড়ীটা অরণ্যের মত বোধ হইত বলিয়া ছেলেমেয়েটাকে তাঁর পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়াছি। আমার বউ এখন তাঁর পদসেবা করে। আপনার সামগ্রীগুলিকে যেন হারাইয়া দয়াময়ী এ দরিদ্র গণ্ডমূর্খের পরিবারগুলাকে আপনার করিয়া লইয়াছেন।

"মনে মনে ভাবি, দাদার হাকিমীতে জেঠাইমা'র কি লাভ হইল —দেশেরই বা কি উপকার হইল! লাভের মধ্যে তুচ্ছ দু'দশটা টাকার জন্য ঘরের ছেলে পর হইতে বসিয়াছে! বৈকুণ্ঠের লোভেও বৃদ্ধ মা-বাপকে ত্যাগ করিতে নাই। যাঁর করুণায় পৃথিবীতে আসিয়াছি,

তুচ্ছ টাকা, তুচ্ছ মানের লোভে সেই গর্ভধারিণীকে পরিত্যাগ! আমি মায়ের উপর মাঝে মাঝে রাগ করিতাম। কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিব, এ কথা একদিনও স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। দাদার সঙ্গে বিদেশে যাইবার সময় মায়ের মুখ মনে পড়াও আমার পথ হইতে পলাইয়া আসিবার আর একটা কারণ। আমি এক এক সময়ে নির্জ্জনে বসিয়া অঘোরদা'কে উদ্দেশে ধিক্কার দিতাম। আর বউ-ঠাকুরাণীর উপর ক্রোধ প্রকাশ করিতাম। আমার বোধ হইত, বউ-ঠাকুরাণীই দাদাকে আমাদের পর করিয়া দিয়াছে। স্ত্রীবশ হইয়া দাদার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। তবে আমি গণ্ডমূর্খ। পণ্ডিতের কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য আমার বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

"আমার সকল কথা তোমরা ধরিও না। আমি যেটা সত্য মনে করিয়াছি, তাহাই বলিতেছি। বাস্তবিকই বউ-ঠাকুরাণীর উপর মাঝে মাঝে আমার রাগ হইত। পুত্র-পৌত্রের স্মরণে সদানন্দময়ী জেঠাইমা'র মুখ এক এক দিন বড়ই মলিন হইয়া যাইত। আমাদের মত অভাগ্যগুলাকে আদর-আপ্যায়নে মুগ্ধ করিয়া, এক এক দিন জেঠাইমা সকলকে লুকাইয়া, নির্জ্জনে বসিয়া, 'হাপুষনয়নে' কাঁদিতেন। মাঝে মাঝে আমি তা দেখিতে পাইতাম। সে সময় তাঁহার কাছে যাইতে আমার সাহস হইত না। তবে দূরে দাঁড়াইয়া, মনে মনে দাদা ও বউ-ঠাকুরাণীকে গালি পাড়িতাম।

"আমি যেমন মূর্খ, তেমনি মূর্খেরই মত বুঝিলাম। স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই, জেঠাইমা কেবল হরিহরের বিবাহের চিন্তাতেই এত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। বুঝি নাই, তাঁহার যে নির্জনে বসিয়া

রোদন, সে পুত্র-পৌত্রকে না দেখিবার জন্য নয়, সাভ্যোমের কন্যার সঙ্গে হরিহরের বিবাহ দিতে দাদার ইচ্ছা নাই বলিয়া!

"যখন বুঝিলাম, দাদা হরিহরের বিবাহ দিবে না, তখন কন্যার দশবৎসর পূর্ণ হইতে সবে মাত্র একটি মাস অবশিষ্ট আছে। ইহার মধ্যে আবার বিবাহের দুইটিমাত্র দিন। এই দুইদিনের যে কোন একদিনে বিবাহ হইল ত হইল, নহিলে দশমবৎসরে আর সাভ্যোমের কন্যার বিবাহ হইল না।

"এ কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারে! আমাদের সমাজে আজও পর্য্যন্ত কেহ যাহা করে নাই, করিবার কথা মনেও আনিতে পারে নাই, আমার পাঁচটা পাশ করা 'ধর্ম্মাবতার' দাদা কি না তাই করিবে! নারায়ণ-ব্রাহ্মণের সম্মুখে করা যে বাগ্‌দানের প্রতিজ্ঞা, তা ভঙ্গ করিবে!

"সত্য কথা বলিতে কি, অনেকদিন অঘোরদা'কে দেখি নাই বলিয়া, তাঁহাকে দেখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল। একবৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যও বাড়ীতে না আসিলেও, মনে মনে বিশ্বাস ছিল, হরিহরের বিবাহ দিতে তাঁহাকে স্ত্রীপুত্র লইয়া বাড়ীতে আসিতেই হইবে। সেই আশায় নির্ভর করিয়া একরূপ নিশ্চিন্তের মতই দাদার দেশে ফিরিবার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

"আমি যখন জেঠাইমা'র কাছে প্রথম একথা শুনিলাম, তখন কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিতেই পারি নাই। কিন্তু শেষে বিশ্বাস করিতে হইল। বিবাহ সম্বন্ধে দাদা জেঠাইমাকে অতি নিষ্ঠুর পত্র লিখিয়াছেন। সেই পত্র সাভ্যোম-ম'শায়ের কাছে লইয়া যাইবার ভার

আমারই উপর পড়িয়াছে। পত্রের মর্ম্মকথা শুনিয়া আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। আমার মাথা টলিতে লাগিল। সেই অবস্থাতেও জেঠাইমা'র আদেশে ব্রাহ্মণের কাছে আমাকে পত্র লইয়া যাইতে হইল।

"সাভ্যোম-মহাশয়ের বাড়ীতে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা। সন্ধ্যা না হইলেও তার ছায়া আগে হইতেই যেন ব্রাহ্মণের সদর-বাড়ীর উঠান অধিকার করিয়াছে! ইহার পূর্ব্বে যতবার যখনই আমি তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছি, একটিবারও তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপ আমি লোকশূন্য দেখি নাই। ছাত্র, প্রতিবেশী, প্রবাসী, সাধু-সন্ন্যাসী, যখনই গিয়াছি, অন্ততঃ একজনকেও তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপে দেখিয়াছি।

"আশ্চর্য্যের বিষয়, সেদিন সেখানে একটি প্রাণীও ছিল না। কেবল কতকগুলা ছেলেমেয়ে ব্রাহ্মণের বাড়ীর সম্মুখে গ্রাম্যপথে ধূলা উড়াইয়া খেলা করিতেছিল। চণ্ডীমণ্ডপে কেহ নাই দেখিয়া, আমি একটু যেন বিপদে পড়িলাম! সাভ্যোম-ম'শায় যদি বাড়ীর ভিতর থাকেন, তাহা হইলে চীৎকার করিয়া না ডাকিলে, তিনি শুনিতে পাইবেন না। অথচ তাঁহাকে ডাকিতে আমার সাহস নাই।

"আমি কিছুক্ষণের জন্য উঠানটায় পায়চারী করিলাম। তবু সাভ্যোম-ম'শায়, অথবা অন্য কেহ সেখানে আসিল না। ছেলেগুলা থাকিয়া থাকিয়া, প্রকাণ্ড বটগাছে রাত্রিবাসী পাখীগুলার মত এক একবার গণ্ডগোল করিয়া উঠিতেছিল। মনে করিলাম, ব্রাহ্মণের কন্যা এই বালকবালিকাদের ভিতর থাকিতে পারে।

"এই মনে করিয়া একবার তাহাদের নিকটে গেলাম। সেখানে দাক্ষায়ণী অপেক্ষা বড়, ছোট, সমবয়সী, অনেক ছেলেমেয়ে দেখিলাম;

কিন্তু দাক্ষায়ণীকে দেখিতে পাইলাম না। তাহারা সে স্থানে আমার আগমন লক্ষ্য না করিয়া, আপনার মনে খেলিতে লাগিল। আমি তাহাদের মধ্যে যে কোন একজনকে—সাভ্যোম-ম'শায়কে আমার আসার খবর দিতে অনুরোধ করিলাম। কেহ আমার কথায় কান দিল না।

"আবার আমি ফিরিলাম। এবারে আর উঠানে পায়চারী না করিয়া, যতক্ষণ হয়, সভ্যোম-ম'শায়ের অপেক্ষা করিবার জন্য চণ্ডীমণ্ডপে উঠিলাম। দেয়ালে ঠেসানো মাদুর লইয়া বারান্দায় পাতিয়া বসিতে যাইতেছি, এমন সময় দেখি, দাক্ষায়ণী চণ্ডীমণ্ডপে বিছানো সপের একধারে বসিয়া রহিয়াছে। তাহার সম্মুখে খোলা একখানা পুঁথি—পুঁথির লেখার উপর চোখ রাখিয়া, মাথাটি নামাইয়া, বালিকা আসনপিঁড়ি হইয়া যেন পূজার ভাব করিয়া বসিয়া আছে। তাহার ভাব দেখিয়া, মাদুর-হাতে আমি অবাক্ হইয়া দাঁড়াইলাম। এই বয়সে দাক্ষায়ণী কি পুঁথি পড়িতে শিখিয়াছে!

"অনেকক্ষণ আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। এই সময়ের মধ্যে একটি-বারের জন্যও সে মাথা তুলিল না। মাথাটি অল্প অল্প নড়িতেছিল। বুঝিলাম, তাহার দৃষ্টি পুঁথির এক দিক্ হইতে অন্যদিকে যাতায়াত করিতেছে। পরণে একখানি সুন্দর চেলি। মাথাটি খোলা, এলো চুলগুলি পিঠ ঘেরিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে; কতকগুলা মাদুর স্পর্শ করিয়াছে। চেলির আঁচলাও পুঁথির পাশে পড়িয়া লুটাইতেছে; হাতে-জড়ান হাত কোলের উপর রাখা। যেন ধ্যানের মূর্ত্তি। গণ্ডমূর্খ আমি সে শোভার কথা কেমন করিয়া বলিব? সরস্বতীর সঙ্গে আমার চির-

শত্রুতা। পাঠশালে তালপাতায় লেখা, কিল্লী আর্ক পর্য্যন্ত আমার বিদ্যার মাপ। সেই দিন দাক্ষায়ণীকে দেখিয়া সর্ব্বপ্রথম সরস্বতী ঠাকুরাণীর উপর আমার ভালবাসা জন্মিল। সাভ্যোমের সেই মেয়েকে দেখিয়া আমার মনে হইল, মা যেন বালিকা দাক্ষায়ণীর মূর্ত্তি ধরিয়া, পুঁথির ভিতর হইতে তাঁরই ছড়ান বিদ্যা দৃষ্টিতে ধরিয়া, আঁচল পাতিয়া, কুড়াইয়া লইতেছেন।

"মা আমার মাথাও তুলে না, আমাকেও দেখিতে পায় না। ভাবিলাম, কি করি? মূর্খ আমি—বিদ্যার মর্ম্ম জানি না—তাহার ধ্যানভঙ্গ করিলে কি পাপ হইবে, কে জানে?

"আর কি বলিয়াই বা তাহাকে ডাকিব! ইহার পূর্ব্বে এখানে যতবার আসিয়াছি, ততবার মাকে 'বউমা' বলিয়া ডাকিয়াছি। যে খবর আজ আমি তাহার বাপকে দিতে আসিয়াছি, তাহাতে তাকে বউমা বলিয়া আবার আমি কেমন করিয়া ডাকিব? ও মধুর নামে তাহাকে ডাকিতে আমার মুখ রহিল না। দাক্ষায়ণীকে আমাদের ঘরের সামগ্রী বলিতে আমার আর ভরসা কই?

"তাহাকে ডাকিতে গিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। কে যেন একটা কঠিন হাত দিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিল।

"শুনিয়াছি, বেদও যা, সত্যও তা। সেই বেদ আমাদের বংশের আদি। আমাদের জাতির জন্ম বেদে—সত্যে; তাই আমাদের উপাধি বৈদিক। সত্যেই আমাদের জাতির প্রতিষ্ঠা। সেই বৈদিকের ঘরে সত্যের মর্য্যাদা থাকিবে না, 'বাগ্‌দানের' প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইবে না, আমাদের এমন দুর্দ্দিন আসিবে, তা কি আমি জানি!

আমি তাহাকে বউমা বলিতে পারিলাম না, কাজেই কোনও কথা কহিতে পারিলাম না। দুঃখে ক্ষোভে আমার বুকটা যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

"কিন্তু আর কথা না কহিলে চলে না! সন্ধ্যা নিকট হইতেছে! চণ্ডীমণ্ডপে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণের হস্তে চিঠি দিয়া এখনি আমাকে ফিরিতে হইবে। জেঠাইমা উৎকণ্ঠার সহিত আমার ফিরিবার অপেক্ষা করিতেছেন। চিঠি পড়িয়া ব্রাহ্মণ কি উত্তর দেয়, জেঠাইমাকে বলিতেই হইবে।

"আমি বলিলাম—'আর কেন মা দাক্ষায়ণি ?'—নাম করিবামাত্র বালিকা মাথা তুলিল। আমার পানে চাহিল। দেখিলাম, এখনও তার শূন্যদৃষ্টি! বুঝিলাম, পুঁথি হইতে তাহার চোখ উঠিয়াছে বটে, মন কিন্তু এখনও উঠে নাই!

"এ শূন্যদৃষ্টির কারণ নির্ণয় করিয়াছি মনে করিয়া আমি আবার বলিলাম—'মা! অন্ধকারে পড়িলে চোখের ক্ষতি হইবে।'

"ইহার পূর্ব্বে দাক্ষায়ণী আমাকে যতবার দেখিয়াছে, ততবারই—বউ-মানুষ শ্বশুরকুলের গুরুজন দেখিলে যা' করে—সরম দেখাইতে গায়ে মাথায় কাপড় ঢাকিয়া, যত সত্বর পারে, চোখের আড়ালে চলিয়া গিয়াছে।

"আজ দুই দুইবার সে আমার কথা শুনিল, কিন্তু পূর্ব্বের মত পলাইল না। প্রথমে সে আঁচলটি উঠাইয়া কাঁধে ফেলিল। তার পর পুঁথি-জড়ানো কাপড়ে পুঁথিখানিকে সযত্নে বাঁধিতে লাগিল। আমি তাহার ভাব দেখিয়া কিছু অপ্রতিভের মত হইলাম।

তাহাকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম—'হাঁ মা! তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?' ঈষৎ হাসিয়া—ঈষৎ ঘাড় নাড়িয়া—দাক্ষায়ণী আমাকে বুঝাইল—'চিনি।'

"তার পর পুঁথিখানি কুলুঙ্গির উপরে রাখিয়া, একটি আসন লইয়া সে তাহা সেই সপের উপরই পাতিল, এবং আমাকে তার উপর বসিতে অনুরোধ করিল। বলিল—'বাবা স্নানে গিয়াছেন। তিনি যতক্ষণ না ফিরেন, আপনি এখানে বিশ্রাম করুন।'

"এতকাল তাহাদের বাড়ী আসিয়াছি, কিন্তু একটি দিনের জন্যও তার মুখের কথা শুনি নাই। আজ শুনিলাম। সরস্বতীর কৃপা কখন পাই নাই—এ জন্মে আর পাওয়া ঘটিবে না জানিয়া, মূর্খের যতটুকু শক্তি, প্রতি বৎসরের শ্রীপঞ্চমীতে এক একবার বোবা সরস্বতীরই পূজা করিয়াছি। তাই বুঝি আজ মা আমার প্রতি কৃপা করিলেন! সরস্বতী কথা কহিলেন। কথা কি মধুর! ইহজন্মে এমন মিষ্ট কথা শুনি নাই। রূপ—আগে দেখিয়াও দেখি নাই—এখন দেখিলাম! 'হা হতভাগ্য অঘোরদা'! এমন মেয়ের সঙ্গে তুমি ছেলের বিবাহ দিলে না! এমন সুশ্রী 'কনে' শুধু এ দেশে কেন, সারা বঙ্গের ভিতরে কি আর তুমি খুঁজিয়া পাইবে! পায়ে-পড়া এলো চুল, ময়ূরকণ্ঠী চেলিতে ঢাকা অঙ্গ, চাঁদমুখে চোক দুটা বসা'তে গিয়া বিধাতার হাতটা যেন কাঁপিয়া গিয়াছে! আজও পর্য্যন্ত যেন কম্প চক্ষুদুটিকে ছাড়িতে পারে নাই। আমি দেখিতে লাগিলাম। মুখ দেখিলাম, চোখ দেখিলাম—শাঁখার বরণ হাতখানিতে শাঁখা দেখিলাম,

—সবার শেষে দুইটি চরণ দেখিলাম। চরণ থেকে চোখ আর উঠিতে চাহিল না। ভিতর হইতে কেহ যদি কলসীখানেক জলের স্রোতে চোখ দু'টাতে আমার আঘাত না করিত—যদি না হঠাৎ আমি অন্ধের মত হইয়া যাইতাম, তাহা হইলে কতক্ষণ সে রাঙ্গা চরণ দেখিতাম, তার ঠিক কি ?

"মাদুর রাখিবার ছলায়, মনের ভাব চাপিয়া, আবার আমি কথা কহিলাম। একবার শুনিয়া তৃপ্তি পাই নাই, আবার তাহার কথা শুনিতে আমার ইচ্ছা হইল। আর ত আমি তার কথা শুনিতে পাইব না! সে মর্ম্মভেদী খবর দিবার পর, আবার কোন্ মুখে আমি সাভ্যোম-মহাশয়ের বাড়ীতে আসিব! দাদার আচরণে আমাদেরও পর্য্যন্ত মাথা হেঁট হইতে চলিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। যে কোন উপায়ে তার মুখের দু'একটা কথা শোনা চাই বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম—'তোমার বাবা কি দু'বেলা স্নান করেন ?'

'ত্রিসন্ধ্যায় তিনবার স্নান করেন।'

'তুমিও তাই কর নাকি ? তোমার এলোচুল দেখিয়া আমার তাই বোধ হইয়াছে।' 'আমি দুইবার করি।' 'কতদিন হইতে করিতেছ ?'

'প্রায় একমাস।' 'কোনও কি ব্রত লইয়াছ ?'

দাক্ষায়ণী উত্তর করিল না। তৎপরিবর্ত্তে সে আমার নিকটে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। আমি বুঝিলাম, সে এ কথার উত্তর দিবে না। আমি কিন্তু, সাভ্যোম-ম'শায়ের না আসা পর্য্যন্ত সময়টা মায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় কাটাইয়া দিব মনে করিয়াছি। সে প্রণাম

করিয়া দাঁড়াইতেই আবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'হাঁ মা ! আমি তোমাকে পুঁথিতে চোখ দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। তুমি কি পুঁথি পড়িতে শিখিয়াছ ?'

বালিকা মৃদু হাসিল—উত্তর করিল না।

আমি যেন একটু ক্ষোভের সহিত বলিলাম—'হাঁ মা, আমি মূর্খ জানিয়া কি তুমি আমার কথার উত্তর দিতেছ না ?'

প্রশ্ন করিতে না করিতে লজ্জায় ও সঙ্কোচে বালিকার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সোনার কমলে কে যেন চোখের পালটে জবার বরণ ঢালিয়া দিল।

ঠিক এমনি সময়ে বাড়ীর ভিতরে সন্ধ্যার শাঁথ বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরের দিক্ হইতে কে তাহাকে ডাকিল—'দাক্ষায়ণি !' দেখিলাম, সাভ্যোমের গৃহিণী পিছন হইতে একটি দীপ হাতে চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিতেছেন।

(২৯)

সার্ব্বভৌম-গৃহিণীর দর্শন-লাভের পর হইতে গণেশখুড়া যে সকল দৃষ্ট ঘটনার কথা আমাকে বলিয়াছে, আজিকালিকার বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠিত যুগে বর্ত্তমান ব্যাবহারিক সত্যের সঙ্গে সেগুলার সামঞ্জস্য করা যায় না ; এইজন্য সেগুলার বর্ণনা হইতে আমি যথাসম্ভব বিরত হইলাম।

তবে একটা কথা বলিবার প্রলোভন আমি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিলাম না। সেটি 'দাক্ষায়ণী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ব্রতের কথা। কহিলে অনেক শিক্ষিত-শিক্ষিতার কাছে ইহা অবিশ্বাস্য বোধ হইতে পারে।

এমন কি, হিন্দুর কুসংস্কার-দলনী বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যার সম্মুখে এরূপ একটা আজগুবি ব্রতের নামোল্লেখ তাঁহাদের অপ্রীতিকর হইতে পারে। তথাপি বলিব, হিন্দুর—বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দুর—অন্তরের পূর্ব্বকথার সঙ্গে সুর মিলাইয়া কথা কহিতে হইলে এরূপ ব্রতের কথাটা উত্থাপন করিবার লোভ সংবরণ করা যায় না।

এ দাক্ষায়ণী-সংবাদের শুধু যে শ্রোতাই আছেন, এমন ত নয়—অনেক শ্রোত্রীও গৃহকর্ম্ম করিতে করিতে বক্তার অলক্ষ্যে কান পাতিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিতার ভাগ অপেক্ষা অর্দ্ধ-শিক্ষিতার ভাগই অধিক। অর্দ্ধশিক্ষিতাই বা বলি কেন, তাঁহাদের মধ্যে পোনেরো আনাই পাই-কড়া-ক্রান্তি-শিক্ষিতা।

যিনি পূর্ণশিক্ষিতা, তাঁহাকে এ ব্রতের কথা শুনাইবার প্রয়োজন নাই। কেন না, তিনি নিজের চিত্তেই সম্যক্ বিশ্বাস-স্থাপন করিতে শিখেন নাই। কোন্ সাহসে পরের কথায় তাঁহার আস্থা-স্থাপন করাইব? এ কথা আমি বলিতেছি না। বলিয়াছেন যিনি, তিনি মহাকবি। তিনি সরলপ্রাণে স্বীকার করিয়াছেন—"বলবদপি শিক্ষিতানাং আত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ"—শিক্ষিত সকলকে বুঝাইতে পারেন; পারেন না কেবল নিজেকে। তিনি বলেন—"আমি জানি।" ইহার অর্থ, তিনি সমস্তই জানেন; কেবল তিনি জানেন না, এইটি তিনি জানেন না।

এ কথাও আমি কহিতেছি না। ঋষিগুরু তাঁহার শিষ্যকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ-দানকালে বলিয়াছিলেন—"যিনি বলেন, আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি, তুমি জানিবে, তিনি ব্রহ্মকে জানেন নাই।"

এই বিচিত্র উপদেশ শুনিয়া শিষ্য কিয়ৎক্ষণের জন্য গভীর চিন্তায় নিমগ্ন

হইল। চিন্তাতে উপদেশের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে মনে করিয়া যেই শিষ্য উত্তর করিল—"গুরুদেব! আমি বুঝিয়াছি," গুরু উত্তর করিলেন—"তাহা হইলেই তুমি বুঝ নাই।"

সুতরাং শিক্ষিতাকে এ ব্রতের কথা আমি বুঝাইবার ধৃষ্টতা করিতেছি না। আমি শুনাইতেছি তাহাদের, প্রতীচ্য শিক্ষার ক্ষীণাভাবে যাহাদের একূল ওকূল—দুকূল গিয়াছে। প্রতীচ্যশিক্ষা নিজের গুণগুলি কম্বলে ঢাকিয়া, নিছাঁক দোষটুকু যাহাদের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহারা শুধু চিঠি লিখিবার মত লিখিতে জানে, আর উপন্যাস পড়িবার মত পড়িতে জানে। আর জানে—কর্ম্মস্থল হইতে দিনান্তে গৃহপ্রত্যাগত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত্ত, অনর্থতপ্ত স্বামীকে ভোগবিলাসিতার আবেদন লইয়া উত্ত্যক্ত ও অবসন্ন করিতে। আর জানে—থাক্—সে মর্ম্মভেদী কথা কহিব না। আগে হইতেই কিঞ্জল্ক-কোমল দেহের পূতিগন্ধে বাঙ্গলার বায়ুমণ্ডল ভরিয়া গিয়াছে।

এই তথাকথিত শিক্ষিতা ও নিরক্ষরা লইয়াই বাঙ্গলার রমণী। তাহাদের তুলনায় সুশিক্ষিতার সংখ্যা এত অল্প যে, দশমিকে পরিণত করিলে, বিন্দুর পরের শূন্যগুলা কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত চলিয়া যায়।

পূর্ব্বে ইঁহাদেরই বঙ্গের গৃহলক্ষ্মী অভিধান ছিল। শান্তি নিত্য ইঁহাদের বসনাঞ্চলে বাঁধা থাকিত। সুখে ঔদাসীন্য, দুঃখে ভগবন্নির্ভরতা—সর্ব্ব-কালীন আনন্দের আভাবে ইঁহাদের অধিষ্ঠিত আশ্রম মর্ত্ত্যে দেবনিলয়ের প্রতিরূপ ছিল।

এখন ত্রিশঙ্কুর ন্যায় ইঁহারা উভয়লোক হইতে বিভ্রষ্ট হইয়াছেন। এই

সুশিক্ষিতা—দশমিকের অগণ্যশূন্যের পরে এক—তিনিই কেবল এই অদ্ভুত ব্রতের কথা শুনিয়া,—"যব গোধূলি সময় বেলি," মন্দির হইতে বিচিত্র যানারোহণে কলিকাতার রাজপথে বাহির হইয়া, কখন পতিপার্শ্বগতা, কখন বা একাকিনী, করধৃত অশ্ববল্গায় কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রার সারথ্যকে পরাভূত করিয়া, আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন; তিনিই কেবল—"নবজলধর বিজরীরেখা দ্বন্দ্ব পসারিয়া", বাঙ্গালীর কুললক্ষ্মীর ব্রতের উপর রহস্য ইঙ্গিত করিয়া, চলিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু সেই একের নিম্নের, কলিকাতা হইতে হিমালয়-পাদমূলপর্য্যন্ত প্রবাহিত অগণ্য "নয়"—সেই নবালোকগতা, কিন্তু বাস্তবিক ঘনতরতিমিরগ্রস্তা বাঙ্গালীর জাতীয়ত্বের জননী আমাদের মাতৃকুল? তাঁহারা বহুদিন হইতে এই প্রতীচ্যভাবসাগরের তীরে বসিয়া, কেবল লবণাক্ত তরঙ্গ-প্রহারেই পরিতৃপ্ত হইতেছেন; আজিও পর্য্যন্ত একটিও রত্ন তুলিতে পারেন নাই। লাভের মধ্যে তাঁহাদের সমাজ বিদ্যালয়ের প্রথম পাঠ্যপুস্তক ব্রতপূজা ভুলিয়াছে—সঙ্কল্পচ্যুত হইয়াছে! মহাফলানিবৃত্তির মন্ত্র আর তাঁহাদের মনে নাই। আজ একটু সাহস করিয়া তাঁহাদিগকে এই ব্রতের কথা শুনাইব।

এই অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া প্রচারিত উচ্চশিক্ষা তাঁহারা শিখেন নাই—আর শিখিবেন না। তাহার মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই—আর যে পারিবেন, তাহা বোধ হয় না। তখন তাঁহাদের যুগযুগান্ত হইতে বংশানুক্রমিক আগত সম্পত্তি হইতে তাঁহারা অকারণ অধিকারচ্যুত হন কেন?

দাক্ষায়ণী যে ব্রত লইয়াছিল, তাহার নাম—নারায়ণ-ব্রত। আমাদের দেশে এখনও হিন্দুমহিলাদের মধ্যে অনেক ব্রতের প্রচলন আছে। কিন্তু

নারায়ণ-ব্রতের প্রচলন নাই। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়েও ছিল না।

সার্ব্বভৌম মহাশয় দ্রাবিড়ে বেদশিক্ষাকালে সে স্থানের কুমারীগণকে এই ব্রত করিতে দেখিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্যাদি-লাভের উৎকট আকাঙ্ক্ষায় এ ব্রতের অনুষ্ঠান নয়। শুধু সংযমে অভ্যস্ত হওয়াই এ ব্রতের একরূপ উদ্দেশ্য ছিল।

তবে এ ব্রতের একটা বিশেষ লোভনীয় ফল ছিল। এ ব্রত-গ্রহণের ফলে কুমারীর নারায়ণ-তুল্য পতিলাভ হইত।

ব্রতের যে সমস্ত নিয়ম, তাহার সমস্ত এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যাহাকে এই ব্রত গ্রহণ করিতে হয়, তাহাকে এক পূর্ণিমা হইতে পর-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের যে সকল নিয়ম, সেইগুলি সযত্নে পালন করিতে হয়।

দাক্ষায়ণীও একমাস ধরিয়া সেই কঠোর নিয়ম পালন করিতেছিল। দাক্ষায়ণীকে সারাদিন উপবাসিনী থাকিতে হইত। দিবসে তিনবার, অন্ততঃ পক্ষে দুইবার স্নান করিতে হইত। সন্ধ্যার পর নিজহস্তে ভোগ রাঁধিয়া নারায়ণকে নিবেদনান্তে বালিকাকে প্রসাদ পাইতে হইত। যিনি এ ব্রতের পৌরোহিত্য করিতেন, তাঁহাকেও কুমারীর সঙ্গে উপবাসাদি ক্লেশ সহ্য করিতে হইত।

ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন নিয়ম বাক্-সংযম। একান্ত প্রয়োজনীয় কথা ভিন্ন সারাদিনের মধ্যে বালিকার বৃথা বাক্যালাপে অধিকার থাকিত না। হয় তাহাকে কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে, নয়, মৌনী থাকিতে হইবে।

দ্রাবিড়দেশেও কদাচিৎ কোন পিতা কন্যাকে এই কঠোর ব্রত ধারণ

করাইতেন। সাহসী তেজস্বী বাঙ্গালী সার্ব্বভৌম সেই ব্রত কন্যাকে গ্রহণ করাইয়াছেন। মৌনী হইয়া থাকা বালিকার পক্ষে সুবিধা হইবে না বুঝিয়া, তিনি তাহাকে শাস্ত্র পড়াইয়াছেন।

তবে অনেকগুলা শাস্ত্র পড়াইয়া কন্যার মনকে সন্দিগ্ধ করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। এই জন্য সর্ব্বশাস্ত্রসার গীতা তিনি দাক্ষায়ণীকে শিক্ষা দিয়াছেন। একমাস ধরিয়া এ কঠোর উপবাসাদি অন্যের সহ্য হইবে না বলিয়া, তিনি নিজেই কন্যার ব্রতের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়াছেন।

(৩০)

চিঠি লইয়া যেদিন গণেশ-খুড়া তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হয়, সে দিন দাক্ষায়ণীর ব্রতের একমাস পূর্ণ হইয়াছে। পরদিবস তাহার ব্রত-উদযাপন।

খুড়া বলিয়াছিল—"সাভ্যোম ম'শায়ের স্ত্রীকে দেখিবামাত্র আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তিনি যদি বিবাহ সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি উত্তর দিব? তাঁহার স্বামীকে পাইলেই আমি তাঁর হাতে চিঠি দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতাম, চিঠি দিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই পলাইয়া আসিতাম। তাঁহার কন্যা অথবা স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়, এটা আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ভাগ্যবশে তাহাদেরই সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হইল।

"কন্যার সঙ্গে সাক্ষাতের ভয়টা আমার কাটিয়াছে। ভয়ের পরিবর্ত্তে তাহাকে দেখার ফলে আমি একরাশ বেদনা বুকে পুরিয়াছি। এইবারে মা। তাঁহাকে দেখিবামাত্র চোক মুদিয়া আমি নারায়ণকে স্মরণ করিয়াছিলাম, ঠাকুর আমাকে আসন্ন সঙ্কট হইতে রক্ষা কর। ব্রাহ্মণ-কন্যার

সম্মুখে আমি ত মিথ্যা কহিতে পারিব না! বিবাহ সম্বন্ধে কিছু জানি কি না প্রশ্ন করিলে, আমি ত জানি না বলিতে পারিব না!

"কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ব্রাহ্মণকন্যা আমাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা দূরে থাক্, চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া আমার প্রতি দৃষ্টি পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করিলেন না।

"সে দিন এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছিলাম। কথায় তাহা বুঝাইতে ত পারিবই না। লাভের মধ্যে বুঝাইবার চেষ্টায় বুঝি সেই কতকাল আগে-দেখা ছবিখানির হাড়গোড় চূর্ণ করিয়া ফেলিব। সে কতদিনের কথা! তার পর দেশের অবস্থা, দেশের মানুষের অবস্থা, কোথা হইতে কি হইয়াছে! কিন্তু যতবারই সে দিনের কথা আমার মনে পড়ে, অমনি সে ছবি জ্বল্ জ্বল্ করিয়া আমার চোখের উপর ভাসিয়া উঠে। ব্রাহ্মণ হইয়াও আমি মূর্খ। মা ও মেয়ের সে দিনের ক্রিয়ার মর্ম্ম আজিও পর্য্যন্ত বিশেষ বুঝিতে পারি নাই।

"দেখিলাম, ব্রাহ্মণকন্যা দীপটি হস্তে লইয়া, বাড়ীর দিকের সিঁড়ি দিয়া, ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছেন। উঠিয়াই তিনি সবার উপরের সিঁড়িতে দাঁড়াইলেন। দেয়ালে মাথা দিয়া মণ্ডপকে একবার প্রণাম করিলেন। তার পর চৌকাঠে পা না দিয়াই বাহির হইতেই কন্যাকে ডাকিলেন— "দাক্ষায়ণি!" দাক্ষায়ণী উত্তর করিল—'মা!'

"উত্তর করিয়াই দাক্ষায়ণী দ্বারের সমীপে উপস্থিত হইল; এবং ভূমিষ্ঠা হইয়া দীপধারিণী মাকে প্রণাম করিল। প্রণামানন্তর হাঁটুতে ভর দিয়া, হাত দুটি যোড় করিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে আকাশে চাওয়ার মত মায়ের মুখের পানে চাহিল।

"বিচিত্র ব্যাপার! মা সেই দীপ দিয়া কন্যার আরতি করিল! আরতি-শেষে তিনি আর একবার কন্যার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। কন্যাও মা বলিয়া উত্তর দিল। মা এইবারে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গীতা?" কন্যা বলিল—'সুগীতা।'—উত্তর পাইয়া মা মণ্ডপেই প্রবেশ করিলেন, এবং হস্তস্থিত দীপ কন্যার হাতে প্রদান করিলেন।

"কন্যা সেই দীপ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং যে কুলুঙ্গিতে সে গীতার পুঁথি রাখিয়াছিল, সেইখানে যাইয়া দীপ ঘুরাইয়া পুঁথির আরতি করিল। আরতিশেষে স্তোত্র।

"সুর যেন কুলুঙ্গির ভিতরে পুঁথিখানিকে বেড়িয়া জমিয়াছিল। দাক্ষায়ণী হাতযোড় করিতেই যেন প্রেমানন্দে গলিয়া গেল—দাক্ষায়ণীর কণ্ঠে নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিল; আবার নাচিতে নাচিতে বালিকার কণ্ঠ হইতে পুঁথির গায়ে লাফাইয়া পড়িল।

"আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পাইয়াছে। আমিও দাক্ষায়ণীর সঙ্গে করযোড়ে দাঁড়াইয়াছি। বৈশাখ মাস—বাহিরে গাছে গাছে ঝড়ের শব্দ আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু মণ্ডপের বায়ু নিস্তব্ধ। নিস্তব্ধ হইয়া আমার সঙ্গে, দাক্ষায়ণীর মায়ের সঙ্গে—দীপের নিথর শিখার সঙ্গে বালিকার গীতাস্তোত্র শুনিতেছে। সুরটা উপরে নীচে ছুটাছুটি করিয়া পৃথিবী ও বৈকুণ্ঠকে যেন কোলাকুলি করাইতেছে।

"স্তোত্র-পাঠ শেষ করিয়া, দাক্ষায়ণী পুঁথিকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়াছিল। প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছিল—'গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।'

"সমস্ত শ্লোক বলিবার প্রয়োজন নাই। শ্লোকের এই কয়টি কথামাত্র

আমার মনে ছিল। শ্লোকপাঠান্তে যখন মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—'দাক্ষায়ণি! তুমি ইহাদের ভিতর কি হইবে?' দাক্ষায়ণী উত্তর করিয়াছিল—'পতিব্রতা।' মাতা এইবারে অঞ্চল হইতে ফুল লইয়া কন্যার মস্তক স্পর্শ করাইয়া আশী-র্ব্বাদ করিয়াছিলেন—'পতিব্রতা ভব।' কন্যা আবার মাতাকে প্রণাম করিয়াছিল; এবং মায়ের ইঙ্গিতে—অনাহূত ব্রাহ্মণ ভগবৎ-প্রেরিত জ্ঞানে—বালিকা ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকেও একটা প্রণাম করিয়াছিল।

"সর্ব্বশেষে সেই দীপ লইয়া দাক্ষায়ণী চণ্ডীমণ্ডপ হইতে উঠানে নামিল; এবং মাতৃদত্ত একটি ধুচুনির ভিতর দীপ রাখিয়া, ধীরে ধীরে মণ্ডপ-প্রাঙ্গণ পার হইয়া, কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল!"

এই গল্প আমার কাছে করিতে করিতে গণেশ-খুড়ার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইতে আমি দেখিয়াছি। খুড়া বলে—"অপূর্ব্ব নারায়ণ-ব্রতের ফলে দাক্ষায়ণীতে আমি লক্ষ্মীর রূপ দেখিয়াছিলাম। কড়ির শব্দ শুনিয়া-ছিলাম, পদ্মের আঘ্রাণ পাইয়াছিলাম। দাক্ষায়ণী চলিয়া গেলে যে সময় গ্রামের ঘরে ঘরে কুলদেবতার সন্ধ্যার আরতি বাজিয়া উঠিল, সেই সময়ে গোলমালের মধ্যে আমি লক্ষ্মীর জননী 'মা দুর্গাকে' সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়াছিলাম।"

কিন্তু আঘ্রাণ পাইয়া হইল কি? দাক্ষায়ণীর এ ব্রতধারণে কি লাভ হইল? বালিকা একমাস ধরিয়া দিবসের পর দিবস উপবাস-ক্লেশ ভোগ করিয়াছে—পিতাও কন্যার সঙ্গে সমানভাবে কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। কন্যা স দিন মুখে জলবিন্দুটি পর্য্যন্ত দিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণ-জায়া তাই দেখিয়া কোন্ প্রাণে নিজের মুখে অন্ন দিবেন? তিনিও পতি-পুত্রীর সঙ্গে একমাস ধরিয়া সমভাবে নিয়ম পালন করিয়াছেন।

কিন্তু তিন তিন জনের অনুষ্ঠিত এই কঠোর ব্রতের ফল কি হইল? ব্রত-উদযাপনের পূর্ব্বদিবসেই চিঠিতে যে ফল পূরিয়া, গণেশ-খুড়া ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর হস্তে উপহার প্রদান করিয়াছে, ব্রাহ্মণ সে সুপক্ক ফলের আঘ্রাণে কাঁপিয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী মূর্চ্ছিতার মত হইয়াছিলেন। গণেশ-খুড়া ব্রাহ্মণের হাতে পত্র দিয়াই পলাইয়া আসিবে মনে করিয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণীর অনুরোধে তাহাকে সে দিন ব্রাহ্মণের গৃহেই রাত্রি-যাপন করিতে হইল। দাক্ষায়ণীর ব্রতের নারায়ণ-প্রেরিত 'বামুন' হইয়া, তাহার আর বাড়ীতে ফিরিয়া আসা ঘটিল না।

দাক্ষায়ণী চিঠির কথা জানিতে পারে নাই। তাহার জননী যে প্রদীপ-হস্তে চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে সেই প্রদীপ লইয়া বাটীর বহির্ভাগস্থ এক অশ্বথ-বৃক্ষের তলে দিতে গিয়াছিল। নহিলে এ চিঠির মর্ম্ম সে বুদ্ধিমতী বালিকার অবিদিত থাকিত না।

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী কেহই তাহাকে সে কথা শুনান নাই; এবং দাক্ষায়ণীর মায়ের অনুরোধে সে রাত্রির মধ্যে চিঠি সম্বন্ধে আর কোন কথাও উত্থাপিত হয় নাই।

(৩১)

পরদিবসে সার্ব্বভৌমের গৃহে কতকগুলা দৈবঘটনা ঘটিল। তবে সেগুলা খুড়ার চোখের দৈবঘটনা। বিচারের পরিবীক্ষণ দিয়া আমাদের সেগুলাকে দেখিতে হইবে।

অত হাঙ্গাম করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া, আগে হইতেই সে সকলের উত্থাপন হইতে বিরত হইয়াছি। কেবল একটি কথা বলিব।

সেইটির সঙ্গে আমার ও এই আখ্যায়িকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রত্যূষে মায়ের সঙ্গে "কাশ্যপ" গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া, দাক্ষায়ণী একটি শিলা কুড়াইয়া পাইয়াছিল; এবং সেই দিবসেই এক জগন্নাথযাত্রী সন্ন্যাসী আসিয়া সার্ব্বভৌমের গৃহে অতিথি হইয়াছিল। সন্ন্যাসী সেই শিলার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া, নিজেই তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। প্রতিষ্ঠান্তে সেটি দাক্ষায়ণীকেই দান করিয়াছিল। সেই কমঠ-কঠোর শিলাটাই দাক্ষায়ণীর সহিত আমার মিলনপথে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে।

ব্রত-উদ্‌যাপনের দিন অপরাহ্নে ব্রাহ্মণ-গৃহ হইতে গণেশ-খুড়ার বিদায়-গ্রহণের পূর্ব্বে তাহার সহিত দাক্ষায়ণীর মায়ের যে কথা হইয়াছিল, তাহা হইতেই তাঁহার মহত্ত্ব আমরা যথেষ্ট বুঝিতে পারিব। আমি তাহা খুড়ার কথাতেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

ব্রত-উদ্‌যাপনের উল্লাসের মধ্যেও ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর দারুণ মনোদুঃখ বুঝিয়া, খুড়া নিজের দুঃখে অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। বিদায়গ্রহণের সময় খুড়া করযোড়ে ব্রাহ্মণীকে বলিয়াছিল—"মা! আমার অপরাধ লইয়ো না।"

ব্রাহ্মণী বলিলেন—"তুমি সঙ্কুচিত হইতেছ কেন গণেশ! তোমার আবার অপরাধ কি? বরং তুমি আগে হইতে এ সংবাদ দিয়া আমাদের ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছ।"

"জেঠাইমার একান্ত অনুরোধে আমি আসিয়াছি।"

"তিনি সাধ্বী। তাঁহার গুণ আমি এক মুখে বলিতে পারি না। তাঁহার দয়া আমি ইহজন্মে ভুলিব না।"

"অঘোর দা'র কেন এমন মতিচ্ছন্ন হইল?"

"কিছু না। তাহারই বা মতিচ্ছন্ন হইবে কেন? সে যেমন শিক্ষা পাইয়াছে, সেইরূপই কাজ করিয়াছে। মতিচ্ছন্ন হইয়াছিল আমার। আমি আমার দেবতা স্বামীর নিষেধ না মানিয়া, এক অন্যপূর্ব্বার পুত্রকে কন্যাদানে ইচ্ছা করিয়াছিলাম।"

আমাদের কুলীন-সমাজে সে সময় অন্য-পূর্ব্বার গর্ভজাত সন্তানের প্রতিষ্ঠা ছিল না। শুধু পিতামহের লোকপ্রিয়তায় এবং সার্ব্বভৌমের কন্যাদানের সাহসিকতায় সমাজে আমাদের অবস্থা হীন হয় নাই।

প্রথমে ব্রাহ্মণের আমাকে কন্যাদানে আদৌ ইচ্ছা ছিল না। পত্নীর একান্ত অনুরোধে তিনি আমাকে কন্যার বাগ্‌দান করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণী বলিতে লাগিলেন—"গণেশ! ক্ষুদ্রবুদ্ধি রমণী আমি। শুদ্ধমাত্র কন্যার প্রতি মমতাবশে আমার নারায়ণতুল্য স্বামীকে লোকবিগর্হিত কাজ করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। এ ফল ত আমার ন্যায্য প্রাপ্য। আমার আত্মীয়স্বজন সকলেই এ কাজ করিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছিল। মমতাতে অন্ধ হইয়া আমি কাহারও কথায় কান দিই নাই।"

"কন্যার জন্য আর কি ভাল পাত্র পাও নাই মা?"

"ঢের। সার্ব্বভৌমের কন্যা, তার কখন কি সুপাত্রের অভাব হইত।"

"সুপাত্র থাকিতে এরূপ ঘরে কন্যা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া কাজ ভাল কর নাই।"

"বহুকালের শিবারাধনার ফলে আমার পরিব্রাজক স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়াছিলাম। ওঁর যে মনের অবস্থা, তাহাতে উনি কখন্ ঘরে আছেন, কখন্ নাই। আমার ধারণা ছিল, কন্যার বিবাহের পর আর উনি গৃহে থাকিবেন না। তাইতে মনে করিয়াছিলাম, কি জান গণেশ, দাক্ষায়ণীকে

এমন জায়গায় বিবাহ দিব, যাহাতে আমার বোধ হইবে, সে যেন আমার চোখের উপরেই রহিয়াছে। যখন মনে করিব, তখনি খবর লইতে পারিব। ইচ্ছা করিলে দেখিয়া আসিতে পারিব। তাহার উপর বুঝিয়াছিলাম, শিরোমণি যথেষ্ট পয়সা উপায় করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রও রত্ন, সেও যথেষ্ট উপার্জ্জন করিবে। পুত্রবধূর খাওয়া-পরার দুঃখ থাকিবে না।"

"তার উপর তোমার ওই সবে একমাত্র কন্যা। আর দুটো একটা থাকিলে ভবিষ্যতে তাহাদের বিবাহ লইয়া গোল হইবার সম্ভাবনা থাকিত।"

"শিরোমণির পৌত্রকে দাক্ষায়ণী-দানের সেটাও একটা কারণ।"

"তা হ'লে তুমি ত কোনও দোষ করনি মা!"

"দোষ করিনি, বল্‌ছ কি গণেশ—পাপ করেছি। পাপ—মহাপাপ! সুখদুঃখে সমজ্ঞান মহাপুরুষ আজ আমারই জন্য জীবনে প্রথম বিচলিত হইয়াছেন। যাহা কখন তাঁহাকে দেখি নাই, দেখিবার প্রত্যাশা করি নাই—আজ তাঁহাতে তাই দেখিয়াছি! আজ নিদারুণ মনস্তাপে আমার ঠাকুরের চোখে জল পড়িয়াছে—ক্রোধে শরীর কাঁপিয়াছে!

দুঃখ ও ক্রোধের মধ্য দিয়া নিত্যই আমাদের জীবন চলা-ফেরা করিতেছে। জীবনের এইরূপ মরণে আমরা নিত্য অভ্যস্ত। চপল-চিত্তের সুখদুঃখ ঋষিগণের চক্ষে ক্লেশের মধ্যেই গণ্য হইয়াছে। সংযমীর চিত্তবিক্ষোভ যে কি বিষম বস্তু, তাহা আমরা কেমন করিয়া বুঝিব? গণেশ-খুড়াও সে ক্রোধের মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই। খুড়া আমাকে বলিয়াছিল—"হরিহর! ক্রোধটা একটা সামান্য মনের উচ্ছ্বাস বলিয়াই

আমার জানা ছিল। আমি দিনের মধ্যে দশবার শান্ত হইতাম। ক্রোধ হইলে মুখ হইতে দু'পাঁচটা অসঙ্গত কথাও যে বাহির না হইত, এমন নয়। ক্রোধের মুখে সময়ে সময়ে দু'একজনকে দুই চারিটা অভিশাপও দিয়াছি। কিন্তু যাহাকে বলিয়াছি—'তোর মৃত্যু সন্নিকট'—সে যেন চারিগুণ সুস্থ ও সবল হইয়া বাঁচিয়া আছে। যাহাকে নির্ব্বংশ হইবার শাপ দিয়াছি, তার বংশ চারগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।"

সার্ভোম-ম'শায়ের ক্রোধ এইরকম একটা কিছু হইবে মনে করিয়া, খুড়া সান্ত্বনার ছলে তাঁহার পত্নীকে কি দুই একটা কথা বলিয়াছিল। তাহার কথা শুনিয়া তিনি ঈষৎ কুপিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"মূর্খ! মনে করিতেছ কি! এ কি তোমার আমার ক্রোধ যে, তাহার যা কিছু শক্তি শুধু আমাদের দেহমনের উপর অনিষ্ট করিয়াই মিলাইয়া যাইবে!"

গণেশ-খুড়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"তবে কি ?"

"এ সংযমীর ক্রোধ! এ ক্রোধ অকারণ অথবা তুচ্ছ কারণে হয় না। কিন্তু যখন হয়, তখন যাহার জন্য এ ক্রোধের উৎপত্তি, তাহার অনিষ্ট না হইয়া যায় না। সে হতভাগ্য যদি পলাইয়া গড়ের ভিতরে আশ্রয় লয়, এ আগুন সেখানে গিয়াও তাহাকে দগ্ধ করিবে! সাগরে ডুবিলে জলভেদ করিয়া তাহাকে ছাই করিয়া দিবে।"

"তবে ত অঘোর দা'র সর্ব্বনাশ হইল, দেখিতেছি!"

"হইতে দিই নাই। হইবার মুখে নারায়ণের কৃপায় আমি প্রতিবন্ধক হইয়াছি। গণেশ! তুমি গত রাত্রিতে ঠাকুরের মূর্ত্তি দেখ নাই। দেখিলে —আমার বিশ্বাস, মূর্চ্ছিত হইতে। নরাধম অসত্যবাদীর শাস্তি হওয়াই

উচিত ছিল। ব্রাহ্মণের মুখ হইতে কথা বাহির হইবার সময়ে আমি মুখে হাত দিয়া তাহা রোধ করিয়াছি। তাঁহাকে স্নান করাইয়া আবার শান্ত করিয়াছি।"

এই বলিয়া সার্ব্বভৌম-গৃহিনী গণেশ-খুড়াকে সত্য সম্বন্ধে কতকগুলা উপদেশ দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—"কলিতে একমাত্র তপস্যা সত্য। ব্রাহ্মণ শৈশবাবধি সেই তপস্যাই করিয়াছেন। দ্বাদশ বৎসর যে নিরবচ্ছিন্ন সত্য কহিয়াছে, সেই বাক্‌সিদ্ধ হয়। যিনি পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর একটি মুহূর্ত্তের জন্যও মিথ্যা কহেন নাই, তাঁহার মুখ হইতে অভিসম্পাতের কয়েকটি অক্ষর বাহির হইতে না হইতে হতভাগ্য অসত্যবাদী সবংশে দগ্ধ হইয়া যাইত।"

আমরা এ কথা বিশ্বাস করি আর নাই করি, মূর্খ গণেশ, ব্রাহ্মণকন্যার এ কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিল। মূর্খ হইলেও কিন্তু খুড়ার বুদ্ধি ছিল। খুড়া বুঝিল, সার্ভ্যোম ম'শায়ের মুখ হইতে অভিশাপ বাহির না হউক, তাঁর ভিতরে ক্রোধ ত হইয়াছে! আর ক্রোধ যখন হইয়াছে, তখন আমাদের অনিষ্ট না হইবে কেন? খুড়া সেই সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করিল। ক্রোধ যে হয় নাই, এ কথা তিনি অস্বীকার করিতে পারিলেন না। আর এই ক্রোধ যদি আমাদেরই উপর প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে কাহারও যে অনিষ্ট না হইবে, এ কথা তিনি বলিতে পারিলেন না।

গণেশ-খুড়া চিন্তিত হইল। বলিল—"তা হ'লে মা, হতভাগ্য ব্রাহ্মণ-পরিবারের রক্ষার উপায়?"

তিনি উত্তর করিলেন—"আমি ত স্বামীর মনের অবস্থা জানি না। তিনি চিরদিনই অতি ধীর। একটা কন্যার মোহে তিনি যে এক মুহূর্ত্তের

ক্রোধে এতকালের অর্জ্জিত তপস্যার ফল নষ্ট করিবেন, এটা আমার বোধ হয় না। তবে অসত্যের উপর যে ক্রোধের ভাব, তাহাতে সত্যাশ্রয়ীর তপস্যার হানি হয় না। যদি কোনও উপায়ে হতভাগ্যের পুত্রের হাতে দাক্ষায়ণীর হাতটা অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের জন্যও রক্ষা করা যায়, তাহা হইলেই ব্রাহ্মণের সত্যরক্ষার উপায় হইতে পারে। শিরোমণির বংশ ব্রহ্ম-কোপানল হইতে রক্ষা পাইতে পারে।"

গণেশ-খুড়া আমাকে বলিয়াছিল—"হরিহর! সেই দিন সেই মুহূর্ত্তেই তোমাকে ও জেঠাইমাকে স্মরণ করিয়া, মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, যেমন করিয়া পারি, আমি তোমাকে চুরি করিয়া আনিব। আনিয়া তোমার হাতে দাক্ষায়ণীর হাত সমর্পণ করিব।"

তাই খুড়া চোরের মত আমাদের হুগলীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু খুড়া নিজে, সঙ্কল্প-সিদ্ধি করিতে পারে নাই। তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল, আমাদের ঝি। খুড়া দৈবসুযোগে ঝির সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকেই সঙ্গোপনে মনের কথা বলিয়াছিল, এবং ঝিয়ের কৃপাতেই সে যাত্রা আমরা "ব্রহ্মকোপানল" হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম। ঝিয়ের কৃপাতেই দাক্ষায়ণীর হাত আমার হাতের উপর সমর্পিত হইয়াছিল।

সার্ব্বভৌম-পত্নীকে আশ্বস্ত করিয়া গণেশখুড়া সেই দিন অপরাহ্নে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

(৩২)

এত করিয়াও গণেশখুড়া কিন্তু পিতামহীর গৃহত্যাগ রক্ষা করিতে পারে নাই। আমাদের গ্রামের মধ্যে এক জনও ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে নাই,

ঠাকুর মা আর আমাদের ঘরের অন্নজল গ্রহণ করিবেন না। হুগলী হইতে চলিয়া আসিবার পর যে কয়দিন তিনি ঘরে ছিলেন, সেই কয়দিনই তিনি গোবিন্দ-ঠাকুরদার বাড়ীতে স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিয়াছেন। সন্দেহ করিবার সমস্ত কারণ থাকিতেও সরলচিত্ত ব্রাহ্মণ, পিতামহীর এই আচরণ তাঁহার দেবরের প্রতি অহেতুকী প্রীতির একটা নিদর্শন অনুমান করিয়া, পরমানন্দই অনুভব করিতেছিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রবধূগণ অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া, তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়া খাওয়াইলেও তিনি তাহাতে সহধর্ম্মিণীর হস্তের মিষ্টতা অনুভব করিতেন না। সেই মত মিষ্ট হাত ছিল আমার পিতামহীর। সুতরাং ভ্রাতৃজায়ার-তাঁহার গৃহে আহারে গোবিন্দ-ঠাকুরদা'র একটা স্বার্থ ছিল। সেই স্বার্থবশে পিতামহীর অভিসন্ধি বুঝিতে তাঁহার অবকাশই ছিল না।

এই কয়দিন গণেশ-খুড়ার স্ত্রী আমাদের কুলদেবতার ভোগ রাঁধিত। কেবল পাকস্পর্শ উৎসবের পরদিনে দাক্ষায়ণীর উপর ভোগরন্ধনের ভার পড়িয়াছিল। পিতামহী সেই দিন বাড়ীতে আহার করিয়াছিলেন। পৌত্র-বধূর প্রস্তুত অন্ন দেবতাকে নিবেদন করাইয়া, নিজে প্রসাদ পাইয়াছিলেন। কেন, তখন কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই। বাড়ীর একজনও বধূর হাতের অন্ন না খাইলে, অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয় বলিয়া, তিনি আহার করিয়াছিলেন, অথবা সম্পর্কত্যাগের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পরগৃহে ভিখারিণীর মত একদিনের জন্য ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজিও পর্য্যন্ত তাহা অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

অন্নগ্রহণের রাত্রিতেই তিনি পৌত্রবধূকে লইয়া গৃহত্যাগ করেন।

সেদিন গণেশখুড়া, স্ত্রী ও পুত্রকন্যা লইয়া, ঠান্‌দিদির কি একটা অসুখ উপলক্ষ বাড়ীতে গিয়াছিল। সুযোগ যেন বিধাতা কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়া পিতামহীর গৃহত্যাগের সহায়তা করিয়াছিল।

হুগলীতে বকুলবৃক্ষের তলদেশে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, আমাদের গ্রামের মধ্যে কাহারও সে কথা শুনিতে বাকী ছিল না। যদিও পিতামহী অথবা গণেশ-খুড়া আমার বিবাহ দেখে নাই, তথাপি ঘটনায় কেহই অবিশ্বাস করে নাই। এক ঝিয়ের সাক্ষ্যতেই আমাকে সার্ব্বভৌমমহাশয়ের কন্যা-সম্প্রদান—গ্রামের ব্রাহ্মণ, শূদ্র, স্ত্রীপুরুষ, এমন কি, দেশের জমীদার পর্য্যন্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা একবাক্যে দাক্ষায়ণীকে আমার বধূ বলিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছিল। তবে ঠাকুরমা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন কেন? হুগলীতে পিতৃ-কর্তৃক পিতামহীর অপমান-কথা, গ্রামবাসীদের মধ্যে কেহই শুনে নাই। সার্ব্বভৌম ত এ কথা কাহাকেও বলিলেন না। গণেশ-খুড়াও এ কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করে নাই। গ্রামের লোকে ঠাকুরমার জন্য দুঃখিত। অনেকেই—বিশেষতঃ গোবিন্দ-ঠাকুরদা মর্ম্মাহত। কিন্তু কেহই তাঁহার চলিয়া যাইবার কারণ নির্ণয় করিতে পারে নাই। পিতামহীর মত শান্তপ্রকৃতি স্ত্রীলোক গ্রামের মধ্যে আর ছিল না; কেহ কখন তাঁহাকে রাগিতে দেখে নাই। আমিও দেখি নাই। পিতামহের মৃত্যুর পর মা তাঁকে দিন কয়েক বড়ই উত্যক্ত করিয়াছিলেন। পিতামহী তাহাতে বিরক্ত হইয়াছিলেন মাত্র—ক্রুদ্ধ হন নাই। কারণ জানিতাম, পিতা ও আমি। কিন্তু সে কথা কাহাকেও ফুকারিয়া বলিবার উপায় ছিল না। কাজেই সকলের পক্ষে সেটা একটা রহস্যেরই বিষয় হইয়াছিল।

শুনিয়াছি, ঠাকুরমা বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই, পৌত্রবধূর হাত ধরিয়া ও ঝিকে সঙ্গে লইয়া তাহার পিত্রালয়ে উপস্থিত হন, এবং ব্রাহ্মণদম্পতীর কাছে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া, দাক্ষায়ণীকে তাহাদের কাছে রাখিতে অনুরোধ করেন।

দাক্ষায়ণীর মা তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়াছিলেন—"মা! অবোধ পুত্রের উপর অভিমান করিয়া গৃহত্যাগ করিয়ো না।"

তার পর যখন তিনি বুঝিলেন, শুদ্ধমাত্র অভিমানে নয়, তাঁহার নিজের ও পুত্রের—উভয়েরই মঙ্গলের জন্যও তিনি গৃহত্যাগ-সঙ্কল্প করিয়াছেন, এবং আদর্শচরিত্র ব্রাহ্মণের সত্যনিষ্ঠাই তাঁহাকে সঙ্কল্পানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত করাইয়াছে, তখন আর তিনি পিতামহীকে নিষেধ করেন নাই; কন্যাকেও গ্রহণ করেন নাই। সুখে দুঃখে পিতামহীর সহচরী থাকিতে উপদেশ দিয়া, তিনি দাক্ষায়ণীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। পিতামহী কোথায় থাকিবেন, কত দিনের জন্য থাকিবেন, আর কন্যাকে দেখিতে পাইবেন কি না, এ কথা পর্য্যন্ত তিনি জিজ্ঞাসা করেন নাই।

কিন্তু দশমবর্ষীয়া বালিকা—মায়ের অঞ্চলের নিধি,—ষড়্‌দর্শনজ্ঞ সার্ব্বভৌমের একমাত্র দর্শনীয় বস্তু, আত্মীয়স্বজনের একান্ত প্রিয়পাত্রী—দাক্ষায়ণী অম্লানবদনে কেমন করিয়া এই নব আত্মীয়ার অনুসরণ করিল, তাহা মনে করিতে গেলেও সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

যাই হ'ক, তাহারা চলিয়া গিয়াছে। সে চলার ভালমন্দ বিচার করিবার আমাদের সকলের অধিকার থাকিলেও বিচার করিয়া কোনও ফল নাই। দেশের লোকের মধ্যে অনেকেই নির্ম্মমভাবে আমার পিতামহীচরিত্রের

সমালোচনা করিয়াছেন। অনেকেই বলিয়াছেন, পুত্র-পুত্রবধূর উপর অভিমান করিয়া, এরূপ অনাথিনীর মত তাঁহার গৃহত্যাগ বিজ্ঞার কার্য্য হয় নাই। ইহাতে বংশের সম্ভ্রম-হানি হইয়াছে। বিশেষতঃ একটি ক্ষুদ্র বালিকাকে তাহার মাতা ও পিতার মমতা-পাশ ছিন্ন করিয়া, অজ্ঞাতবাসে লইয়া যাইতে তাঁহার অধিকার কি? তাঁহার অভিমান তাঁহার সঙ্গে যাক্। একটা শিশুকে সে জন্য সঙ্গে লইয়া অনাচ্ছাদনে অপরিচিত স্থানে অনশনে মারিয়া ফেলা কেন?

কিন্তু সমালোচনায় কোন ফল হয় নাই। তাঁহাদের কথার যিনি উত্তর দিতে সমর্থ, কোথায় আমার সেই, আজি নির্ম্মম, কিন্তু পূর্ব্বের কেবল মমতাময়ী পিতামহী? গ্রামে আসিয়া একমাস আমি তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। শুধু আমি কেন—বাবা, এমন কি, মা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন! গ্রামবাসীরাও বসিয়া আছে। কোথায় আমার ঠাকুরমা? গোবিন্দ-ঠাকুরদা প্রভাত হইলেই আমাদের গৃহে আসিয়া ঘুমন্ত পিতাকে ডাক দেন—"অঘোরনাথ!" ডাকিয়া তুলিয়া কত কি কথা চুপি চুপি কহিয়া আবার তিনি চলিয়া যান। গণেশ-খুড়া একবার করিয়া অনুসন্ধানে বাড়ী হইতে চলিয়া যায়, দু'চার দিন বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া এ গ্রাম সে গ্রাম অনুসন্ধান করিয়া, আবার ফিরিয়া আসে। আসিয়াই বাটীর বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া মুক্তকণ্ঠে ডাকিয়া উঠে—"জেঠাইমা! আসিয়াছ?" পিতামহীর গৃহত্যাগের পূর্ব্বক্ষণে সেই যে তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা চলিয়া গিয়াছে, তাহারা আর আমাদের গৃহে ফিরিয়া আসে নাই। আমরা সকলে মিলিয়া তাহাদের আনিতে খুড়াকে অনুরোধ করিয়াছি। খুড়া অনুরোধ রাখে নাই। এক একবার তাহার মা আসেন। কিন্তু

তিনিও পিতামহীর অন্তর্দ্ধানে কেমন হতভম্ব হইয়া গিয়াছেন। আগে মূর্খ পুত্রের কল্যাণ-লোভে তিনি মাতার পক্ষাবলম্বিনী হইয়া অন্তরালে পিতামহীর কত নিন্দা করিয়াছেন। এখন পুত্র-পৌত্রাদির অকল্যাণ-ভয়ে কোনও কথা কহেন না।

একজন কেবল—কখন মা,কখন পিতার কাছে—মাঝে মাঝে অসংবদ্ধ প্রলাপ বলিয়া, তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিত। সে সেই বৈকুণ্ঠ পণ্ডিত। তাহার মূর্খতা শেষে পিতার এমন অসহ্য হইয়া পড়িল যে, তিনি একদিন তাহাকে স্পষ্টতঃই বাড়ীতে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তথাপি পণ্ডিত আসিত, এবং মতামত প্রকাশ করা সুবিধা নয় বুঝিয়া চুপ করিয়া থাকিত এবং অনেক সময়ে পিতার ইতস্ততঃ গমনে সহচরের কার্য্য করিত। আমাকে পূর্ব্বে পড়াইত বলিয়া পিতা তাহাকে একটা মাসোহারা-দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার দ্বারা অন্য উপকার না হউক, বৈকুণ্ঠ পণ্ডিত না থাকিলে, পিতাকে অনেক সময়ে সঙ্গিহীন থাকিতে হইত। সে বয়সে আমার যতটুকু বুঝিবার শক্তি ছিল, তাহাতেই অনুমান করিয়াছিলাম, অন্তর্যাতনার অতিপীড়নে তাঁহার গৃহ-প্রবাসের দিনগুলা তাঁহার জীবনকে নিষ্পীড়ন করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে।

মায়েরও সঙ্গিনীর অভাব হইয়াছে। আমার কাছেও বাল্যসঙ্গীরা বড় আসে না। আসিবার মধ্যে মাঝে মাঝে আসে রামপদ। কিন্তু সেও পূর্ব্বের মত আমার সঙ্গে আর মাখামাখির মত মিশে না। এই একটা বৎসরের বিদেশ-বাস আমাদের ও প্রতিবেশীদিগের পরস্পরের ভাব-বিনিময়ের মধ্যে যেন একটা বাঁধের মত প্রতিবন্ধক হইয়াছে।

আমাদের গ্রাম আর ভাল লাগিতেছে না, ঘরও ভাল লাগিতেছে না।

হুগলীতে এক বৎসর বিলাসিতায় অভ্যস্ত হইয়া অনাড়ম্বরময় গ্রাম্য জীবনও কেমন যেন আমাদের বিসদৃশ বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ পিতামহীর অনাগমনে পিতা ও মাতা উভয়েই সর্ব্বদা অপরাধীর ন্যায় সঙ্কুচিতভাবে অবস্থিতি করিতেছেন বলিয়া, বাড়ী যেন ক্রমে তাঁহাদের পক্ষে কারাগারের মত যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছে।

এক, দুই, তিন—দেখিতে দেখিতে মাসের সব ক'টা দিন শেষ হইতে চলিল—পিতার ছুটী ফুরাইয়া আসিল। গণেশখুড়া ইহার মধ্যে তিন চারিবার গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ঘুরিয়া আসিয়াছে—পিতামহীর কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। অগত্যা আমাদের সঙ্গে লইয়া পিতাকে আবার চাকরীর জন্য গ্রাম পরিত্যাগ করিতে হইল।

বিষয় সম্বন্ধে কি করা হইল, আমার জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে পিতামহীর অন্বেষণ সম্বন্ধে পিতা যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা আমি জানিয়াছিলাম। পিতা এই কার্য্যে গণেশ-খুড়াকেই নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গোবিন্দঠাকুরদা ও গ্রামের আরও দুই চারি জন বিজ্ঞের মতে গণেশ-খুড়াই এ অন্বেষণ-কার্য্যে একমাত্র উপযোগী স্থির হইয়াছিল।

পিতার নিকট হইতে উপযুক্ত পাথেয় লইয়া, আমাদের গ্রামত্যাগের সপ্তাহ পূর্ব্বে খুড়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণের জন্য গৃহ হইতে বাহির হইল। খুড়া যতদিন না ফিরিবে, স্থির হইল, ঠান্‌দিদি—বধূ ও পৌত্রপৌত্রী লইয়া আমাদের গৃহেই অবস্থান করিবেন এবং গোবিন্দ-ঠাকুরদা নিজেই দুই বেলা তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবেন। তিনি আমাদিগের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ পরিত্যাগের যে একটা দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, পিতার সাগ্রহ অনুরোধে তিনি:তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধ সদানন্দ তাহাদের প্রহরিত্বের ভার লইয়া রহিল।

গৃহত্যাগের পূর্ব্বক্ষণে আমার মাতা জীবনে সর্ব্বপ্রথম বৃদ্ধ পিতামহীর অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। বুঝিতে পারিলেন, দেশের সম্পত্তি বজায় রাখিতে হইলে ও বাড়ীঘরগুলিকে অকালধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে হইলে, শ্বাশুড়ীজাতীয়া একটা মিনিমাহিনার দাসী ঘরে রাখিয়া যাইবার প্রয়োজন। চাকরীর জন্য স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া যাঁহাদের বিদেশে থাকিতে হয়, এখনও পর্য্যন্ত তাঁহারা এরূপ পরিচারিকার প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। এখনও বাংলার ঘনবনাকীর্ণ অনেক পল্লীগৃহে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইবে, এইরূপ এক একটা বুড়ী চাকরীর জন্য বিদেশে অবস্থিত পুত্রপৌত্রাদির মঙ্গল-কামনায় সযত্নে বাস্তু-দেবতাকে বুকে লইয়া, যুগযুগান্তর হইতে তপস্যা-রতার ন্যায় সুস্থদেহ প্রিয়জনের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। আজিও পর্য্যন্ত গ্রামশ্রী-নাশী ক্ষুধার্ত্ত মহামারী এরূপ গৃহের গোময়জলনিষিক্ত দ্বারের চৌকাঠ পার হইতে পারে নাই। গ্রাম উজাড় হইয়াছে, কিন্তু তুলসীতলায় নিত্য সন্ধ্যা দিতে বুড়ী এখনও বাঁচিয়া আছে। সেই জন্যই বুঝি, আজ পিতামহীর উদ্দেশে তাঁহার চক্ষু হইতে সর্ব্বপ্রথম অশ্রু নিপতিত হইতে দেখিলাম। পিতার মুখেও আজ সর্ব্বপ্রথম আক্ষেপ-বাক্য বহির্গত হইতে শুনিলাম। গঙ্গাতীরে শালতীতে পা দিতে সেই আর একদিনের সন্ধ্যার কথা তাঁহার মনে হইল। সে দিন বিদায়দানে অনিচ্ছুক সহৃদয় গ্রাম্য নরনারীতে গঙ্গার ঘাট পূর্ণ ছিল। আজ একান্ত অহুগত দুই একজন ব্যতীত তাহাদের মধ্যে কেহ নাই। পিতার যাত্রার বিঘ্ন-উৎসারণ ফুল লইয়া ব্যাকুলতার সহিত আগত সে সার্ব্বভৌম নাই। মন্থরগামিনী-নদীকূলের সে কল্যাণময়ী নৃত্যশীলা শ্যামার আশীষ সঙ্গীতের ইঙ্গিত নাই।

সে ভাব যেন মরুপ্রান্তরের উত্তপ্ত বালুকাস্তূপে সমাহিত হইয়াছে। প্রাণ-দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া মরণের অধিক বিভীষিকা দেখাইতেছে।

কিন্তু সে সময় নিকটে থাকিয়াও যে সার্ব্বভৌম পিতার দৃষ্টি-সম্মুখে অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে নাই, আজ উপস্থিত না থাকিয়াও সে যেন দিব্য কান্তিতে তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইল। শালতীতে উঠিয়াই নদীর ক্ষীণ স্রোতে একবার করস্পর্শ করিয়া পিতা বলিলেন—"সার্ব্বভৌম! সেবারে যথার্থই অতি অশুভক্ষণে গৃহ হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম। তুমি জানিয়া পরমাত্মীয়ের প্রাণ লইয়া, আমাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছিলে। তোমার সেই অশুভ-নিরাকরণের নির্ম্মাল্য উজান-স্রোতে আর একবার আমার হাতে আনিয়া দাও। মর্ম্ম না বুঝিয়া দম্ভে আমি তাহা জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। ফলে অশুভযাত্রার মুখেই আমি মাতৃরত্ন হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।"

ফুল আর উজান আসিল না। তৎপরিবর্ত্তে সার্ব্বভৌমের উদ্যান-মধ্যস্থ অশ্বত্থের মাথা হইতে পেচকদম্পতি টিটকারীর অভিনন্দনে গমনপথে আমাদিগকে পুণ্য জন্মভূমি হইতে বিদায় দিল। বুঝি এই অশ্বত্থের তলেই দাক্ষায়ণী পাতিব্রত্যব্রত-পালনে একমাস ধরিয়া দীপদান করিয়াছিল।

(৩৩)

একটা শালতী একজনে না লইলে শয়নের সুবিধা হয় না বলিয়া, পিতা দুইটি শালতী ভাড়া করিয়াছিলেন। তার একটাতে উঠিয়াছিলেন তিনি, অপরটাতে আমরা—মাতা ও পুত্র—আরোহণ করিয়াছিলাম। মাস জ্যৈষ্ঠ অথবা আষাঢ়ের প্রথম। কেননা, বেশ স্মরণ আছে, শালতীতে

উঠিবার সময় ভৃত্য সদানন্দ কতকগুলা পাকা আম ঝুড়িতে আনিয়া, বাবার শালতীতে উঠাইয়া দিয়াছিল। সেগুলার সদ্ব্যবহার আমার কাছেই হইবে বুঝিয়া, তিনি আবার সেগুলা আমাদের শালতীতে পাঠাইয়াছিলেন। আমার বক্ষ্যমাণ জাগরণ-কথার সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ থাকা বিশেষ সম্ভব বলিয়াই সেগুলার অস্তিত্বে নিঃসন্দেহ হইতেছি।

বাল্যচাপল্যপ্রযুক্ত কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের গ্রাম—ঘরবাড়ী, প্রতিবেশী, সহচর—এমন কি, ঠাকুরমা ও আমার 'কনে'কে ভুলিয়া, আমি খালের উভয় পার্শ্বের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। ক'নে বলিলাম কেন—পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিচ্ছেদ-অদর্শন সত্ত্বেও দাক্ষায়ণী যে আমার নয়,. এটা আমি একবারও মনে করিতে পারি নাই। কেন পারি নাই, এখন এ দুরাবস্থিত বার্দ্ধক্যের কেন্দ্রে বসিয়া, তাহা অনুমান করিবারও আমার শক্তি নাই।

শালতীতে উঠিয়াই মা আমাকে ঘুমাইতে আদেশ দিয়া নিজে শয়ন করিয়াছিলেন। শয়নের সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয়, তিনি ঘুমাইয়াছিলেন। নতুবা আমি বসিয়া বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া সুপক্ব আম্রগুলির সদ্ব্যবহার করিতে পারিতাম না।

ঘণ্টাখানেক সময় বোধ হয়, উত্তীর্ণ হইয়াছিল। আম্রভক্ষণে ক্লান্ত হইয়া ধীরে ধীরে খালের জলে হস্তস্পর্শ করিয়া, আমি স্রোত কাটিয়া মুখে দিতেছিলাম। উদ্দেশ্য—মুখ ধুইয়া মায়ের পার্শ্বে শয়ন করিব। এমন সময় দেখিলাম, খালের তীর ধরিয়া চলিষ্ণু ঘনান্ধকারের মত কি যেন শালতীর সমান্তরালে ঘন-পাদবিক্ষেপে চলিয়াছে!

দেখিবামাত্র আমার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। অন্ধকারের পিণ্ডটা

এক একবার নদীতীরস্থ এক একটা বাগানের ছায়ার সঙ্গে মিলাইতেছিল, আবার দুইটা বাগানের ব্যবধান-মধ্যস্থ অনাবৃত আকাশ-প্রণালীতে মসীকৃষ্ণ শুশুকের মত ভাসিয়া উঠিতেছিল।

ভয়ে জড়সড় হইয়া চক্ষু মুদিয়া, আমি মায়ের পার্শ্বে শয়ন করিলাম। শালতী-চালককেও সে সম্বন্ধে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হইল না।

মা ঘুমাইতেছিলেন। মাঝীরা আপনার মনে যে যার শালতী বাহিয়া চলিয়াছে। সহসা তীরভূমি হইতে বংশীরবের মত এক অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ উত্থিত হইল। শুনিয়া চক্ষুর মুদ্রিত অবস্থাতেও আমি চমকিয়া উঠিলাম। ভয়ে মাকে জড়াইলাম। তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বিরক্তির সহিত তিনি বলিয়া উঠিলেন—"অমন ছট্‌ফট্‌ করিতেছিস্ কেন? শুইবার জন্য ত তোকে যথেষ্ট স্থান দিয়াছি!"

আমি এমন ভীত হইয়াছিলাম যে, সাহস করিয়া তাঁহারও কাছে কোনও কথা কহিতে পারিলাম না। মাতা আবার নিদ্রিতা হইলেন। অমন শব্দে পিতারও নিদ্রাভঙ্গের কোনও লক্ষণ বুঝিতে পারিলাম না।

দ্বিতীয়বার সেইরূপ শব্দ হইল। কিন্তু শব্দটা এবারে সেরূপ জোরে হইল না। বিশেষতঃ এইবারে মাঝীরা কথা আরম্ভ করিল। আমারও ভয় ঘুচিল।

আমাদের এ পথে দস্যুর উপদ্রবের কথা কেহ কখন শুনে নাই। নদীর উভয় পার্শ্বেই গ্রাম। সেই সকল গ্রাম আবার জনবহুল। কেবল একস্থানে উভয় পার্শ্বের এক ক্রোশের মধ্যে লোকালয় ছিল না। যদি ভয় করিবার কিছু থাকিত, তা সেই স্থানেই থাকিবার সম্ভাবনা ছিল।

কিন্তু বহুকাল হইতে সেখানেও কেহ কখন দস্যুর উৎপাতের কথা শুনে নাই। নানা গ্রাম হইতে নানা লোক এই খাল দিয়া শালতীতে চড়িয়া কলিকাতা যাতায়াত করিত। দস্যুর উপদ্রবের সুবিধা ছিল না।

ভয়ের কোনও কারণ ছিল না বলিয়া, পিতা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছিলেন। এই জন্য মাঝীর সহিত তীরাবস্থিত কাহারও প্রথম আলাপ-কথা তিনি শুনিতে পান নাই।

পিতার শালতীর মাঝী প্রথমে কথা কহিল। ইঙ্গিতধ্বনিতে তাহার মনে বোধ হয়, কিছু সংশয় জন্মিয়াছিল। সে আমাদের শালতীর মাঝীকে অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি রে রেমো! বুঝ্‌ছিস্ কি?"

রেমোর উত্তরের ভাবে বোধ হইল, সেও সে শব্দটাকে লক্ষ্য করিয়াছে। সে বলিল—"ও কিছু না। দেখ্‌ছিস্ না, সঙ্গে একখানা পাল্কী রহিয়াছে।"

"তবে কুক্ দিল কেন?"

"কোন একটা হিসেব করিয়া দেয় নাই। আর দিলেই বা ক্ষতি কি! একটা হাঁক দিলে চারিদিকের গাঁ হইতে এখনি হাজার মরদ জড় হবে।"

আমি তখন বুঝিলাম, কাহারা পাল্কী লইয়া তীরভূমি ধরিয়া, শালতীর সঙ্গে একমুখে চলিয়াছে। তাহারা দস্যু নয়। দস্যু হইলেও ভয় নাই। এখনি মাঝীর এক ডাকে গ্রাম হইতে হাজার লোক ছুটিয়া আসিবে।

বালকের চিত্ত—সহজে এক মুহূর্ত্তে যেমন ভীত হইয়াছিল, মাঝীর সরল আশ্বাসে তেমনি সহজে এক মুহূর্ত্তে তাহা নির্ভয় হইল। আমি পাল্কী দেখিবার জন্য শালতীর 'ছই' হইতে আর একবার মুখ বাহির করিলাম।

দেখিলাম, বাস্তবিকই চারিজন লোক একটা পাল্কী কাঁধে শালতীর সঙ্গে ছুটিতেছে। তাহার পিছনে একটা লোক, তাহার হাতে একটা লম্বা লাঠী—সেও পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে।

উভয় মাঝীতেই কিছুক্ষণের জন্য শালতী দু'টাকে একটু দ্রুত চালাইল। পাল্কীর বেয়ারাগুলাও সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত চলিল। মাঝীরা যেই একটু শালতীর বেগ কমাইল, তাহাদেরও বেগ অমনি কমিয়া আসিল। গতিক বুঝিতে না পারিয়া, পিতার শালতীর মাঝী রামাকে বলিল—"একটু দাঁড়া।"

আমরা আগে যাইতেছিলাম—পিতার শালতী পিছনে ছিল।

শালতী থামিল, পাল্কীও সঙ্গে সঙ্গে থামিল। ইহার মধ্যে আমরা গ্রাম হইতে একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এবারে যেখান দিয়া যাইব, যদি ভয় থাকে, ত সেইখানেই একটু থাকিতে পারে। খালে সে দিন অন্য কোন শালতী দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না।

পাল্কীর পিছনে যষ্টিধারী এইবারে কথা কহিল। আমাদের মাঝীর নিকট হইতে অগ্নি-প্রাপ্তির আশা আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিল। তাহাদের নিকটে তামাক আছে, কিন্তু আগুনের অভাবে তাহারা তার অস্তিত্বে শুধু যাতনার ধূমপান করিতেছে। তজ্জন্য তাহাদের উদর স্ফীত হইবার উপক্রম করিয়াছে।

মাদকসেবনের সৌকর্য্যার্থে শ্রমজীবীদের পরস্পরের মধ্যে এইরূপ অগ্নি-আদান-প্রদানের উদারতা চিরকালই আছে। কিন্তু সে দিন আমাদের মাঝী সে রীতির ব্যতিক্রম করিল। বলিল,—"থাকিলেও দিবার উপায় নাই। আমরা শালতী ভিড়াইতে পারিব না।"

যষ্টিধারী এরূপ দুর্ব্বোধ্য নিষ্ঠুর আচরণের কৈফিয়ৎ চাহিল। মাঝী

কৈফিয়ৎ দিতে শালতীতে হাকিমের অস্তিত্বের কথা শুনাইল। শুনাইয়া আবার যেই শালতী চালাইয়াছে, অমনি সে ব্যক্তি গুরুগম্ভীর স্বরে তাহাকে চালাইতে নিষেধ করিল।

স্বরে পিতা-মাতা উভয়েই জাগিয়া উঠিলেন। সেই একটা গম্ভীরস্বর-ঝঙ্কার কোলাহলের আকারে সুষুপ্ত পিতার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে। পিতা বলিয়া উঠিলেন—"কি রে, গোলমাল কিসের ?"

মা আমাকে ছইএর বাহিরে বসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি হরিহর ?" মাঝী পিতার প্রশ্নে যা উত্তর দিল, তাহাতেই মায়েরও ব্যাপার বোঝা হইল। আমাকে আর উত্তর করিতে হইল না।

পিতা বুঝিলেন, মাঝীরা আগুন দিতে স্বীকৃত হয় নাই বলিয়া, যষ্টিধারী তাহাদের শালতী চালাইতে নিষেধ করিতেছে। তিনি বলিলেন—"তামাক খাবার জন্য আগুন চাচ্চে, তা দে না কেন।"

ভীত অথবা করুণাপরবশ হইয়া তিনি এ কথা বলিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। মা কিন্তু ভীতা হইয়াছেন। পিতার আদেশে রাম যেই আমাদের শালতী ভিড়াইতেছিল, অমনি তিনি নিষেধ করিলেন। বলিলেন—"আমাদের শালতী কেন, যে হুকুম করিয়াছে, তাহার মাঝী দিয়া আসুক।"

আমাকে তিনি ভিতরে আসিতে আদেশ করিলেন। আমি ভিতরে না গিয়া, মাকে বলিলাম—"মা! কেমন একটি সুন্দর পাল্কী!"

সুন্দর পাল্কী দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া মাও বাহিরে আসিলেন। পিতাও তাঁহার শালতীর বাহিরে মুখ বহির্গত করিলেন। তাঁহার শালতী যেমন তীরভূমি স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইতেছিল,

পাল্কীও অমনি ধীরে ধীরে তরী হইতে জল-সান্নিধ্যে অবতরণ করিতেছিল।

মা বলিলেন—"তাই ত হরিহর, এমন সুন্দর পাল্কী ত কখনও দেখি নাই!"

পিতা যষ্টিধারীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"এ পাল্কী কার রে?"

যষ্টিধারী সসম্ভ্রমে উত্তর করিল—"হুজুর! পাল্কী আমার মনিবের। তাঁহার নাতনীর জন্য বর আনিতে চলিয়াছি।"

পিতা প্রশ্ন করিলেন—"কে তোদের মনিব?"

"মনিবের নাম বলিলে হুজুর ত চিনিতে পারিবেন না।"

'হুজুর' কথা শুনিয়াই মা বুঝিলেন, ভৃত্যটা সভ্য। সুতরাং তার মনিবও সভ্য। আমাদের দেশের লোকগুলা এখনও সভ্যতা শিখে নাই। তাহারা হাকিম কখন চক্ষে দেখে নাই। সেইজন্য দেশের চাষা-ভূষা, চাকরবাকরগুলা পিতাকে কেহ ঠাকুর-ম'শায়, কেহ বা বাবা-ঠাকুর, কেহ দাদা-ঠাকুর বলিত—একজনও হুজুর বলিত না।

এরূপ সভ্য মনিবের সভ্য চাকরের সঙ্গে কথা কওয়ায় দোষ নাই বুঝিয়া, মা পিতার হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"নাম বল্ না। চিনিবার মত লোক হইলে বাবু তাঁকে অবশ্যই চিনিবেন।"

"তাঁহার বাড়ী এখান হইতে প্রায় একশো ক্রোশ তফাত হইবে।"

"একশো ক্রোশ! তোরা কি গাঁজা খাইয়াছিস্?"

"না হুজুরাইন, এখনও খাই নাই। বর লইয়া তার পর খাইব। এইজন্য হুজুরের শালতী থেকে একটু আগুন যোগাড় করিতেছি।"

হুজুর, হুজুরাইন! মা যেন কথাগুলা শুনিয়া একটু বিচলিত হইলেন।

আমার পিতাকে হুজুর বলা তিনি বহুলোকের মুখে বহুবার শুনিয়া, অভ্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে হুজুরাইন সম্বোধন তিনি কোনও কালে কাহারও মুখে শুনেন নাই। কি বুঝিয়া মা আর লোকটাকে নিজে প্রশ্ন না করিয়া আমাকে বলিলেন—"জিজ্ঞাসা কর্ ত হরিহর, উহারা কি?"

আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। মা আমাকে এমন অনুচ্চকণ্ঠে কথা বলিলেন যে, সে কথা আপনা আপনিই লোকটার কানে পৌঁছিল। সে বলিয়া উঠিল—"হুজরাইন! আমরা পাঠান।"

পিতার মুখের এতক্ষণ আর একটি কথাও শুনি নাই। এইবারে তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন—"মনিব?"

"তিনি হিন্দু।"

"জাতি কি?"

"বলিতে নিষেধ আছে, হুজুর! তবে তিনি বামুন ন'ন।"

"বর কোথাকার?"

"তার এখনও ঠিক নাই।"

"ঠিক নাই!"

"আজ্ঞে হুজুর, বর খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।"

শালতী এতক্ষণে তীরসংলগ্ন হইল। পাল্কী লইয়া বেহারারাও শালতীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

উত্তরগুলা যেন হেঁয়ালীর মত। পাল্কী লইয়া বেহারাগুলার আগমন যেন সন্দেহজনক। পিতা আর বর সম্বন্ধে কোনও কথা কহিলেন না। মাঝীকে তৎপরিবর্ত্তে আগুন দিতে আদেশ করিলেন।

মায়েরও কি জানি, কেন, ভয় হইয়াছে। তিনি আমাকে ছইয়ের মধ্যে প্রবেশ করাইতে নীরবে আকর্ষণ করিলেন।

আমি দেখিলাম, বেহারারাও যষ্টিধারীর মতই বলিষ্ঠকায়। তাহারাও মুসলমান। আমারও কেমন হঠাৎ বুকটা গুর্-গুর্ করিয়া উঠিল। মায়ের আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

আগুন করিবার জন্য দ্বিতীয় মাঝী চক্‌মকি ঠুকিতে লাগিল। ইত্যবসরে যষ্টিধারী বলিল—"হুজুর! মনিবের বেটীর বর খুঁজিয়া আমরা হায়রাণ হইয়াছি। এখন হুজুর যদি গোলামের প্রতি দয়া করেন।"

"আমি কি দয়া করিব?"

এই বলিয়াই পিতা মাঝীকে শালতী চালাইতে আদেশ করিলেন। আদেশমাত্র রাম আমাদের শালতী চালাইল। পিতার শাল্‌তী আবদ্ধ হইয়াছে।

দুই তিন হাত শালতী চলিয়াছে কি না, অমনি যষ্টিধারী গুরুগম্ভীরস্বরে রেমোকে মধুর অন্তরঙ্গ আত্মীয় সম্বোধনে দাঁড়াইতে আদেশ করিল।

পিতা বলিলেন—"আর কেন ভাই, আমাদের যাইতে দাও।"

উভয় মাঝীও পিতার সঙ্গে তাঁহার শালতী মুক্ত করিতে দস্যুকে অনুরোধ করিল। দস্যুটা অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া পিতাকে বলিল, —"কি হুজুর, দয়া হইবে না?"

পিতা ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিলেন—"কিসের দয়া?"

"একটি বর।"

"বর আমি কোথায় পাইব? আমাকে কি ঘটক পেলি?"

"ঘটক হইবেন কেন—আপনি হাকিম। তাই হুকুম চাহিতেছি। বর আপনার সঙ্গে চলিয়াছে।"

"কে? আমার ছেলে?"

"অমন সুন্দর বর এ গোলামের নজরে আর কখন পড়ে নাই। আপনার হুকুম পাইলেই খুসি হইয়া যাই। নহিলে—"

"নহিলে কি জোর করিয়া লইয়া যাইবি?"

"কি করিব খোদাবন্দ, উপায় নাই।" "তোর মনিব শুনিলাম শূদ্র।" "আপনি কি?" "আমরা বামুন।"

"কই, আপনার গাঁয়ের লোকে ত এ কথা বলিল না। তারা বলে, আপনি বামুনের ছেলে বটে! কিন্তু আপনি জাতকে জাহান্নমে দিয়েছেন। আমাদের পয়গম্বরের মতন এক ঠাকুরের সঙ্গে আপনি বেইমানী করেছেন! বামুন হ'লে কখন কি আপনি অমন কাজ করতে পারতেন? আপনার পুত্রই আমাদের মনিবের কন্যার উপযুক্ত বর।" এই বলিয়াই দস্যু শালতী তীরসংলগ্ন করিতে রামের উপর আদেশ করিল। পিতা উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"কখন না। যা রাম, তুই শালতী বাহিয়া চলিয়া যা।" দস্যু রামকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"খবরদার।" তার পর পিতাকেও সে রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"খবরদার হুজুর, পিস্তলে হাত দিলেই জন্মের মত হাতখানি ভাঙ্গিয়া যাইবে।"

এই সময়ে তীরের উচ্চভূমি হইতে ভদ্রবেশধারী এক ব্যক্তি উচ্চ হাস্যে বলিয়া উঠিল—"বাধা দিবেন না অঘোর বাবু! একবার উপরে চাহিয়া দেখুন। আপনার পুত্রকে আমরা লইয়া যাইব। বাধা দিলে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।"

পিতা কাতরভাবে তাঁহার কাছে আমার ত্যাগ ভিক্ষা করিলেন।

আর ভিক্ষা! ঝুপ-ঝাপ করিয়া জলে মনুষ্য-পতনের শব্দ হইল। রাম বলিয়া উঠিল—"মা! বড় বিপদ্। একবারে একশো ডাকাত তোমার ছেলে লুটিতে আসিতেছে।"

এই বলিয়াই সে শালতী হইতে ঝাঁপ খাইল। মায়ের আর কথা কহিবার শক্তি নাই; আমিই দস্যুতার একমাত্র লক্ষ্য বস্তু বুঝিয়া বাহুযুগল দ্বারা দৃঢ়রূপে বক্ষোমধ্যে আমাকে আবদ্ধ করিলেন। মায়ের হৃদয়ের প্রচণ্ড স্পন্দন-প্রহারে আমার যেন শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে আমার অঙ্গে কঠোর করস্পর্শ, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আকর্ষণ, মায়ের আর্তস্বর ও গ্রামবাসীদের উদ্দেশে সাহায্য-প্রার্থনার ব্যাকুল চীৎকার।

* * * *

আমি পাল্‌কীর ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়াছি। বস্ত্রে আমার মুখ আবদ্ধ হইয়াছে। পিতা ও মাতার আর্তনাদ ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। রাত্রির ভীম নীরবতায় পথের কোথায় আমি, তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি!

(৩৪)

সমস্ত রাত্রি অন্ধকারে বদ্ধ-পাল্‌কীর ভিতরে আমি চলিয়াছি। অবশ্য, মুখ আমার বহুক্ষণ আবদ্ধ ছিল না। যখন দস্যুরা বুঝিল, আমার পিতা-মাতা আর আমার চীৎকার শুনিতে পাইবে না, তখন তাহারা আমার মুখ খুলিয়া দিল। খুলিয়া অভয় দিল। দস্যু-সর্দার সেই পাঠান বলিল—"হুজুর! তোমার কোনও ভয় নাই। সুতরাং চীৎকার করিও

না, অথবা কাঁদিও না। আমরা শীঘ্রই আবার তোমাকে তোমার বাপ-মায়ের কাছে পাঠাইয়া দিব। কিন্তু চীৎকার করিলে পাঠাইব না। ইহজন্মে আর তা' হইলে বাপমায়ের মুখ দেখিতে পাইবে না।”

তাহায় কথাতে আমি চীৎকার করি নাই। কিন্তু চোখের জল অথবা বক্ষের স্পন্দন কিছুতেই রহিত করিতে পারি নাই।

ভয়—কি যে ভয়, তা এখন কেমন করিয়া বলিব? পিপাসায় আমার তালু শুষ্ক হইয়াছে; তবু আমি তাহাদের কাছে জল চাহিতে পারি নাই। সমস্ত রাত্রির মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও চোখের পলক ফেলি নাই।

সমস্ত রাত্রি অবিরাম গতি। কাঁধ বদল করিতে বেহারারা পথে এক একবার মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইয়াছে; আবার ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে। রাত্রির শেষ-যামে পাল্‌কীর গতির বিরাম হইল। বেহারারা এইবারে পাল্‌কী ভূমিতে নামাইল। সর্‌দার তখন পাল্‌কীর দ্বার খুলিয়া আমাকে বলিল—“হুজুর! এইবারে বাহিরে এসো।”

আদেশ-মত বাহির হইয়া দেখি—হা ভগবান্, এ আমি কোথায় আসিয়াছি? সম্মুখে চাহিয়া দেখি—শূন্য। চোখ মুছিয়া আবার চাহিয়া দেখি, যতদূর দৃষ্টি যায়, যেন একটা জলের বিরাট পাত পড়িয়া আছে। পশ্চাতে দেখি, গাছ, গাছ—গাছের গায়ে, মাথায়—ঢলিয়া, বেড়িয়া, জড়াইয়া, কেবল গাছ—যেন আমার পৃষ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিয়াছে। তখনও উষার আলোক সম্যক্ প্রস্ফুটিত হয় নাই। সেই আলোক-আঁধারের মাঝে পড়িয়া আমি সমস্ত জগৎটা শূন্যময় দেখিলাম। আমার দেহ পতনোন্মুখ হইল। সর্‌দার তাহা বুঝিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল; এবং

অগণ্য আশ্বাস দিয়া বলিল—"হুজুর! আমরা সকলেই তোমার নকর। তুমি আমাদের সকলের মনিব। আমরা তোমাকে ভয় করিব। তুমি আমাদের ভয় করিবে কেন?"

তাহাদের কথা আমাদের দেশের লোকের কথার মত নয়; উচ্চারণে অনেক প্রভেদ। সেইজন্য তাহাদের আশ্বাসবাক্য আমার সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল না। তবে তাহার কথার সঙ্গে তাহার মুখচোখের ভাব-পরিবর্ত্তনে স্নেহ ও কারুণ্যের আভাষ দেখিয়া, এবং তাহাদের বারংবার হুজুর সম্বোধনে তাহারা আমার অনিষ্টকারী নয় বুঝিয়া, আমি অল্পে অল্পে কতকটা আশ্বস্ত হইলাম।

এইবারে আমি কথা কহিলাম। বলিলাম—"তোমাদের কথা ত আমি বুঝিতে পারিলাম না! তোমরা কে?"

সর্দার এইবারে বুঝিল, তাহার আশ্বাসবাণী আমার বোধগম্য হয় নাই। তখন সে যথাসম্ভব ধীরে ধীরে তাহার পূর্ব্বকথার পুনরুক্তি করিল। তাহাতে এই বুঝিলাম, তাহারা যেই হোক না কেন, তাহাদের দ্বারা আমার কোনও অনিষ্ট হইবে না। তবে সর্দারের স্নেহ-সূচক বাক্যে তাহাদের হইতে আমার ভয় ঘুচিল বটে, কিন্তু স্থানের ভয় যে কিছুতেই ঘুচিতেছে না!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ আমাকে কোথায় আনিলে?"

"এখানে অধিকক্ষণ থাকিব না, হুজুর! আমরা আর একটু পরেই এখান হইতে রওনা হইব। বেহারারা এই রাত্রির মধ্যে প্রায় ষোল ক্রোশ পথ ছুটিয়া আসিয়াছে। সেইজন্য তাহারা কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম লইতেছে।"

দেখিলাম, বেহারারা সকলেই একটা প্রকাণ্ড গাছের তল আশ্রয় করিয়াছে। সেখানে একটা অগ্নি-স্তূপকে পিছন করিয়া, আধাআধি পা ছড়াইয়া, জানুতে হাতের ভর দিয়া, বৃক্ষমূলদেশ বেষ্টন করিয়া বৃত্তাকারে বসিয়াছে। কেহ তামাক খাইতেছে; কেহ একটা কাঠী লইয়া মাটী খুঁটিতেছে; কেহ বা পার্শ্বস্থ সঙ্গীর সঙ্গে কি এক দুর্বোধ্য ভাষায় কথা কহিতেছে।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাঁগা, এ কোন্ দেশ?"

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে যে দিকে কেবল গাছ, সেই দিক্ হইতে একটা কি রকম গম্ভীর শব্দ উত্থিত হইল। শব্দে আমি শিহরিয়া উঠিলাম। সর্‌দার আবার আমাকে ধরিল। আবার অভয় দিল। বলিল—"ও শালা তোমাকে হুজুর মানিয়া বনের ভিতর হইতে আদাব করিতেছে।"

"এই কি বন্?" "সুন্দরবনের নাম শুনিয়াছ, হুজুর?" "এই সেই—?" "এই সেই সুন্দর-বন।"

সবিস্ময়ে সভয়ে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ বনে অনেক বাঘ আছে?"

সর্‌দার ঈষৎ হাসিমুখে বলিল—"আছেই ত। দেদার আছে। কিন্তু তাতে কি হুজুর, তুমি এ বনের রাজা—তারা প্রজা। তারা তোমাকে কাঁধে করিয়া নাচিবে।"

বাঘের কাঁধে চড়িয়া নাচিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন না বুঝিয়া, আমি বলিলাম—"এই ত তোমার কথামত আমি চুপ করিয়াছিলাম। এইবারে আমাকে বাবার কাছে পাঠাইয়া দাও।"

"এখনও শ্বশুরবাড়ী দেখা হইল না, আমাদের রাণীমায়ের সঙ্গে তোমার আলাপ হইল না, খানাপিনা কিছু করিলে না—এখনি যাইবার

কথা কি হুজুর? আমি যখন বলেছি, তোমার বাপের কাছে তোমাকে পাঠাইয়া দিব, তখন তাহার অন্যথা হইবে না। তবে ব্যস্ত হইলে, আর বার বার পাঠাইবার কথা তুলিলে, পাঠাইতে দেরি করিব।"

আর আমি পাঠাইবার কথা তুলিতে সাহস করিলাম না। পিপাসা-নিবারণের জন্য তাহার কাছে আমি পানীয়ের প্রার্থনা করিলাম। সর্দার আমাকে আর একটু অপেক্ষা করিতে বলিল। সে মুসলমান। সে ত আমাকে জল দিবে না। যে জল দিতে পারিবে, সে আসিতেছে। তাহারই আগমনের প্রতীক্ষায় তাহারা সেখানে পাল্‌কী রাখিয়াছে।

আমি বলিলাম—"সম্মুখে অগাধ জল—শুধু জল, তার একগণ্ডূষও কি আমি মুখে দিতে পারি না?"

"না। তা হ'লে তোমাকে এখনি আমি জলের কাছে লইয়া যাইতাম। জল লোণা; মুখে দিতে পারিবে না।"

"তবে কে আমাকে জল আনিয়া দিবে? সম্মুখে যতদুর দৃষ্টি চলে, আর একবার দেখিলাম—কালো জল দুলিতে দুলিতে কালোবরণ একটা প্রাচীরের তলে যেন মিশিয়া যাইতেছে। পশ্চাতে সুন্দরবন—কালোবরণ মাথা তুলিয়া কালোবরণ আকাশ হইতে দুই একটা তারা ধরিবার জন্য যেন হাত নাড়িতেছে। ইহার ভিতরে কে কোথায় আছে? সে কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিবে যে, আমাকে জল দিবে?"

আবার একবার বনাভ্যন্তর হইতে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন উঠিল। আমি পিপাসা ভুলিয়া, সব ভুলিয়া, সর্দারকে জড়াইয়া ধরিলাম। সে হাসিয়া, হাত দিয়া আমার দুই পার্শ্ব ধরিল, এবং কুক্কুটী যেমন চিলের ছোঁ হইতে শাবকগুলিকে রক্ষা করে, সেইমত আনত হইয়া, তাহার বিশাল

বক্ষে আমাকে আচ্ছাদিত করিল। তাহার পর্য্যাপ্ত-সঞ্জাত শ্মশ্রু আমার কপোলযুগল স্পর্শ করিল। সে বলিল—"গোলাম কাছে থাকিতে সেরকে ভয় কি হুজুর! আমি তাকে শিয়াল মনে করিয়া থাকি। আর সে বাঘ এখানে কোথায়? এখান হইতে সে চার পাঁচ ক্রোশ তফাতে খাড়ীর পারের জঙ্গলে ডাকিতেছে। কাছে থাকিলে সে চীৎকার করিত না—চোরের মত চুপি চুপি আসিত। আসিলে তোমার সুমুখে তখনই তাহাকে জাহান্নমে পাঠাইতাম।"

মন আমার বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে লাফালাফি করিতেছিল। তাহার আশ্বাসবাক্যে আবার আমি মুখ তুলিলাম। সর্দার এবারে আমাকে কাঁধে উঠাইল। কাঁধে উঠিয়াই আমি একেবারে নির্ভয় হইয়াছি। ব্যাঘ্রের গর্জ্জনে বেহারাদের মধ্যে কাহাকেও ভীতির চিহ্ন প্রকাশ করিতে দেখিলাম না। তাহারা যেমন বসিয়াছিল, তেমনই বসিয়া আছে। তাহাদের তামাকের কলিকা হস্ত হইতে হস্তান্তরে ফিরিতেছে।"

সর্দার তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিল—"এত দেরী হচ্ছে কেন রে?"

তাহারা কি উত্তর করিল, আমি বুঝিতে পারিলাম না। তবে তাহারা আমার শরীররক্ষীকে সর্দার সম্বোধনে উত্তর দিল। তাই শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সর্দার!—"

প্রশ্ন শেষ না হইতেই সর্দার বলিল—"হুজুর!"

"উহারা কি বলিল?"

"বলিল, বজরা খাড়ীর ভিতরে নাঙ্গর করা আছে। জোয়ার হয় নাই বলিয়া বাহির হইতে পারিতেছে না।"

বজরা আমি হুগলী যাইবার পথে কলিকাতার গঙ্গায় দেখিয়াছিলাম।

কিন্তু খাড়ী কি, আমি জানিতাম না। এই একটু আগে শুনিলাম, বাঘ খাড়ীর পারে গর্জ্জন করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"খাড়ী কি?"

"এবারে আর তোমাকে তা দেখান হইল না। দেখাইতে হইলে এই গভীর জঙ্গল ভেদ করিতে হয়। কি জানি, ইহার ভিতরে অন্ধকারে কোথায় কোন্ সম্বন্ধী ওৎ করিয়া বসিয়া আছে! দেখিতে না পাইলে, তোমাকে লইয়া একটু মুস্কিলে পড়িতে হইবে।"

এই বলিয়া সর্দার খাড়ী কি, আমাকে যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিল। আমি বুঝিলাম, সাগর-সঙ্গম-মুখে ভাগীরথী সাগরতুল্যই বিশালতা প্রাপ্ত হইয়াছে। খাড়ী তাহারই একটি অপরিসর শাখা। অরণ্যানী ভেদ করিয়া, মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র আরণ্য দ্বীপপুঞ্জের সৃষ্টি করিয়া, এইরূপ অসংখ্য প্রণালী জালরূপে এই অনুপদেশে বিস্তৃত হইয়া আছে। বড় গাঙে বজরা রাখিলে জোয়ার-মুখে বিপর্য্যস্ত হইবার সম্ভাবনা বলিয়া, বজরা খাড়ীর ভিতরে নিরাপদ্ স্থানে নোঙ্গর করা আছে।

আমাকে বুঝানো শেষ হইতে না হইতে ভৈরব কল্লোলে জোয়ার আসিল। দেখিতে দেখিতে নিম্ন-তটভূমি প্লাবিত করিয়া, যে বৃক্ষতলে বসিয়া বেহারারা বিশ্রাম লইতেছিল, জলোচ্ছ্বাস সেই উচ্চভূমিতে উঠিয়া আসিল। অমনি সমস্বরে উচ্চ কোলাহলে আল্লার নামে দরিয়ার উল্লাসের প্রতিধ্বনি তুলিয়া, বেহারারা যে যার লাঠি হাতে দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে ঝঙ্কারে কাননভূমি মুখরিত করিয়া অসংখ্য পাখীর কলধ্বনি।

সর্দার বলিল—"হুজুর! এইবারে আবার আমাদের চলিতে হইবে। ফিরিবার সময় যদি আমরা এই পথ দিয়া ফিরি, তা হ'লে তোমাকে খাড়ী দেখাইব।"

সর্দারের এই সরল প্রতিশ্রুতিতে আমার দেশে ফিরিবার আশা হইল। শুনিয়া আমার ভয় ঘুচিল। তাহার এতক্ষণের ব্যবহারে, তাহার স্নেহপূর্ণ কথায়, সর্ব্বোপরি তার বার্দ্ধক্যের যোগ্য বীরোচিত মূর্ত্তিতে অল্পে অল্পে তার প্রতি আমার প্রীতি জন্মিয়াছে।

আমি বলিলাম—"তবে চল।"

'চল' কথা শুনিবামাত্র সর্দার হো হো হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসি শুনিয়া আমি কিছু অপ্রতিভ হইলাম। হাসিবার কথা আমি এমন কি কহিয়াছি?

সর্দার বলিল—"জল খাইতে চাহিয়াছিলে না হুজুর?"

তাই ত! আমার সে দারুণ পিপাসা? কই, এখন ত তার অর্দ্ধেকও নাই! এ পিপাসা আপনা আপনি কেমন করিয়া মিটিল! তবে কি সত্য সত্যই আমি পিপাসিত হই নাই!

আমার উত্তরদানে বিলম্ব দেখিয়া সর্দার বলিল—"যদি পিপাসা না থাকে, তাহা হইলে পাল্কীতে উঠ। বজরা খাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে। আমরা আর একটুও বিলম্ব করিব না।" আসল কথা, কিছুক্ষণ বিশ্রাম না লইয়া জলপান করিলে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা বলিয়া, সর্দার নানা কথায় কতকটা সময় অতিবাহিত করিতেছিল। ইত্যবসরে উষার শীতল জলীয়বাষ্পের বারংবার শ্বাসগ্রহণে আমার কণ্ঠতালু আবার সরস হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পিপাসারও অনেক উপশম হইয়াছে।

তথাপি আমি সর্দারের কথায় উত্তর করিলাম। বলিলাম—"কই, তুমি জল ত আমায় দিলে না!"

"তোমাকে আর কেমন করিয়া দিব হুজুর! তোমার বাবা হইলে দিতাম।"

"আমার বাবাকে দিতে তবে আমাকে দিবে না কেন?"

"তোমার বাবা যে আমাদের কুটুম্ব। তাঁহাকে শুধু জল কেন, আমার ঘরের সুরুয়া পর্য্যন্ত দিতে পারি। তুমি জামাই—তোমাকে দিতে পারি না।"

আমি পাঠান সরদারের জামাই হইতে চলিয়াছি, শুনিয়া ভয়ে আবার আমার মুখ শুকাইয়া গেল। আমি হতভম্বের মত সরদারের মুখপানে চাহিলাম।

সরদার আমাকে তদবস্থ দেখিয়া তাহার দীর্ঘ যষ্টিতে দুই হাতের ভর দিয়া ঈষৎবক্রভাবে দাঁড়াইল। তার পর হাসিতে হাসিতে বলিল—"মুখপানে দেখিতেছ কি হুজুর? তোমাকে ধরিয়া লইয়া আমার বেটীর সঙ্গে তোমার সাদী দিব।"

আমার পূর্ব্বের পিপাসা ফিরিয়া আসিল। সরদার বলিল—"এইবারে জল খাও।"

সাদীর কথা শুনিয়াই আমার মেজাজ চটিয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বালকসুলভ আত্মবিস্মৃতির বশে আমি স্থানাস্থান অবস্থা সব ভুলিয়াছি। আমি ঈষৎ উষ্মার সহিত বলিয়া উঠিলাম—"তোমরা জল দিলে আমি খাইব না।"

"আমি দিলেও খাইবে না ভাই?"

পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি, এক অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী রমণী! যুবকের চক্ষে তাঁহাকে দেখি নাই। সুতরাং যুবকের দৃষ্টিতে লাবণ্যময়ী পরিণতযৌবনার

রূপের যে বিশ্লেষণ, তাহা ক্ষুদ্র দ্বাদশবর্ষীয় বালকের পক্ষে হইবার সম্ভাবনা নাই। বালক—বিশেষতঃ ভয়বিস্ময়ে ব্যাকুল বালক—এক অপূর্ব্ব মধুময় কথার ঝঙ্কারে আকৃষ্ট হইয়া, প্রথমেই তাঁহাকে যে রূপে আবির্ভূতা দেখিয়াছিল, তাহাই আমি বলিতেছি। ইহার পরেও তাঁহাকে আমি দেখিয়াছি। বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন অবস্থার প্রতিকৃতি-স্বরূপ অনেকবার তিনি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। আবার বলিব? ইহার পূর্ব্বেও তাঁহাকে আমি দেখিয়াছি। কিন্তু সে দৃষ্টিহীনের চক্ষে দেখা। অভিমান-বিড়ম্বিতের গৃহে জন্মিয়াছিলাম। মাতৃস্তন্যের সঙ্গে অলক্ষ্যে মিশ্রিত অভিমানেই পুষ্ট হইয়াছিলাম। অভিমানিনী আঁখির তারকাবরণী ভেদ করিয়া সে রূপ হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে নাই। আজি পিপাসা-ব্যাকুলিতের নেত্রে প্রথম তাঁহাকে দেখিলাম। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় রসপূর্ণ হইল! পিপাসা মিটিল! হৃদয় অতিরিক্ত রস ফুৎকারে লোচন-পথে নিক্ষেপ করিল। দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইল।

রমণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ভাই, আমায় চিনিতে পারিলে না?"

আমি উত্তর করিলাম না। সর্দারের কাছ হইতে উন্মত্তের মত তাহার দিক্ লক্ষ্য করিয়া ছুটিলাম।

"থামো—থামো। আমার এক হাতে গরম দুধ, অন্য হাতে জল।"

আর দুধ আর জল! আমি বাহুদ্বয়ের দৃঢ়বেষ্টনে তাহার কটিদেশ আবদ্ধ করিয়াছি। উষ্ণদুগ্ধ আমার দেহে পড়িবার আশঙ্কায় ত্রস্তা অবনমিতদেহার পয়োধরযুগলতলে মুখ লুকাইয়াছি।

আপনাদের বোধ হয় বলিতে হইবে না, এ রমণী কে? আমাদের

হুগলীতে অবস্থানকালে ইনি এক বৎসর আমাদের বাসায় ঝিয়ের মূর্ত্তিতে পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। ইহার অধিক এখন আর আমি বলিব না। অবকাশ পাইয়া তাঁহাকে আজ সসম্ভ্রম সম্ভাষণ করিতেছি। ধন-গৌরবের সঙ্গেই আমরা আজিকালি সম্ভাষণের অনুপাত করি! পূর্ব্বেও এ ভাবট আমাদের মধ্যে একেবারে ছিল না বলিলেই চলে। তখন অন্তর্গৌরবের দিকে আমাদের যথেষ্ট লক্ষ্য ছিল। সদ্‌গুণসম্পন্ন দরিদ্রকে আমরা শ্রদ্ধা দেখাইতে কুণ্ঠিত হইতাম না।

এখন হইতে আর তাঁকে ঝি বলিব না। তাঁর নাম দয়াময়ী। এ নাম আমাদের হুগলীর বাসায় এক বৎসরের মধ্যেও কাহারও জানিবার অবকাশ ঘটে নাই। পিতামাতার ত নয়ই, আমারও না। ঝি ত ঝি—তার কি আবার নাম থাকে! যদিই থাকে, সে নাম কি মধুরভাবে মুখে আনিবার যোগ্য! সেইজন্য এমন মধুময় নাম আমরা কেহ কানের কিনারায় আসিতে দিই নাই। যে সময়ের কথা বলিয়াছি, সে সময়েও কি জানিয়াছি? জানিয়াছি পরে। অন্তর্গৌরবই যাঁর কাছে একমাত্র গৌরব বলিয়া গ্রাহ্য, তাঁহার মুখে শুনিয়া জানিয়াছি। তবে এখন হইতে তাঁহাকে দয়া-দিদি বলিয়াই আপনাদের কাছে পরিচিত করিব। সম্ভ্রান্ত-বংশের কুলবধূ—পরনির্ভরতা হেয় জ্ঞানে আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, যিনি গতর খাটাইয়া জীবিকানির্ব্বাহের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বজাতিরই সম্মাননার যোগ্য।

কোনও ক্রমে জল ও দুধের পাত্র ভূমিতে রাখিয়া, দয়াদিদি আমাকে বাহুপাশে দৃঢ় বাঁধিয়া বক্ষের উপর তুলিয়া ধরিল, এবং আমার মুখ অজস্র চুম্বিত করিল। বামুনের মুখ বলিয়া আর সে মানিল না। তার

পর কোল হইতে একবার আমাকে ভূমিতে নামাইল। ঘটী হইতে জল লইয়া আমার মুখচোখ প্রক্ষালিত করিল। শেষে অঞ্চল দিয়া আমার মুখচক্ষু মুছাইয়া আমাকে দুগ্ধপান করাইল।

সর্দার বলিল—"মায়ীজি, আর নয়। 'গণ' বহিয়া যাইতেছে।"

দয়াদিদি বলিল—"চল।"

বেহারারা আবার আমাকে পাল্কীতে উঠাইল। রশিখানেক তীরস্থ বনপথ ভেদ করিয়া যাইতে না যাইতেই সুন্দর এক বজরা দৃষ্টিগোচর হইল। বজরাকে ঘেরিয়া অনেকগুলা ক্ষুদ্রাকার নৌকা।

পাল্কীশুদ্ধ আমাকে সকলে বজরার উপর উঠাইল। দয়াদিদিও আমার সঙ্গে বজরায় আরোহণ করিল। সর্দার ও তাহার সঙ্গিগণ নৌকায় উঠিল। আবার একবার গগনভেদী সমবেত কণ্ঠে আল্লাধ্বনি। ধ্বনির দিগন্তগত ঝঙ্কার নিস্তব্ধতায় বিলীন হইলে দেখি, তীরস্থ বনভূমি ঊর্দ্ধশ্বাসে বিপরীতমুখে ছুটিয়াছে।

(৩৫)

বজরায় উঠিয়া দেখি, আরও দুইটি স্ত্রীলোক তাহার মধ্যে রহিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে একটি অর্দ্ধবয়সী, অপরটি যুবতী। উভয়েই শ্যামাঙ্গী। তাহাদিগের আকারে উভয়কেই পরিচারিকা বলিয়া বোধ হইল। আমার দুইদিকে, দুইখানি ঝালরযুক্ত সুন্দর পাখা লইয়া তাহারা আমাকে ব্যজন করিতে বসিল। বজরায় যখন প্রথম প্রবেশ করি, তখন উভয়ের মধ্যে কেহই একটিও কথা কয় নাই। অবস্থার গুরুত্বে তখন সকলেই নীরব। নদীর ঢেউ দুইধারে ঢালিয়া গমনশীল বজরার তলদেশে কেবল থাকিয়া

থাকিয়া কল্লোলধ্বনি উঠিতেছিল। আর সর্ব্বত্র নীরবতা। বায়ুর প্রহারে বজরার পাল পূর্ণ বিস্ফারিত হইয়াছে। দাঁড়ীরা দাঁড় ছাড়িয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সম্মুখে, পশ্চাতে, উভয় পার্শ্বে, আমার অপহারক সঙ্গিগণের নৌকা বজরার ব্যূহের আকারে চলিয়াছে। তাহারাও নীরব। সমস্ত প্রকৃতিতেই যেন নিস্তব্ধতা। দূরে তীরভূমি এখনও শয্যাশায়িনী দিগঙ্গনার লম্বমানা বেণীর মত দৃষ্ট হইতেছিল।

ধীরে ধীরে অরুণালোক দূরস্থ অরণ্যপ্রাচীরশীর্ষে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দেখি, সূর্য্যদেব সাগরজলে সুবর্ণকুম্ভের মত ভাসিয়া উঠিতেছে। সাগরে সূর্য্যোদয় কখনও দেখি নাই। সাগরে কেন, দেশেও কখন সূর্য্যোদয় দেখা ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। এই প্রথম দেখিলাম। অরুণের অভ্যুত্থান আমার দৃষ্টিতে কিছু বিচিত্র বলিয়া বোধ হইল। আমি প্রথমে তাহা সূর্য্য বলিয়াই বুঝিতে পারি নাই। বস্তুটা কি, জানিবার জন্য দয়াদিদিকে ডাকিবার আমার প্রয়োজন হইল। বজরার কামরার খড়খড়ি দিয়া আমি সে দৃশ্য দেখিতেছিলাম। মুখ না ফিরাইয়াই দয়াদিদিকে ডাকিলাম। তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার নাম জানি না। দিদি বলিয়া ডাকিতে তখনও অভ্যস্ত হই নাই।

আমি ডাকিলাম—"ঝি!"

পার্শ্বস্থা যুবতী-পরিচারিকা উত্তর করিল। আমি অমনি মুখ ফিরাইলাম। তাহার মুখের পানে চাহিলাম। সে বলিল—"কি বল জামাই বাবু!"

"তোকে নয় ললিতা! তোর জামাই-বাবু আমাকে ডাকিতেছে।"

আমি তাহাকে কোনও উত্তর না দিয়া দয়াদিদির পানে চাহিলাম। বজরার ভিতরে দুইটি কামরা। দয়াদিদি দেখি, ভিতরের ছোট কামরা-

টিতে বসিয়া বঁটিতে ফল কাটিতেছে। আমি তাঁহার পানে চাহিতেই দিদি বলিল—"কেন ডাকিতেছ ভাই?"

মধ্যবয়সী রমণী বলিল—"আপনি কি ঝি? জামাইবাবু ললিতাকেই ডাকিতেছে।" দয়াদিদি বলিল—"আমি ঝি বই কি!"

ললিতা বলিল—"তা মাসীমা যখন শুদ্দূর আর জামাইবাবু বামুন, তখন তিনি জামাইবাবুর একরকম ঝি বই কি।"

"এক রকম কেন, পূরাদস্তুর। আমি মাহিনা লইয়া উহার বাপের ঘরে বহুদিন চাকরি করিয়াছি।"

ললিতা উচ্চ হাসিয়া বলিল—"মাসীমার এক কথা।"

মধ্যবয়সী বলিল—"তোমার পিছনে পাঁচটা ঝি, তুমি পরের ঘরে চাকরাণী-বৃত্তি করিয়াছ! আর এ কথা বলিলে আমরা বিশ্বাস করিব?"

"আমি মিথ্যা বলি নাই অহল্যা!"

আমি একান্ত বুদ্ধিহীন ছিলাম না। এই সকল কথার উত্তর-প্রত্যুত্তরে বুঝিলাম, দয়াদিদির ঝিয়ের কার্য্যে বিধাতা একটা গোলমেলে রকমের বাদ সাধিয়াছে। সে গোলমালটা তখন আমার বুদ্ধির সাহায্যে মীমাংসিত করিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও আমি মনে মনে স্থির করিলাম, দয়াদিদিকে আর ঝি বলিব না।

বস্তুতঃই তাহারা দয়াদিদির কথায় বিশ্বাস করিল না। তখন দিদি সাক্ষ্য-দানের জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেমন, না দাদাবাবু? তুমি ত আমাকেই লক্ষ্য করিয়া ঝি বলিয়াছ?"

আমি আর ইতস্ততঃ না করিয়া একেবারেই বলিয়া উঠিলাম—"না।"

"তবে তুমি কাকে মনে করিয়া বলিয়াছ?"

আমি পার্শ্বস্থ যুবতী ললিতাকে দেখাইয়া দিলাম। অমনি সে হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। এ হাসির কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া আমি অপ্রতিভ হইলাম। তবে কি ললিতা ঝি নয়?

মধ্যবয়সী তখন মুখ নাড়িয়া তাহাকে বলিল—"হাসিতেছিস্ যে? খানিকটে যৌবনের লাবণ্য চুরি ক'রে, জড়োয়াবালা হাতে প'রে, তুই কি জামাইবাবুর চোখ এড়িয়া যাইবি?"

ও হরি! কি করিলাম! আমি মাথা নামাইয়া চুপি চুপি ললিতার হাতখানার দিকে চাহিলাম। আমি সে বালা দেখিয়াছিলাম; ক্ষণেকের জন্য দেখিয়াছিলাম। দেখিয়া সোনার নয়, সুতরাং মূল্যবান্ নয় মনে করিয়াছিলাম। বসন তাহার ভূষণের অনুরূপ ছিল না। একখানা আধময়লা লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী। বর্ণে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্যামা, তিনভাগ কৃষ্ণে এক ভাগ গৌরবর্ণ মিশিয়াছে। অত খুঁটিয়া রূপ দেখিবার সে বয়স নয়, আমার তখন সে অবস্থাও নয়। সত্য কথা বলিতে কি, তাহাকে সম্রান্তা বুঝাইতে, তাহার রূপ সে সময়ে আমাকে কোনও সাহায্য করে নাই। তাহার উপর পাখা লইয়া তাহার বাতাস করিবার আগ্রহে তাহাকে আমি ঝিই মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু পূর্ব্বে তাহাকে ত লক্ষ্য করিয়া বলি নাই। এখন কাহাকেও আর ঝি বলা চলে না দেখিয়া, আমি মাথা হেঁট করিয়া রহিলাম।

"যাক্, তোরা আর আমার ভাইকে বিরক্ত করিস্ নি।"—এই বলিয়া দয়াদিদি একখানি রূপার রেকাবি সুপক্ক আম্র ও অন্যান্য ফল এবং মিষ্টান্নে পূর্ণ করিয়া, আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল। তার পর ললিতাকে জল আনিতে এবং অহল্যাকে ভাল করিয়া একটি পান সাজিতে আদেশ দিয়া,

আমাকে বলিল—"জল খাও।" আমি আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম। দয়াদিদি বলিল—"না খাইলে বড় কষ্ট হইবে। দু'পুরের এদিকে অন্ন মুখে দিতে পাইবে না। সারারাত্রি বোধ হয়, একটু সময়ের জন্যও ঘুমাইতে পাও নাই। পেট ভরিয়া এখন আহার করিয়া, নিদ্রা যাও। নহিলে অসুখ করিবে।"

বাসায় দয়াদিদি যখন চাকরী করিত, তখন তাহার জেদ কিরূপ, আমি জানিতাম। মায়ের জেদ অনেকবার অগ্রাহ্য করিয়াছি, কিন্তু তাহার জেদ পারি নাই। আমি জলযোগে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহার মধ্যে ললিতা ও অহল্যা দুইজনেই ছোট কামরাটির ভিতরে চলিয়া গেল।

দয়াদিদি অবকাশ পাইয়া বলিল—"আমাকে ডাকিতেছিলে কেন?"

সূর্য্যোদয়ের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। আমি পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি, আমাদিগের কথার অবসরে বালসূর্য্য মার্ত্তণ্ড হইয়াছে। আমি মুখ ফিরাইয়া দিদির মুখপানে চাহিয়া হাসিলাম। দিদি আমাকে একটু মিষ্ট তিরস্কার করিল। বলিল—"অমন ঠাকুরমার নাতী তুমি, তুমি মিথ্যা কহিবে কেন?"

"আমি তোমাকে কি বলিব?"

"কেন, ঝি বলিবে। পূর্ব্বজন্মে বহু পুণ্য করিয়াছিলাম, তাই তোমাদের ঘরে ঝি হইয়াছি।"

"আমি ঝি বলিব না।"

দিদি ঈষৎস্মিতবিকশিত মুখে বলিল—"তবে কি বলিবে?"

"আমি 'মা' বলিব।"

তড়িতের ক্রিয়াবশে যেন দয়াদিদির চক্ষু হইতে জলধারা গণ্ড বহিয়া

ছুটিয়া গেল। আত্মহারা মত দিদি আমার গলা ধরিয়া মুখচুম্বন করিতে মুখ বাড়াইল। কিন্তু কি বুঝিয়া নিবৃত্ত হইল। বোধ হয়, দিদি বুঝিয়াছিল, সে শূদ্রাণী আর আমি ব্রাহ্মণকুমার। দিদি বলিল—"না ভাই, অত ভাগ্য আমার সহিবে না। তুমি আমাকে দিদি বলিয়ো।"

মা কোথায়? রূপে না কথায়? চেতনা মায়ের রূপ। মমতা মায়ের কথা। চেতনায় মায়ের উদ্বোধন। মমতায় অধিষ্ঠান। এই মমতার স্বরূপ না বুঝিলে মায়ের রূপানুভূতি হয় না। অনুভূতি সন্তান। তবে মমতাময়ী দয়াময়ী তোমাকে আমি মা বলিব না কেন? যাঁর হইতে আমার উদ্ভব হইয়াছে, তিনি আমার গর্ভধারিণী মা। যাঁহার স্নেহে আমি প্রতিপালিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছি, সেই পিতামহী আমার ধাত্রী-মা। আর যাঁহা হইতে আমার ব্রাহ্মণত্বের বিকাশ হইয়াছে, মনুষ্যত্ব প্রতিপালিত হইয়াছে, তিনি একাধারে আমার গর্ভধারিণী ও ধাত্রী—জননী ও পিতামহী। সত্য কথা বলিতে কি, জগজ্জননীর স্মরণে যখনই আমি বলিয়াছি—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা", তখনই সর্ব্বাগ্রে দয়াময়ীর মূর্ত্তি আমার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে।

দয়াদিদি পাত্রটি সম্মুখে স্থাপিত করিয়া আমাকে বলিল—"ইহার পরে আহার ঘটিবে কি না ঠিক বলিতে পারি না। শুধু ফলাহারেই হয় ত আজ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইবে। সুতরাং আহারে সঙ্কোচ করিয়ো না।"

আমি বলিলাম, "আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ দিদি?"

"আগে জল খাইয়া লও। তার পর বিশ্রাম কর। বিশ্রামান্তে যাহা জানিতে চাও, বলিব, এখনও অনেকক্ষণ আমাদের বজরায় থাকিতে হইবে।"

দিদির আগ্রহাতিশয্যে উদর পূরিয়া আহার করিলাম। ললিতা একটি রূপার গেলাসে জল, আর অহল্যা একটি রূপার ডিপায় পান লইয়া আমার সম্মুখে রাখিল। পান দিয়া অহল্যা শয্যা বিছাইল।

আমি শয়ন করিলাম। হাতে পাখা লইয়া, মাথার শিয়রে বসিয়া দিদি নিজে এবারে আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল।

সাগরে নিক্ষিপ্ত জীবের ভাগ্যবশে প্রাপ্ত স্থিরচ্ছায়াক্রমাকীর্ণ তটভূমির মত দয়াময়ী দেবীর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতলে আশ্রয় পাইয়া অচিরে আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

(৩৬)

ঈশ্বরের নামে পাঠানগণের সমবেত কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে আমার ঘুম ভাঙ্গিল। চোখ মেলিয়া দেখি, দিদি তখনও পর্য্যন্ত আমার শিয়রে বসিয়া ব্যজন করিতেছে। আমাকে জাগিতে দেখিয়াই দিদি বলিয়া উঠিল— "উঠ হরিহর, আমরা যথাস্থানে পৌছিয়াছি।"

আমি সর্ব্বপ্রথম দিদির মুখে আমার নাম শুনিলাম। শুনিবামাত্র উঠিয়া বসিলাম। খড়খড়ির ভিতর মুখ দিয়া দেখি, কলিকাতার সন্নিহিত গঙ্গার ন্যায় এক প্রশস্ত নদীর তীরে বজরা ভিড়িয়াছে। তার অপর পারে শ্যামশস্পাচ্ছন্ন নীলাকাশ-স্পর্শী প্রান্তর। এপারে আম্র, পনসাদি বিশাল তরু-সমাচ্ছন্ন উদ্যানভূমি। অনুচরেরা নৌকা তীরে বাঁধিতে ব্যস্ত হইল। বজরার ভিতরে ললিতা ও অহল্যা বজরার এক কোণ আশ্রয় করিয়া তখনও ঘুমাইতেছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওরা উঠিতেছে না কেন?"

"এখনি সকলকেই উঠিতে হইবে। এখনও একটু বিলম্ব আছে বলিয়া, উহাদের উঠাই নাই। সর্দার উহাদের জন্য পাল্কী আনিতে গিয়াছে। সে ফিরিলেই উঠাইব। উহারাও তোমার মত সারারাত্রি জাগিয়াছে।"

"উহারা জাগিয়াছে কেন?"

"উহারা বাঘের ভয়ে ঘুমাইতে পারে নাই। বনের ভিতরে বাঘ কেবল গর্জ্জন করিয়াছে।"

"তা হ'লে তুমিও ত সারারাত্রি জাগিয়াছ! তুমি ঘুমাইলে না কেন?"

"আমি ত আর বাঘের ভয়ে জাগিয়া ছিলাম না। আমি জাগিয়াছিলাম, তোমার জন্ত উৎকণ্ঠায়। সে উৎকণ্ঠা ত এতক্ষণ পর্য্যন্ত দূর হয় নাই। এইবারে দূর হইল। তোমাকে প্রাণে প্রাণে তীরে আনিয়াছি। এইবারে ঘরে গিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইব।"

"এইখানেই তোমার ঘর?"

"এখন তাই বই কি। তবে আগেকার ঘর নয়। আর পরেও থাকিবে কি না বলিতে পারি না।"

"এ আমি কোথায় আসিয়াছি?"

দয়াদিদি বিনত বিভাসিত মুখে বলিয়া উঠিল—"তা তোমাকে বলিব কেন? তোমাকে যে চুরী করিয়া আনিয়াছি। স্থানের নাম তোমার বাবা-মা জানিতে পারিলেই আমাকে ধরিয়া জেলে দিবে।"

অনেক ধীবর ছোট ছোট ডিঙ্গিতে চড়িয়া নদীবক্ষে মাছ ধরিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন ঠিক এমনি সময় গাহিয়া উঠিল :—

"কানু এখন কালাপানিতে—শোন্ গো ললিতে!
রাজার বেশে বজরা চেপে যাচ্ছে চন্দ্রাবলী আনিতে।
রাজার ধর্ম্ম নিগূঢ় মর্ম্ম বোঝা বড় দায়;
রাইকে বুঝ্‌ব বাপের বেটী
যদি তারে ইসারায়
ধ'রে আনতে পারে কিনারায়।
নইলে একূল ওকূল দুকূল যে যায়।
দরিয়ার চোরা বালিতে—ওগো ললিতে!"

গানের সুর ললিতার ঘুমন্ত কানে প্রবেশ করিল। সে স্বপ্নোত্থিতার মত উঠিয়া বসিল। চারিদিক্ চাহিল। বোধ হইল, সে সুষুপ্ত হইয়াছিল। ঘুমের ঘোরে সে স্থান, কাল, সঙ্গ সমস্তই ভুলিয়াছে। উঠিয়া এখন সুপ্ত স্মৃতিকে জাগাইতেছে। আমাদের পানেও সে একবার চাহিল। গানের মিষ্টতায় আমরা উভয়েই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। দয়াদিদি কোনও কথা কহিল না।

ললিতা এইবারে জিজ্ঞাসা করিল—"মাসীমা! তুমি কি আমাকে ডাকিলে?"

মাসীমাকে উত্তর দিতে হইল না। ধীবর গায়িতে গায়িতে গানের শেষ কলিতে আসিয়া পঁহুছিয়াছে।

"দরিয়ার চোরা বালিতে—ওগো ললিতে।"

আমি বলিলাম—"কে ডাকিতেছে, বুঝিলে?"

ধীবর গীতশেষে আবার গানের প্রথমাংশের পুনরাবৃত্তি করিল। অমনি অন্য নৌকা হইতে হাঁতে পায়ে হাল চালাইতে চালাইতে অন্য এক ধীবর ললিতার নামে এক দীর্ঘতান ধরিল।

ললিতা তাই শুনিয়া বলিয়া উঠিল—"দূর মুখপোড়ারা! আমরা যে কানুকে কোন্ কালে কিনারায় আনিয়াছি।" এই বলিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়াই সে হাসিয়া ফেলিল।

দয়াদিদি বলিল—"আর কেন, অহল্যাকে ডাকিয়া তোল্। পাল্কী আসিতেছে।"

"সত্য সত্যই দেখি, আর দুইখানা পাল্কী লইয়া কতকগুলা উড়িয়া বেহারা নদীতীরে উপস্থিত হইল। তাহাদের সঙ্গে আরও কতকগুলা বেহারা আসিয়াছিল। তাহারা আমার পাল্কী লইতে বজরায় উঠিল। এতক্ষণ সর্দারকে দেখি নাই। এখন দেখি, সে লাঠি কাঁধে তীরস্থ এক অশ্বত্থবৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া আমাকে সতর্কতার সহিত উঠাইতে বেহারাদের আদেশ করিতেছে।

আমি পাল্কীতে চড়িয়া বজরাত্যাগ করিলাম। অপর দুইটি শিবিকার একটিতে দয়াদিদি, অপরটিতে ললিতা আরোহণ করিল। অহল্যা ললিতার শিবিকার সঙ্গে পদব্রজে চলিল। তীরের উপর উঠিতেই ললিতার শিবিকাদ্বার রুদ্ধ হইল। তখন বুঝিলাম, ললিতা ঝি নহে। ঝিয়ের মধ্যে যদি কেউ আমাদের সঙ্গে থাকে, তবে সে একমাত্র অহল্যা।

অশ্বত্থতলে আমার পাল্কী উপস্থিত হইতে না হইতেই সর্দার আমার শিবিকার দ্বারের সম্মুখে আসিয়া একটি লম্বা গোছের সেলাম করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"হুজুর! যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহা ঘটিল না। মনে করিয়াছিলাম, আমার বেটীর সঙ্গে তোমার সাদী দিব। আসিয়া শুনিলাম, বেটীর সাদী হইয়া গিয়াছে। তবে আমি যখন কথা

দিয়াছি, সে কথা ত আর নয় হইবে না। আমি তোমার সঙ্গে তার নিকা দিব। তোমাকে জামাই না করিয়া ছাড়িতেছি না।”

রহস্যের মর্ম্ম আমি যেন এখন অনেকটা বুঝিয়াছি। পাল্কীতে উঠিয়াই গম্যস্থানের একটা মনের মত ছবি আঁকিয়া তাহার ভিতরে আমি বিচরণ করিতেছি। আমি তাহার ভিতরে যাহাকে খুঁজিতেছি, তাহার সেই মুখখানি—আমলকীতল-সান্নিধ্যে আমার বইশ্লেট বগলে করিয়া, আমার পানে যে চাহিয়াছিল, যে মুখখানি দক্ষিণরায় ঠাকুরের আশীষ-পুষ্পের মত আমার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছিল, সেই মুখখানিই কেবল যেন আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। দয়াদিদি কি সে মুখখানি পাঠানের ঘরে লুকাইয়া রাখিয়াছে? অদৃষ্টে যা থাকুক, আমি পাঠানের ঘরে গিয়াও সেই মুখখানি দেখিব। হুগলীর বকুলতলে আলো-আঁধারের মাঝে পড়িয়া, ভয়বিস্ময়ের বেড়ায় জড়িয়া, সে মুখ দেখিয়াও আমার দেখা হয় নাই। চারি চক্ষুর মিলনসময়ে আমার সম্মুখে কেবলমাত্র দুটি নেত্র অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে দীঘীর কালোজলে ফুল্লারবিন্দের আয়ত পত্রের মত নিমেষের জন্য ভাসিয়া আবার অবগুণ্ঠনে আত্মগোপন করিয়াছিল। মুখখানি দেখিয়াও দেখিতে পাই নাই। আজ আমার সেই মুখ দেখিবার আশার যেন আভাস আসিতেছে। আমি ভাবিলাম, হউক পাঠান, সেই মুখ যদি পাঠানের ঘরেই লুকানো থাকে, আমি পাঠানের ঘরে গিয়াও তাহা দেখিয়া আসিব। জানিতে এক দিদি। আর কে এখানে এ ঘটনা জানিতে আসিতেছে?

সরদার জিজ্ঞাসা করিল—“কি হুজুর, রাজী আছ?”

আমি চক্ষু মুদিয়া ঘাড় নাড়িয়া তাহাকে বলিলাম—“আছি।”

সর্দার হাসিয়া উঠিল। ললিতা বদ্ধ পাল্কীর ভিতরেই হাসিল। অহল্যা বলিল—"কি মাসীমা, শুনিলে ?"

দয়াদিদি উত্তর করিল—"শুনিয়াছি। ভাই ত আমার ঠিক উত্তর দিয়াছে। তোরা কি মনে করিয়াছিস্, হরিহর এখনও কিছু বুঝে নাই ? সর্দারকে সে এখনও চিনে নাই ? সে বুঝিয়াছে, সর্দারের কন্যার দুইবার বিবাহ করিতে পারে না। সে কন্যা ভাগ্যবতী পতিব্রতা—সতী।"

এই বলিয়া দয়াদিদি সর্দারকে যাত্রার অনুরোধ করিল। বলিল—"সর্দার! আর বিলম্ব কেন ? যে অসমসাহসিক কাজ করিয়াছ, তাহা ইহ-জীবনে ভুলিব না। যে স্থানে গিয়াছিলাম, তাহাও ইহজীবনে ভুলিতে পারিব না। আর ললিতা ও অহল্যার ঋণ, মরণের পরও সঙ্গে লইয়া যাইব। তোরা যে জানিয়া শুনিয়া ওরূপ স্থানে আমার সঙ্গে যাইতে সাহস করিয়াছিলি, তাহাতে বুঝিয়াছি, তোরা কখন মানুষ ন'স্।"

ললিতা কি উত্তর করিল, তাহা আমি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলাম না। আমার বোধ হইল, সুন্দরবনের জঙ্গল যে কিরূপ, তাহা তাহাদের মধ্যে কেহই আগে জানিত না। জানিলে তাহারা দয়াদিদির সঙ্গিনী হইতে সাহস করিত না।

আবার আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। গন্তব্যস্থানে পঁহুছিবার জন্য সকলেই অল্পাধিক উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। তবু কি ছাই এ পথের শেষ আছে! তাহার উপর এবারে কেবল গ্রাম্য পথে চলিয়াছি। অনেক সময়েই পথ এক একটা বিশাল আম্রকানন ভেদ করিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে এক একটা গ্রাম, বাহকগণের সানুনাসিক আবেদনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে বালকবালিকা-

গুলার মুখে উচ্চচীৎকার পূরিয়া পথের উভয় পার্শ্বে সেগুলাকে সমবেত করিতেছে। বিরক্ত হইয়া আমি পাল্কীতে শুইয়া পড়িলাম। শয়নের সঙ্গে সঙ্গে দিবসের মধ্যে এই সর্ব্বপ্রথম পিতামাতাকে স্মরণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বরাত্রির ঘটনাগুলাও মনোমধ্যে উদিত হইল। এই পাল্কীর মধ্যেই বদ্ধচক্ষে কাল আমি না পুত্রবিয়োগিনী জননীর আকুল আর্ত্তনাদ শুনিয়াছি? মুক্তচক্ষু লজ্জায় পলকের সাহায্যে আপনাকে অন্ধ করিতে চেষ্টা করিল। অমনি নিশীথের স্বতঃসঞ্চারী স্বপ্নবিষাদ দিবসের সংগোপনে আমার পলকমধ্যে অশ্রুবিন্দু রচনা করিল।

কিন্তু হায়, বিধাতা যে আজ আমাকে কাঁদিতে দেয় নাই। অশ্রুবিন্দু সুতরাং গণ্ডস্পর্শেরও অবকাশ্ পাইল না। অপাঙ্গে আশ্রয় লইতে না লইতে অসংখ্য বাদ্যভাণ্ডের বিকট আরাবে পথ হইতেই তাহা মুক্তাকাশে মিলাইয়া গেল।

মুখ বাহির করিয়া দেখি, আমি এক অপূর্ব্ব পুরীর পত্রপুষ্পপতাকা-সজ্জিত বিচিত্রতোরণ-দ্বার-সমীপে উপস্থিত হইয়াছি।

(৩৭)

একটা রোমান্স্ রচনা করিতে আমি এই হরণ-কাহিনীর অবতারণা করি নাই। কতকগুলি ঘটনা, একটির পর একটি, পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া, বিচিত্রভাবে পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটির সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার মধ্যে যদি কোনওটিতে রোমান্সের কিছু রঙ লাগিয়া থাকে, সেটি কেবল দয়াদিদির আকস্মিক অবস্থা-পরিবর্ত্তনে।

এখানে বলা অবান্তর হইবে না বুঝিয়া, যথাসম্ভব সংক্ষেপে ঘটনাগুলির

উল্লেখ করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশত্যাগের পূর্ব্বে পিতামহী দাক্ষায়ণীকে সঙ্গে লইয়া প্রথমেই তাঁহার পিতৃগৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, তাহাকে তাহার পিতামাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া, তিনি কাশীযাত্রা করিবেন; এবং জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন সেই স্থানেই অতিবাহিত করিবেন। দয়াময়ী তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিবে না জানিয়া, একমাত্র তাহাকেই তীর্থবাসের সঙ্গিনী করিতে তিনি মনস্থ করিয়াছিলেন।

দয়াদিদিও দাক্ষায়ণীর সঙ্গে তাহার পিতৃগৃহে উপস্থিত হইয়াছিল। পাকস্পর্শ-ক্রিয়া উপলক্ষে যে কয়দিন দাক্ষায়ণী আমাদের গৃহে অবস্থিত ছিল, সেই কয়দিন নিভৃতে এই ক্ষুদ্র বালিকার সঙ্গে দয়াময়ীর অনেক গোপন কথা চলিয়াছিল। সে কথা অন্যের জানা দূরে থাকুক, আমার পিতামহী পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। সে রহস্য-কথা কাহারও কাছে প্রকাশযোগ্য নয় বলিয়া, দীন তন্তুবায়কন্যা তাহা চিরদিন মন্ত্রের মত গোপন রাখিয়াছে। আজিও পর্য্যন্ত আমি তাহা জানিতে পারি নাই। জানিবার জন্য আমি দুই একবার দিদিকে অনুরোধ করিয়াছিলাম; দিদি অনুরোধ রাখে নাই। জিজ্ঞাসা করিলেই হাসিয়া উত্তর করিত—"ভাই! সে গুহ্য কথা। সে কথা শুনিবার অধিকার হইতে অকারণ তোমরা নিজদিগকে বঞ্চিত করিয়াছ। পতিব্রতার গুহ্য কথা। তুমি যদি অনুমান করিতে পার, তা হ'লে তুমিও ধন্য।"

সেই গভীর রহস্যাত্মক কথা আর তাহার কাছে জানিতে সাহস করি নাই। যথাশক্তি একটা অনুমান করিয়াছিলাম। কাহিনী-বর্ণনান্তে শ্রোতৃবর্গকেও আমি অনুমান করিবার ভার দিব।

পিতামহী—সার্ব্বভৌম ও তৎপত্নীকে দাক্ষায়ণী-গ্রহণে অনেক অনুরোধ

করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনুরোধ রাখেন নাই। বলিয়াছিলেন—"যাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার পৌত্রকে দান করিয়াছি, তাহাতে আপনারই সম্পূর্ণ অধিকার। তীর্থে দাক্ষায়ণী আপনার সেবায় জীবন সার্থক করিবে।"

পিতামহী ব্রাহ্মণদম্পতির কথায় আশ্বস্তা হইলেন না। তিনি দাক্ষায়ণীর পানে চাহিয়া তাঁহাদের বলিলেন—"এই এতটুকু বালিকা! সে বাপ মা ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে কেন? আমি ত আর ফিরিব না।"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া ব্রাহ্মণী দাক্ষায়ণীকে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া বালিকা নিজেই পিতামহীর প্রশ্নের উত্তর করিয়াছিল। দয়াদিদির মুখে যাহা শুনিয়াছি, দশ বৎসরের একটা ছোট মেয়ের মুখের সে কথা শুনাইয়া প্রতীচ্য জ্ঞান-গর্ব্বিত আপনাদের কাছে আমি হাস্যাস্পদ হইতে ইচ্ছা করি না। তবে সে কথা পিতামহীর নীরস চক্ষে জল আনিয়াছিল। তিনি তখনই পৌত্রবধূকে কোলে লইয়া বারংবার তাহার মুখচুম্বন করিয়াছিলেন। কোলে লইয়াই তিনি তাহার জনকজননীর নিকট হইতে চিরদিনের জন্য বিদায়গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিদায়-দানের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণী, দাক্ষায়ণীর মুক্ত কেশরাশি গুছাইয়া ঝুঁটির আকারে মাথার পুরোভাগে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। পিতা তাঁহার ব্যাহৃতি-হোমকুণ্ডের ভস্মের কিয়দংশ একটি অনতিবৃহৎ কাঠের কৌটায় পূরিয়া কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। মা দিয়াছিলেন—আর একটি কৌটাপূর্ণ করিয়া সিন্দুর।

জনক-জননীর দত্ত আয়তির উপযোগী এই অপূর্ব্ব সম্পত্তি লইয়া দাক্ষায়ণী আমার পিতামহীর সঙ্গে তাহার পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিল।

যখন তাহারা গৃহত্যাগ করিল, তখনও অনেকটা রাত্রি অবশিষ্ট ছিল। গ্রামের কেহ তাহাদের স্থানত্যাগ জানিতে পারে নাই। দাক্ষায়ণীর পূর্ব্বোক্ত দিদিমা সেই দিন স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। তিনিও বালিকার প্রব্রজ্যা জানিতে পারেন নাই।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী গ্রামপ্রান্ত পর্য্যন্ত পিতামহীর অনুসরণ করিয়াছিলেন। এই সময় পথ চলিতে চলিতে দাক্ষায়ণীর মাতা ও আমার পিতামহীর অগোচরে দয়াদিদির সঙ্গে ব্রাহ্মণের দুই চারিটা কথা হইয়াছিল। কথা কেন, দয়াময়ী আমার সঙ্গে দাক্ষায়ণীর সম্পর্ক সম্বন্ধে ব্রাহ্মণকে গোটাকতক প্রশ্ন করিয়াছিল।

হুগলীতে বকুলতলে ব্রাহ্মণ যথাসম্ভব শাস্ত্রের বিধান রক্ষা করিয়া আমাকে কন্যা উৎসর্গ করিয়াছিলেন। একমাত্র দয়াময়ী সে দানের সাক্ষী ছিল।

দয়াদিদি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর! আপনার এ কন্যার স্বামী কে?"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—"নারায়ণ ইহার স্বামী।"

"কোন্ নারায়ণ?"

প্রশ্ন শুনিয়া ব্রাহ্মণ সহসা তাহার কোনও উত্তর দিলেন না। রমণীর, বিশেষতঃ শূদ্রারমণীর মুখে এরূপ প্রশ্ন শুনিবার তিনি কখনও প্রত্যাশা করেন নাই। উত্তর দিলেন না কেন;—আমার বোধে, ব্রাহ্মণ উত্তর দিতে পারেন নাই।

দয়াদিদি বলিয়াছিল, বহুক্ষণ পথের দিকে চক্ষু রাখিয়া ব্রাহ্মণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। একটিও কথা কহিলেন না।

যখন তাঁহারা সকলে গ্রাম ছাড়িয়া প্রান্তরে প্রথম পাদক্ষেপ করিয়াছেন, নদীও নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তখন দয়াদিদি আবার জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর! বকুলতলে আমার সম্মুখে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, সেগুলা কি বিধিসঙ্গত হয় নাই?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"মা! তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য আমি বুঝিয়াছি।"

"আপনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সাধু। সত্যরক্ষার জন্য আপনি যে যে কাজ করিয়াছেন, তাহার মূল্য আপনি যেমন বুঝিয়াছেন, অন্যে তেমন বুঝিবে না।"

"মা! তুমি দেখিতেছি পরমা বুদ্ধিমতী। তুমি ত সে দানকালে উপস্থিত ছিলে। কার্য্যের কি কোন ত্রুটি তোমার বোধ হইয়াছে?"

"আমি এরূপ বিবাহ এ জন্মে আর কখনও দেখি নাই।"

"কি করিব মা! আমি তখন বিপন্ন। তাড়াতাড়ি দানকার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হইয়াছে। তবে যথাসম্ভব অনুষ্ঠানের আমি ত্রুটি করি নাই।"

"না ঠাকুর, তা বলিতেছি না। আমি জন্ম-জন্মান্তরের বহুপুণ্যে লক্ষ্মীনারায়ণের মিলন দেখিয়াছি। প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, লক্ষ্মী নারায়ণকে আশ্রয় করিয়াছে—নারায়ণকে আঁচলে বাঁধিয়া পথ চলিতেছে।"

"মা! আমারও সে সময়ে তাই বোধ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণীরও হইয়াছিল।" "তবে এরূপ করিলেন কেন?"

"কুশণ্ডিকার কথা কহিতেছ?"

"কুশণ্ডিকা কি আমি জানি না! কন্যা নারায়ণকে দিয়াছেন, এই বোধই যদি আপনার হইয়াছিল, তবে আবার একটা পাথর কন্যার গলায় ঝুলাইলেন কেন?"

"আমি এই শিলায় হরিহরের নারায়ণত্ব আরোপ করিয়াছি।"

"তার পর?"

"তার পর কি? আমি তোমার প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়াও যেন পারিতেছি না।"

"আপনার কন্যা পত্নীরূপে কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে?"

"তুমি কি মনে করিয়াছ, দাক্ষায়ণী হরিহরের আর কখন মিলন হইবে?"

"আপনি কি মনে করেন?"

"আমার ত মনে হয় না। তাহার গর্ব্বান্ধ পিতা এ দরিদ্রের কন্যাকে কখনও তাহার গৃহে স্থান দিবে না।"

"তিনি না দিলেও ইহাদের মিলনে বাধা কি? হরিহরের পিতামাতার দম্ভ কি এ মিলন রোধ করিতে পারে? সীতার মত দুঃখিনীর কথা কেহ কখন শুনে নাই। বিধাতা তাঁহাকে পতিসঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে নাই। এখন হরিহরের সঙ্গে যদি দাক্ষায়ণীর কখন সাক্ষাৎ হয়, দাক্ষায়ণী তাহাকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিবে?"

"যখন সীতার কথা তুলিলে, তখন বলি, রামচন্দ্র ত অশ্বমেধ যজ্ঞে সীতার স্বর্ণ-প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতেই সীতার অস্তিত্ব আরোপ করিয়াছিলেন; তাহাতেই আপনাকে সস্ত্রীক বোধে যজ্ঞকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন।"

"রামচন্দ্র পুরুষ মানুষ। স্বর্ণ-সীতা না করিয়া, আর একটা বিবাহ করিলেও তাঁর ক্ষতি ছিল না। সীতা ত আর একটা স্বর্ণ-রাম রচনা করিয়া, বাল্মীকির আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করেন নাই। সীতা তাঁহার হৃদয়ের

রামমূর্ত্তি ছাড়া বাহিরের কোন বস্তুতে পতির আরোপ করেন নাই। করিতে তাঁহার সতীত্ব নিষেধ করিয়াছিল। করিলে, আপনাকে পতি-পরিত্যক্তা মনে করিয়া, কখন তাঁহাকে আক্ষেপ করিতে হইত না।

"তুমি কে?" "আমি ঝি।" "তুমি স্বয়ং প্রজ্ঞা—ঝি কেন?"

"না ঠাকুর, বোকা তাঁতির মেয়েকে অমন গোলমেলে কথা বলিও না। তোমার কন্যার মূর্ত্তি দেখিয়া এ অন্ধের চোখ ফুটিয়াছে। তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া এ মূর্খ তাঁতিনীর জ্ঞান জন্মিয়াছে। হাঁ ঠাকুর, অনেক শাস্ত্র পড়িয়াছ; —বলিতে পার, নারীর সতীত্ব কি?"

"ব্রাহ্মণ সে সম্বন্ধে কোনও উত্তর না দিয়া একেবারে দাক্ষায়ণীর সমীপস্থ হইয়াই তাহাকে বলিলেন—"দাক্ষায়ণি!"

দাক্ষায়ণীর পিতামহীর হাত ধরিয়া পথ চলিতেছিল। পিতার সম্বোধন শুনিবামাত্র সে দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে পিতামহী ও তাহার মাতা দাঁড়াই-লেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া, দাক্ষায়ণীকে নিভৃতে লইয়া গেলেন।

দয়াদিদিও দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। নিকটে আসিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেও তাহাদের নিকট গেল না। তাহার যাইবার প্রয়োজন ছিল না। সে আগে হইতেই দাক্ষায়ণীর মনোভাব বিদিত হইয়াছিল। সুতরাং দাক্ষায়ণী যে কি উত্তর দিবে, তাহা আগে হইতেই তাহার জানা ছিল। সে সেই অন্ধের অজ্ঞেয় গুহ্য কথা।

নিভৃতেই পিতা ও পুত্রীর মধ্যে কতকগুলা প্রশ্নোত্তর হইল। কথা-শেষে ব্রাহ্মণ দয়াদিদির নিকটে আসিলেন। দাক্ষায়ণী আবার পিতামহীর কাছে চলিয়া গেল। নিকটস্থ হইয়া ব্রাহ্মণ দয়াদিদিকে বলিলেন—"মা!

মিছে শাস্ত্র পড়িয়াছি! শাস্ত্রের শব্দার্থ লইয়াই এতকাল কেবল সময় অতিবাহিত করিয়াছি; মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি নাই। কন্যাকে নারায়ণ-ব্রত গ্রহণ করাইয়াছি। পতিব্রতা হইতে উপদেশ দিয়াছি। অথচ ব্রতের মর্ম্ম বুঝি নাই। নারায়ণের সঙ্গে পতিব্রতার যে কি মধুর সম্বন্ধ, তাহা অগাধ শাস্ত্রজ্ঞানেও নির্ণয় করিতে পারি নাই। আমার পাণ্ডিত্যদম্ভ চূর্ণ হইয়াছে। শুন মা! এখন যদি আমার এই কন্যা এই বাল্যসন্ন্যাসিনীর মূর্ত্তিতে চণ্ডালেরও গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে, তোমরা নিমন্ত্রণ করিও। আমি সেই চণ্ডালান্ন গ্রহণ করিয়া আসিব। যাহার পূর্ব্বমূর্ত্তি এক যমকে নিয়মভঙ্গ করিতে বাধ্য করিয়াছে, আমি তাহাকেই কি না সাধারণ তৈজসপত্রের ন্যায় দানের বস্তু জ্ঞান করিয়াছি!"

এই কথা বলিয়াই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে প্রতিনিবৃত্তা হইতে আদেশ করিলেন। আশীর্ব্বাদ-প্রণামাদি কার্য্য সেই প্রান্তর-মধ্যে একরূপ নিঃশব্দে শুধু ইঙ্গিতে নিষ্পন্ন হইয়া গেল।

নদীতীরে উপস্থিত হইয়া পিতামহী একখানি শালতী ভাড়া করিলেন। দেশবাসীর অজ্ঞাতসারে, পশু-পক্ষীর অলক্ষ্যে, কাহার নাম লইয়া জানি না, তিনটি পরস্পরাশ্রয়কারিণী অনন্যসহায়া অবলা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন।

(৩৮)

দ্বিতীয় দিবস রাত্রির প্রথম প্রহরের পর সকলে কালীঘাটে উপস্থিত হইল। পিতামহী পঞ্চাশটি মাত্র টাকা পথের সম্বলস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে আশী টাকা তাঁহার নিজস্ব বোধে তিনি পিতাকে দিতে চাহিয়াছিলেন, টাকা কয়টি তাহারই ব্যয়াবশেষ। দাক্ষায়ণী যে সঙ্গিনী

হইবে, ইহা তাঁহার ধারণা ছিল না। তিনি মনে করিয়াছিলেন—দুই দুইটি বিধবা স্ত্রীলোক—পথের ব্যয়নির্ব্বাহ করিয়া যাহা থাকিবে, তাহাতে তাঁহাদের কাশীবাসের অন্ততঃ তিনটে মাসের সঙ্কুলান হইবে। কাশীতে গিয়াই তিনি গোবিন্দ-ঠাকুরদাকে পত্র লিখিবেন। পত্র পাইলেই ঠাকুরদা তাঁহার কাশীতে স্বচ্ছন্দবাসের ব্যবস্থা করিবেন। দেশে তাঁহার কাছে যাইবার কথা প্রকাশ করিলে, পাছে ঠাকুরদা বাধা দেন, এই জন্য তিনি তাঁহাকেও সঙ্কল্পের কথা শুনান নাই।

যদি পত্র পাইয়া ঠাকুরদা টাকা পাঠাইবার কোনও ব্যবস্থা না করিতে পারেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি! দুই দুইটা বিধবা। তাহাদের জীবনের মূল্য কি? যদি অন্নাভাবে উপবাসে ভারতের পবিত্রতম তীর্থে তাহাদের মৃত্যুই ঘটে, সেত হিন্দু বিধবার পরম ভাগ্যেরই কথা!

দয়াদিদির সঙ্গে কাশীবাস সম্বন্ধে পিতামহীর উক্ত পরামর্শ স্থির হইয়াছিল। দয়াদিদিও পিতামহীর কথায় সায় দিয়াছিলেন।

কিন্তু এখনত আর সে ব্যবস্থায় চলিবে না! তাঁহারা না হয় উপবাসে দুই একদিন অতিবাহিত করিতে পারেন, কিন্তু বালিকাকে তাঁহারা কেমন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপবাসী রাখিবেন?

শালতীতে যে সময় দাক্ষায়ণী ঘুমাইতেছিল, সেই সময় পিতামহী দয়াদিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হা দয়া, নাতবৌ সঙ্গে চলিল—এ সামান্ত সম্বল লইয়া, কি সাহসে কাশী যাইব?"

দয়াদিদি উত্তর করিল—"কাশী-প্রাপ্তি কি আর আমাদের অদৃষ্টে ঘটিবে?"

"তাই ত দেখিতেছি।"

"এখন ত ঘরের মায়া ত্যাগ করিয়াছ। প্রথমতঃ কালীঘাটে চল। তার পর দেখা যাক্, মা আমাদের কোথায় লইয়া যায়!"

"তাই ত দয়া, কোথায় যাইতেছি, তাতো বুঝিতে পারিতেছি না!"

"বুঝিবার দরকার কি ঠাকুর-মা? তুমি ত আর ঘরে ফিরিবে না, মনস্থ করিয়াছ?"

"ঘরে আর ফিরিব না।"

"তোমার নাতবৌএর যদি শ্বশুর-ঘর করা অদৃষ্টে থাকে?"

"থাকে, সে যাইবে।"

"তা হ'লে তুমি আর পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতেছ না?"

"তাহারা সম্পর্ক রাখিতে দিল কই, দয়া!"

"তবে তুমি স্থানের ভাবনা ভাবিতেছ কেন? সন্ন্যাসিনীর থাকিবার স্থানের অভাব কি!"

"সে তোর আমার বেলায় না হয় হইল। এই যে ননীর পুতুল সঙ্গে চলিল—"

"ঠিক এমন সময়ে দাক্ষায়ণী যেন ঘুমাইতে ঘুমাইতে বলিয়া উঠিল—"আমার জন্যও তোমাকে ভাবিতে হইবে না ঠাকুর মা!"

দয়াদিদি বলিয়াছিল—"তাহার কথা শুনিবামাত্র আমরা দুই জনেই চমকিয়া উঠিয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল, যেন কপটনিদ্রিতা চিরজাগরিতার কাছে আমরা জাগিয়া ঘুমাইতেছি। দাক্ষায়ণীর এক কথাতেই আমাদের ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল।

পিতামহী বলিলেন—"তাই ত নাতবৌ, তা হ'লে ত তুই আমাদের সকল কথা শুনিয়াছিস্!"

"শুনিয়াছি ঠাকুর মা।"

দয়াদিদি বলিলেন—"ওরে দুষ্টু মেয়ে, তুমি জাগিয়া ঘুমাইতেছ!"

"ঘুম চোখে কিছুতেই আসিতেছে না।"

পিতামহী বলিলেন—"তুই ভাই, আমাদের আসিবার সময়ে বাপমাকে জড়াইয়া ধরিলি না কেন?"

"জড়াইতে দিল কই? আমি একটা কথা কহিতে না কহিতে তাহারা তোমার সঙ্গে আমাকে যাইতে বলিল।"

"তুই যাইব না বলিলি না কেন?"

দাক্ষায়ণী এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। পিতামহী উত্তর না পাইয়া মনে করিলেন, দাক্ষায়ণী বড় অনিচ্ছায়, শুধু পিতা-মাতার শাসনে তাহাদের সঙ্গে যাইতেছে। তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"তাই ত ভাই, তোর বাপ মা কি নিষ্ঠুর! পণ্ডিত হইলেই কি মানুষকে নির্ম্মম হইতে হয়!'

"বাবাকে নিষ্ঠুর কেমন করিয়া বলিব! বাবা ত আমাকে ঘরে রাখিতে চাহিয়াছিল।" "তবে?" "মা থাকিতে দিল না।" "মা দিল না?"

"না। বলিল, বিদেশে আমাকে তোমার সেবা করিতে হইবে।"

"কেন, আমার কি সেবা করিবার লোক নাই?" "কই?"

"কেন, তোর দয়া-ঠাকুরঝি কি করিতে সঙ্গে চলিয়াছে?"

পিতামহী দয়াদিদির সঙ্গে দাক্ষায়ণীর সম্বন্ধ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। তবে ক্ষুদ্র বালিকার মুখে ঠাকুরঝি কথাটা শোভা পায় না বলিয়া দয়াময়ী তাহাকে দিদি বলিতে উপদেশ দিয়াছিল।

দাক্ষায়ণী বলিল—"দিদি তোমাকে রাঁধিয়া দিলে তুমি খাইতে পারিবে?"

"তুই আমার সঙ্গে রাঁধুনী চলিয়াছিস্ নাকি ?"

"নয় ত কি ?"

"এই বিধবা বুড়ীর পেট পূরাইতে তোকে হাত পুড়াইয়া রাঁধিতে হইবে ?"

"আমি আর দিদি ছাড়া তোমার আর কেউ নেই যে ঠাকুরমা !"

পিতামহী এ কথার কোনও উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নিশ্বাসশব্দ দাক্ষায়ণীর কানে পশিল। সে অমনি বলিয়া উঠিল—"তবে কি তুমি আমারও সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবে না ?"

"এ প্রশ্নেরও পিতামহী উত্তর করিলেন না। তিনি আমার পিতাকে উদ্দেশ করিয়া আক্ষেপের সহিত বলিয়া উঠিলেন—'হা হতভাগ্য সন্তান !'

মনের আবেগে পিতামহী পুত্রকে তিরস্কারচ্ছলে আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন ; দাক্ষায়ণী বাধা দিয়া বলিল—"ঠাকুরমা ! মা আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, শ্বশুর-শাশুড়ীর নিন্দা কখনও করিও না—কাহারও মুখে তাঁহাদের নিন্দা শুনিও না।"

দয়াদিদি এতক্ষণ চুপ করিয়া দাক্ষায়ণীর কথা শুনিতেছিল ; এইবারে সে পিতামহীর হইয়া উত্তর করিল—"ঠাকুরমা যে তাঁদের মা !"

"আর আমি যে তাঁদের বউ !"

"কেহ যদি তোর সুমুখে তাদের নিন্দা করে, তা হ'লে তুই কি করবি ?" "তখনি সে স্থান ত্যাগ করিব।"

"আমরা যদি নিন্দা করি ?"

"কেন তোমরা নিন্দা করিবে ? বাবা ও মা আমাকে ত দেখে

নাই—আমিও তাদের দেখি নাই। তখন তোমরা কেন তাদের নিন্দা আমার কাছে করিবে? তোমাদের অধর্ম্ম হবে না?"

দয়াদিদি আমাকে বলিয়াছিল—"ভাই! আমি তোমাকে দাক্ষায়ণীর কথা শুনাইলাম, কিন্তু তাহার কথার ঝঙ্কার শুনাইতে পারিলাম না। নির্জ্জনে তাহার মর্ম্মকথা শুনিয়াছিলাম। এখন পিতামহীর সঙ্গে তাহার বাহিরের কথা শুনিতেছিলাম। শুনিয়া বড়ই আমোদ উপভোগ করিতে-ছিলাম। আনন্দে একটু আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম। দাক্ষায়ণীর কথার ঝঙ্কার শুনিয়া আমার নীরব হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু আনন্দের আধিক্যবশে আর একটা কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"কথা কহিবার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। তোমাদের হুগলী হইতে আসিবার পর হইতেই ঠাকুরমার মর্ম্মবেদনা একরূপ অসহ্য হইয়াছিল। আমি তোমাকেও না জানাইয়া বাসা হইতে পলাইয়া আসিয়াছিলাম। মনে করিও না যে, স্বেচ্ছায় আসিয়াছি। তোমার বিবাহের ঘটকালী করিতে গিয়া আমি পুরস্কারের উপর পুরস্কার পাইয়াছি। তার মধ্যে একটা পুরস্কার ঠাকুরমায়ের সঙ্গ। হুগলীতে বড় সৌভাগ্যে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা। নইলে তোমার বাপের মতন না-হিন্দু, না-কৃশ্চান, না-কিছু আবার কোন বাবুর ঘরে আমাকে দাসীবৃত্তি করিতে হইত। বাপমায়ের পুণ্যে ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা। দেখার সঙ্গে সঙ্গে পরিচয়। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিমন্ত্রণ। ভাই! সে বড় অনুরোধের নিমন্ত্রণ—আমি এড়াইতে পারিলাম না।

"ঠাকুরমা'র দাসীবৃত্তি করিতে আসিয়া দেখি, তোমরা তার মনে

বড়ই ঘা দিয়াছ। অমন ধীর শান্ত মেয়ে আমি দেখি নাই। তোমরা তাহাকে চঞ্চল করিয়াছ।

"স্বামীর স্বর্গচ্যুতি-ভয়ে ঠাকুরমা চঞ্চল। ব্রাহ্মণের অকার্য্য ম্লেচ্ছের চাকুরি। যে বাপ মুখে রক্ত তুলিয়া সন্তানকে লেখাপড়া শিখাইয়াছে, পূজারীর দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া হাকিমের আসনে বসাইয়া দিয়াছে, সেই সন্তান পিতৃসত্য পালন করিল না। তাঁহার পরকালের কাজও করিল না।

"তোমাদের বাড়ীতে আসিয়া অবধি একদণ্ডের জন্য ঠাকুর-মার মর্ম্মব্যথার বিরাম দেখি নাই। দাক্ষায়ণীকে ঘরে আনিবার পর হইতে সে ব্যথা আবার চতুর্গুণ বাড়িয়াছে।

"বিবাহের যেমন অনুষ্ঠান, দাক্ষায়ণীর বিবাহ-ব্যাপারে ঠাকুরমা সে অনুষ্ঠানের কিছুই দেখিতে পান্ নাই। গোবিন্দ ঠাকুর-দা'র উৎসাহে, সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সত্য কথায়, গ্রামবাসীদের আশ্বাসবাক্যে—উপায়ান্তর না দেখিয়া—দাক্ষায়ণীকে তিনি পৌত্রবধূ স্বীকার করিয়াছেন। তাহার হাতের রান্না মুখে দিয়াছেন। কিন্তু সেকালের গৃহিণী এখনও বুঝিতে পারেন নাই, হরিহরের সঙ্গে দাক্ষায়ণীর কখন্ কেমন করিয়া বিবাহ হইল!

"সেই সমস্ত মর্ম্মবেদনার কথা আমি শুনিয়াছি। শুনিয়া অশ্রুজল ফেলিয়াছি। শূদ্রের মেয়ে তোমাদের বিবাহ-রহস্য যখন বুঝি নাই, তখন ঠাকুরমাকে সান্ত্বনা দিবারও কোনও উপায় দেখি নাই।

"অথচ কয়দিনের একত্রবাসে দাক্ষায়ণীর উপর ঠাকুরমার যে মমতা পড়িয়াছে, ভাই, আমার মনে হয়, তোমার পিতা, এমন কি তুমি পর্য্যন্ত সে মমতা পাও নাই।

"অন্যান্য কারণের মধ্যে পাড়াপড়সীর কাছে মুখ দেখানোর লজ্জা হইতে আত্মরক্ষাও তাঁহার গৃহত্যাগের একটা কারণ ছিল।

"একদিনের নির্জ্জন কথায় আমি দাক্ষায়ণীর সঙ্গে তোমার ও সেই সঙ্গে ঠাকুরমার সম্পর্ক বুঝিয়াছিলাম। সেই দাক্ষায়ণীর সঙ্গে ঠাকুরমার সম্পর্ক লইয়া কথাবার্ত্তায় আমি বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। সম্পর্কটা ঠাকুরমাকে পরিস্ফুট করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। আমরণকাল বৃদ্ধা যাহাকে পথের সঙ্গিনী করিতে চলিয়াছে, যাহার হাতের রান্না খাইয়া তাহাকে জীবনরক্ষা করিতে হইবে, সে তার কে, এটা বুড়ীকে বুঝাইতে না পারিলে আমারই বা মনে শান্তি আসিবে কেন? এই জন্য আমিও আর নীরব না রহিয়া তাহাদের কথায় যোগ দিয়াছিলাম।

"তাহার কথার ঝঙ্কারে নিরস্ত না হইয়া আমি আবার বলিলাম—'তা যা হইবার হইবে, আমরা তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীর নিন্দা করিতে ছাড়িব না। যখন নিন্দার কাজ করিতে পারে, তখন আমরা তাহা বলিতে পারি না?'

"এই কথা যেমন বলা, অমনি দাক্ষায়ণী, পাগলিনীর মত, আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে 'ছই' হইতে বাহির হইবার জন্য স্থানত্যাগ করিয়া ছুটিল। উঠিতে গিয়া তাহার মাথায় ছইএর আঘাত লাগিল। বালিকা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না। সে আমাকে ডিঙ্গাইয়া, ঠাকুরমাকে ডিঙ্গাইয়া বাহিরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল।

"ঠাকুরমা বালিকাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাহাকে দুই হাতে বেষ্টন করিয়া বক্ষের মধ্যে টানিয়া বলিলেন—'দাক্ষায়ণি, তুই ছাড়া আপনার

বলিবার আমি আর কাহাকেও দেখিতেছি না। তুইও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবি ?'

"আমি তাহার পা দুটা জড়াইয়া ধরিলাম। আর কখন তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীর নিন্দা আমার মুখ হইতে বাহির হইবে না শুনিয়া, বালিকার ক্রোধ দূর হইল।

"ভাই! মন-মুখ এক না হইলে সতী হয় না। পতিধর্ম্মে সতীর রহস্য পর্য্যন্ত সয় না।

"সেই দিন হইতে আর একটি দিনের জন্যও আমি তোমাদের কথা লইয়া দাক্ষায়ণীকে রহস্য করি নাই।

"ঠাকুরমাও তখন হইতে আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার মনে সাহস আসিল। তিনি বুঝিলেন, পবিত্রা কুলবধূর আবির্ভাবে, তাঁহার অঙ্গীকার-যুক্ত স্বামীর স্বর্গের পথ মুক্ত হইয়াছে। আঁচলে তীর্থ বাঁধা পড়িয়াছে। পথের বিভীষিকা মিটিয়াছে।"

*　　*　　*　　*

"যখন কালীঘাটে শালতী পৌঁছিল, তখন রাত্রি প্রায় দশটা। মায়ের আরতি হইয়া গিয়াছে। স্থান ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ হইতেছে।

"তীরে উঠা যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া আমরা সে রাত্রি শালতীতেই মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিলাম।"

(৩৯)

"সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বে একটা বিকট চীৎকারে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া দেখি, অসংখ্য লোক বাঁধাঘাটে জড় হইয়াছে। ঘাট

হইতে গঙ্গার জল পর্য্যন্ত পরদায়-ঘেরা একটা পথ প্রস্তুত হইয়াছে। আর সেই পরদার পার্শ্বে অসংখ্য কাঙ্গালী কর্কশ-কণ্ঠে 'রাণীমায়ীকি জয়' বলিয়া অনবরত চীৎকার করিতেছে।

"বুঝিলাম, কোন ধনি-গৃহিণী আজ তীর্থদর্শনে আসিয়াছে। আমি স্ত্রীলোক। রাণীকে দেখিতে আমার বাধা ছিল না। কৌতূহলপরবশ হইয়া আমি শালতী হইতে তীরে নামিলাম।

"শয়নকালে আমি স্থানপরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম। ঘুমের ঘোরে পাছে ব্রাহ্মণকন্যার অঙ্গে পা ঠেকিয়া যায়, এই ভয়ে ছইয়ের বাহিরে পা রাখিয়া আমি একরূপ বহির্ভাগেই শুইয়াছিলাম। ঠাকুর ছিলেন ছইএর অপর দিকে। মধ্যভাগে ছিল দাক্ষায়ণী।

"রাণী দেখিবার আগ্রহে আমি তাহাদের দিকে আর লক্ষ্য করি নাই। যেখানে আমাদের শালতী বাঁধা ছিল, ঘাট সেখান হইতে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ হাত দূরে।

"তীরভূমি ধরিয়া যেই আমি ঘাটে উঠিতে যাইতেছি, অমনি এক নিদারুণ দৃশ্যে আমার মর্ম্মভেদ হইয়া গেল।

"দেখি—দাক্ষায়ণী ঘাটের পার্শ্বে একস্থানে জলে কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসিয়া আছে। বসিয়া আছে বলি কেন, পড়িয়া আছে। এক বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী তাহাকে ধরিয়া, তাহার মুখে, চোখে, অঙ্গে জল দিয়া সর্ব্বাঙ্গের কাদা ধুইয়া দিতেছে। সে কেবল দুইহাতে গলার পুঁটুলিটি ধরিয়া আছে।

"আমি ঘুমাই নাই—মরিয়াছিলাম! নইলে দাক্ষায়ণী উঠিয়া আসিয়াছে, আমি জানিতে পারিলাম না কেন? সে প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠে, আমি

জানিতাম, কিন্তু সে দিনও যে, প্রত্যুষে উঠিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। প্রত্যুষে উঠিয়া সকলের অলক্ষ্যে সে গলার ঠাকুরটির পূজা করিত। শয্যায় বসিয়াই পূজা করিত। কিন্তু সে দিন কি জানি কেন, গঙ্গাতীরে গঙ্গাজলে তাঁহার পূজা করিতে সে উঠিয়া আসিয়াছিল। এমন সময় অসংখ্য অনুচর ও কাঙ্গালী সঙ্গে লইয়া, পাল্কীতে চড়িয়া কোথাকার রাণী গঙ্গাস্নানে আসিল।

"অনেক লোক—সকলে যে যার স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত। অন্ধকারে ঘাটের ধারে কোথায় একটি ক্ষুদ্র বালিকা ছিল, তাহা কেহ দেখিতে পায় নাই। অথবা পশুগুলা দেখিয়াও দেখে নাই। রাণীর আবরু বজায় রাখিতে ব্যস্ত চাকর-দরোয়ানগুলার ঠেলাঠেলিতে বালিকা শানের উপর পড়িয়া গিয়াছে! পড়িয়া শরীরের নানা স্থানে আঘাত পাইয়াছে। বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী দৈববশে সেখানে উপস্থিত না থাকিলে, পশুগুলার পায়ের তলায় পড়িয়া দাক্ষায়ণীর জীবন থাকিত কি না সন্দেহ।

"আমি দাক্ষায়ণীকে ডাকিলাম। বালিকা তখনও ক্লান্ত। উত্তর দিতে তাহার শক্তি ছিল না। ব্রহ্মচারী হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে আমাকে প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিলেন।

"আর প্রশ্ন না করিয়া আমি ঘাটের উপর উঠিলাম। ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিয়াছে। আমি জ্ঞানশূন্যের মত হইয়াছি। সে কত বড় রাণী, একবার আমি দেখিব।

"আমি হাতে পায়ে ভর দিয়া ঘাটে উঠিলাম। সেখান হইতে রাণী-দর্শনের সুবিধা হইল না। আমি লোক ঠেলিয়া জলে পড়িলাম। চাকর-দরোয়ানগুলা পরদার খুঁটি ধরিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশেষেরটা

কোমর পর্য্যন্ত জলে নামিয়াছিল। আমি সাঁতারিয়া তাকে অতিক্রম করিলাম। একেবারে রাণীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

"দেখি—পরদার ভিতরে কতকগুলা মেয়ে কিল-বিল করিতেছে। তাহাদের মধ্যে সধবা-বিধবা দুই আছে। তাহার মধ্যে কোন্‌টা রাণী, কোন্‌টা কে, কিছুই আমি তখন দেখি নাই।

"আমাকে দেখিবামাত্র তাহাদের ভিতর হইতে একটা মেয়ে বলিয়া উঠিল—"আরে মর্! এখানে কি?"

"সে আমাকে ভিখারিণীই মনে করিয়াছিল। আমি বলিলাম—'ভয় নাই। আমি ভিক্ষা করিতে আসি নাই।'

"সে বলিল—'তবে কি করিতে আসিয়াছিস্'?"

'তোমাদের মুণ্ডপাত করিতে আসিয়াছি।'

"এই বলিয়া আমি—যাহা জীবনে কখন করি নাই—তীব্র—নারীর পক্ষে অতি তীব্র ভাষায় তাহাদের গালি দিলাম। এখন তাহা মুখে আনিতে লজ্জা করে।

"আমার গালি শুনিয়া সকলে কিয়ৎক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তার পর একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—'কি হইয়াছে?'

"তাহার মুখ দেখিয়া, কথা শুনিয়া বুঝিলাম, সেই রাণী। তখনও আমার ক্রোধের তীব্রতার উপশম হয় নাই। আমি উত্তর করিলাম 'পরদা উঠাইয়া কি করিয়াছিস্, দেখিয়া আয়। সতীর বুকে পা দিয়া সতীর রাজ্যে ধর্ম্ম করিতে আসিয়াছিস্?'

"তার পর আরও কত কি বলিয়াছিলাম—সমস্ত আমার মনে নাই। তবে আমার মনে আছে, তাহার ঐশ্বর্য্যের ও বৈধব্যের অনুচিত অঙ্গসৌষ্ঠবে

আমি যথেষ্ট অগ্নিসংযোগ করিয়াছিলাম। তাহার নরজন্মে ধিক্কার দিয়াছিলাম।

"অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া গেল। তাহার সঙ্গিনীগুলা আমাকে গাল দিবার উপক্রম করিতে না করিতে আমি আবার সাঁতারিয়া নিজস্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

"বাহিরের অনেক লোক আমার যাতায়াত দেখিল, দরোয়ান-চাকরগুলার কেহ কেহও যে দেখিল না, এরূপ নহে। কিন্তু ব্যাপারটা কি হইল, কেহ বড় বুঝিতে পারিল না। বাহিরের কোলাহলে আমার তীব্র তিরস্কার ডুবিয়া গিয়াছিল।

"ফিরিয়া দেখি, ব্রহ্মচারী তখনও পর্য্যন্ত দাক্ষায়ণীর শুশ্রূষা করিতেছেন। দাক্ষায়ণীও অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। সে দাঁড়াইয়াছে।

"তাহার অঙ্গে ত আঘাত লাগে নাই; সে আঘাত আমার বুকের পাঁজরা যেন চূর্ণ করিতেছিল! আমি চোখের জল রোধ করিতে পারিলাম না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম—'আমাকে কেন লুকাইয়া চলিয়া আসিলি ভাই? এখনি আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলি!'

"আমার আত্মীয়তার কথা, আমার মুখের 'ভাই' শব্দ শুনিয়া ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন—'হাঁ মা! এটি তোমার কে?'

"তখনও পর্য্যন্ত আমার মেজাজ ঠাণ্ডা হয় নাই। ব্রহ্মচারীর বাক্যে তাহাকে আমার মূর্খ বলিয়াই বোধ হইল। মনে হইল, সে দৃষ্টিহীন। তার ব্রহ্মচর্য্যের এখনও কোন ফল হয় নাই। আমি উত্তর করিলাম—'এটি কি শুধু আমার কে? এতক্ষণ তবে কি শুশ্রূষা করিলে ব্রাহ্মণ?'

'সাক্ষাৎ গৌরী!'

"'তাই বলুন। আমি এটিকে পথে কুড়াইয়া পাইয়াছি। কিন্তু ঠাকুর, পথেই বুঝি ইহাকে আজ হারাইতে বসিয়াছিলাম।'

"ব্রাহ্মণ আমাকে কথা শেষ করিতে দিলেন না! বলিলেন—'মা, পথে হারাইবার সামগ্রী নয়। সুতরাং মায়ের এ ভূপতনে আক্ষেপ করিও না। সতী আজ মাটীতে পড়িয়া ধূলায় ধূসরিত হইয়া, কোমল অঙ্গে আঘাত লইয়া পথের কণ্টক দূর করিয়াছেন। পথ আজ মুক্ত।'

"ব্রাহ্মণের আশ্বাস-বাণীর অর্থ বুঝিলাম না। কিন্তু আশ্বাসে মনে আনন্দ হইল। আমি তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। দাক্ষায়ণীকে প্রণাম করাইতে গেলাম, ব্রাহ্মণ প্রণাম গ্রহণ করিলেন না। অগত্যা দাক্ষায়ণীকে কোলে তুলিয়া লইলাম। এতক্ষণ ঠাকুরমা হয় ত জাগিয়াছেন। উভয়কেই না দেখিয়া হয় ত ব্যাকুলভাবে আমাদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

"ঘাটের নিকট হইতে পাঁচ ছয় হাত অন্তর হইয়াছি, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে বলিল—'একবার দাঁড়াও।'

"ফিরিয়া দেখি, এক বৃদ্ধ ঘাট হইতে নামিয়া তীরভূমি ধরিয়া আমাদের অনুসরণ করিতেছে। আমি দাঁড়াইতে, বৃদ্ধ আমার নিকট আসিল। এবং দাক্ষায়ণীর আঘাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। পরিচয়ে জানিলাম, সে ব্যক্তি রাণীর কর্ম্মচারী।

"আমি তাহাকে দাক্ষায়ণীর অঙ্গে আঘাত-চিহ্ন দেখাইলাম। ইত্যবসরে দেখি, ঠাকুর-মাও শালতী পরিত্যাগ করিয়া আমাদের কাছে আসিয়াছেন।

"ঠাকুর-মা দাক্ষায়ণীর অবস্থা দেখিয়া ব্যাকুলতার সহিত আমাকে

কতকগুলা প্রশ্ন করিলেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরেই বৃদ্ধ সমস্ত ঘটনা অবগত হইল। দাক্ষায়ণীর মাথায় এক স্থানের ক্ষত হইতে তখনও পর্য্যন্ত অল্প রক্ত পড়িতেছিল।

"বৃদ্ধ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিল। ঠাকুর-মা সমস্ত দোষ দাক্ষায়ণীর স্কন্ধে আরোপ করিয়া, তাহাকে দুঃখ করিতে নিষেধ করিলেন। কেন সে গিন্নী-বুড়ীর মত কাহাকেও না জানাইয়া অমন অসময়ে ঘাটে গিয়াছিল? মাটীতে পড়িয়াছিল, তাই বালিকাকে ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে। আদিগঙ্গার খরস্রোতে পড়িলে কি সর্ব্বনাশ যে না ঘটিতে পারিত, তাহা কে বলিবে?

"বৃদ্ধ সেই সময় দাক্ষায়ণীর সঙ্গে ঠাকুরমার সম্বন্ধের পরিচয় পাইল। তাহার গলার পুঁটুলিটিরও পরিচয় এই সঙ্গে বৃদ্ধ জানিতে পারিল।

"জানিয়া, ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া, গললগ্নীকৃতবাসে ক্ষমা চাহিয়া বৃদ্ধ স্থানত্যাগ করিল।

"এদিকেও দেখি, কোলাহলচীৎকার সঙ্গে লইয়া, রাণী ঘাট ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।"

(৪০)

"আমরা ভিখারিণীর পথ ধরিয়াছি, কিন্তু ভিখারিণীর ভাব এখনও ধরিতে পারি নাই। চক্ষু-লজ্জায় তিনটি প্রাণী এক সঙ্গে কোনও গৃহস্থের বাড়ী আশ্রয় লইতে পারি নাই। পরদিন যাহা অদৃষ্টে থাকে ঘটিবে, এই মনে করিয়া সেদিনের মত মন্দিরের কাছেই এক চটিতে বাসা লইয়াছি।

"দেবী-দর্শনান্তে আহারাদি শেষ করিয়া আমরা তিন জনে একটা

চ্যাটাইএর উপর বসিয়া বিশ্রাম লইতেছিলাম। আমি দাক্ষায়ণীর অঙ্গের কোথায় কিরূপ আঘাত লাগিয়াছে, পরীক্ষা করিতেছিলাম। ইহার পূর্ব্বেও বার দুই তিন পরীক্ষা করিয়াছি। তাহাতেও মনস্তুষ্টি হয় নাই, আবার করিতেছি। আহত স্থানগুলির কোথায় কিরূপ ব্যথা হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিতেছি। ঠাকুরমা চিন্তান্বিতার মত নীরবে চ্যাটাইএর এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন।

"এমন সময় সেই প্রাতঃকালের বৃদ্ধ একটি স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া আমাদের চটির মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি দূর হইতে দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তাহারা আমাদের দেখিতে পায় নাই। আমি দেখিলাম, সে চটি-ওয়ালাকে কি বলিল। কি বলিল, শুনিতে পাইলাম না। চটিওয়ালা কি উত্তর করিল—তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু মনে হইল, তাহারা যেন আমাদেরই অন্বেষণ করিতেছে। দেখি, লোকটা উত্তর শুনিয়া চলিয়া যায়। কাহাকে অন্বেষণ করিতেছে, জানিতে আমার সাধ হইল। আমি সেই দূর হইতেই বৃদ্ধকে ডাকিলাম। আমাকে দেখিয়াই বৃদ্ধ উল্লাসের সহিত বলিয়া উঠিল—'এই যে মা, তুমি এইখানেই রহিয়াছ!'

"বুঝিলাম, বৃদ্ধ আমাদিগকেই খুঁজিতেছিল। চটিওয়ালা হয় তাহার কথা বুঝিতে পারে নাই; নয় বুঝিয়াও বুঝে নাই। হয় ত তাহার মনে দুরভিসন্ধি ছিল। চটিওয়ালার প্রতি বৃদ্ধের তিরস্কারে সেটা কতকটা অনুমান করিলাম। এদিকেও আমরা দেখিতেছি, চটিতে অন্যান্য যে সকল তীর্থযাত্রী আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা আহারাদি শেষ করিয়া একে একে চটি পরিত্যাগ করিল। আমরা তিনটি প্রাণীই কেবল অন্যত্র স্থানাভাবে পড়িয়া আছি। চটিওয়ালা এর পূর্ব্বে বার দুই তিন সেখানে আমাদের

রাত্রিবাসের সঙ্কল্প জানিয়া লইয়াছে এবং সেখানে স্বচ্ছন্দে থাকিবার আশ্বাস দিয়াছে।

"বৃদ্ধের তিরস্কারে চটিওয়ালা, বোধ হইল, যেন মূর্খতার ভাণ দেখাইল। সে বলিল—'আপনি যে ইহাদেরই খুঁজিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই।' সুতরাং আমার প্রতি উল্লাসযুক্ত সম্বোধন, আমার পক্ষে আত্মীয়ের আশ্বাস বলিয়াই বোধ হইল।

"তথাপি সে কি কথা কহিবে জানি না। ঠাকুরমার সম্মুখে কথা-বার্ত্তা কহিবার ইচ্ছা ছিল না বলিয়া, আমি উঠিয়া তাহার নিকটে গেলাম।

"বৃদ্ধ বলিল—'মা! তোমাকে খুঁজিতে সারা চটি ঘুরিয়া বেড়াইতেছি!'

"আমি বলিলাম—'কেন?'

"বৃদ্ধ।—একবার রাণী মার সঙ্গে তোমাকে সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

"আমি।—কিসের জন্য?"

বৃদ্ধ।—তা মা আমি বলিতে পারি না।

"এই সময়ে আমি একবার তাহার সঙ্গিনী স্ত্রীলোকের পানে চাহিলাম। দেখিয়া বুঝিলাম, স্নানের সময় সে রাণীর সঙ্গে ছিল। আমি তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলাম—'কি গো! আমাকে তোরা ধরিয়া জেলে দিবি নাকি?'

"'না মা, রাণীমার মনে বড়ই কষ্ট হইয়াছে। একবার তোমার সঙ্গে গোটা দুই কথা কহিলে তিনি নিশ্চিন্ত হন।'

"মুখে যাই বলি, দাক্ষায়ণী ও ঠাকুরমার ভবিষ্যতের চিন্তায় আমি ব্যাকুল হইয়াছিলাম। আজ চটিতে বালিকাকে লইয়া রাত্রিবাস করিতেই আমার ভয় করিতেছে। ভয় বলি কেন, রাত্রিবাসের কথা মনে উঠিতেই

আমার বুক গুর-গুর করিতেছে। কালীঘাট বড় বিষম স্থান। ঠাকুরমার কাছে কিছু টাকাও আছে। চটিওয়ালাকেও বিশ্বাস নাই। মা-কালীর কাছে প্রাতঃকালে, সেই জন্য অবিরাম মাথা খুঁড়িয়া, আমি একটি আশ্রয় চাহিয়াছিলাম।

"স্ত্রীলোকটির কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলাম। মন যাইতেই আমাকে আদেশ করিল। আমি বলিলাম—'চল।'

"ঠাকুরমার কাছে কিছুক্ষণের জন্য বিদায় লইলাম, এবং আমার ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তাহাদের চটির বাহির হইতে নিষেধ করিয়া বৃদ্ধের অনুসরণ করিলাম।"

* * * *

কোথা হইতে কেমন করিয়া এক একটা ঘটনার এরূপ বিচিত্র ভাবে সংযোগ উপস্থিত হয় যে, তাহাকে দৈব না বলিয়া থাকিবার যো নাই। তাহার স্বাভাবিক কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ যে নির্ণয় করিতে পারা যায় না, এরূপ নহে। কিন্তু করিতে গেলে ঘটনার গাম্ভীর্য্যের যেন অনেকটা হানি ঘটে। তাহার কাব্য-মাধুর্য্যটুকুও বিনষ্ট হইয়া যায়।

দয়াদিদি বলিয়াছিল—"সে দিন অরুণোদয় হইতে রাত্রিকাল পর্য্যন্ত যেন একটা দৈবলীলার স্রোত চলিয়াছিল। সেই অদ্ভুত ঘটনাপরম্পরার মধ্যে আমি যেন অঘটনঘটনপটীয়সী মহামায়ার হাত স্পষ্টই দেখিতে পাইয়াছিলাম।

"চটির বাহিরে পা দিয়াই দেখি, চারিজন বেহারা একখানি পাল্কী চটির সম্মুখে রাস্তায় রক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পাল্কীর পার্শ্বে একজন দরোয়ান।

"বৃদ্ধের আবাহনের ভাবে বুঝিয়াছিলাম—পাল্কী আমাকেই লইয়া

যাইবার জন্য। তথাপি আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'এ রাণীর পাল্কী এখানে কেন?'

"স্ত্রীলোকটি উত্তর করিল—'তোমাকেই লইয়া যাইবার জন্য।'

"আমি তাহাকে নিজের মলিন বস্ত্র দেখাইয়া বলিলাম—'ঝিকে কি তামাসা করিবার জন্য তোমাদের রাণী এই পাল্কী পাঠাইয়াছেন? পদব্রজে চল—আমি পাল্কীতে উঠিব না।'

"বৃদ্ধ বলিল—'রাণী মা'র আদেশ। আপনি না উঠিলে আমাদিগকে তিরস্কার পাইতে হইবে। বিশেষতঃ আমাদের বাসা এখান হইতে নিতান্ত নিকটে নয়।'

"আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম—'তার পর? কা'ল যখন ভিক্ষার ঝুলি লইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইব?'

"স্ত্রীলোকটি বলিল—'তুমি প্রবেশ কর। আমি পাল্কীর দ্বার বন্ধ করিয়া দিতেছি। কেহ তোমাকে দেখিতে পাইবে না।'

'আমাকে উঠিতেই হইবে?' 'উঠিতেই হইবে।'

'তবে শুন, যদি একেবারে বাড়ীর অন্দরে পাল্কী লইয়া রাণীর সম্মুখে দ্বার মুক্ত কর, তবেই আমি উঠি, নহিলে উঠিব না।'

"বৃদ্ধ বলিল—'তাহাই হইবে।'

"আমি পাল্কীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম।"

* * * *

"কিছুক্ষণ ধরিয়াই আমি চলিতেছি। প্রতি মুহূর্ত্তেই বন্ধ পাল্কীর ভিতরে বসিয়া আমি রাণীর বাসার দুয়ারে পৌঁছিবার আশা করিতেছি। [illegible] কই, এখনও ত পাল্কীর গতি ও বেহারাদের চীৎকারের বিরাম হইল

না! এ তবে আমি কোথায় চলিতেছি! নিতান্ত নিকটে নয় কেন, রাণীর বাসা চটি হইতে যে অনেক দূর! তাই ত! পৌঁছিয়া রাণীর সঙ্গে বাক্যালাপ শেষ করিয়া চটিতে ফিরিতে যে রাত্রি হইবে! ঠাকুরমা যে চিন্তাভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িবেন! তাঁহাকে ত কোন কথা বলিয়া আসিতে পারি নাই!

"ভীত হইয়া আমি পাল্কীর দরজা খুলিয়া ফেলিলাম। খুলিতেই—কি আশ্চর্য্য!—দেখি, ব্রহ্মচারী পাল্কী হইতে কিছু দূরে পথ ধরিয়া বিপরীত মুখে চলিয়াছেন। দরজা খুলিতেই তাঁহার দৃষ্টি আমার উপর পড়িয়া গেল। আমি দুই হাত জোড় করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি অমনি হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও মুখ ফিরাইয়া গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন! আপনা আপনি মনে আশ্বাস আসিল। আমি একেবারে দরজা বন্ধ করিলাম।

"অল্প দূর যাইতে না যাইতেই এবারে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমি এক কোলাহলপূর্ণ বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি।

"দ্বার পার করিয়া, উঠান পার করিয়া, জনকোলাহল পশ্চাতে রাখিয়া বেহারারা যে স্থানে পাল্কী রাখিল, সে স্থান নিস্তব্ধ।

"পাল্কী ভূমি স্পর্শ করিতে না করিতে বাহির হইতে কে দরজা খুলিল; এবং অতি মৃদুভাবে আমাকে বাহিরে আসিতে অনুরোধ করিল।

"বাহিরে আসিয়াই বুঝিতে পারিলাম, তিনি রাণী। প্রাতঃকালে তাঁহাকেই আমি অতি তীব্র তিরস্কার করিয়াছিলাম।

"সেথানে তাঁহার পরিচারিকা অথবা আত্মীয়ের মধ্যে কেহ ছিল না।

বেহারারা পাল্কী লইয়া চলিয়া গেল। সুতরাং দুই জন ভিন্ন আর সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি রহিল না।

"আমাকে বাহিরে আসিতে বলিয়াই রাণী চুপ করিয়াছেন! আমি সম্মুখে দাঁড়াইয়া ;—তিনি কেবল আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন—তাঁহার মুখেও একটি কথা নাই।

"তাঁহার ভাব দেখিয়া আমার বড়ই বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। আমার মনে হইল, আমাকে আয়ত্তে আনিয়া তিনি যেন প্রাতঃকালের গালির যোগ্য প্রতিশোধের চিন্তা করিতেছেন।

"কালীঘাট সহর—আমি দরিদ্র আর সে রাণী বলিয়া—প্রকাশ্য স্থানে আমার উপর তাহার অত্যাচারের সাহস নাই। তাই হয় ত মিষ্ট বাক্যের নিমন্ত্রণে আমাকে সে নিজের অধিকারে আময়ন করিয়াছে।

"রাণী যখন কথা কহিল না, তখন আমিই কথা কহিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—'লোক পাঠাইয়া আমাকে কি জন্য আনাইলে রাণি?'

"যে স্ত্রীলোকটি আমাকে আনিতে গিয়াছিল, সে ঠিক এই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাল্কীর সঙ্গে সে ছুটিতে পারে নাই—বহু পশ্চাতে পড়িয়াছিল।

"সে আসিয়া আমাদিগের তদবস্থা দেখিয়া বলিয়া উঠিল—'মা! বহুকষ্টে বাহির করিয়াছি। সারা কালীঘাট তন্ন তন্ন খুঁজিয়াছি।'

"রাণী এইবারে কথা কহিল; স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল—'দেওয়ান?'

"স্ত্রীলোকটি উত্তর করিল—'দেওয়ান এঁর সঙ্গীগুলিকে আঙুলিতে চটির দোরে দরোয়ানকে লইয়া বসিয়া আছেন।'

'শীঘ্র উপরে গিয়া আমার ঘরে ইঁহার বসিবার আসন রাখিয়া আয়।'

"সে চলিয়া গেলে, আমি আবার আমাকে আনানো সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলাম। স্ত্রীলোকটির উত্তরে আমার মনে ভয় ও ভরসার দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। তবে আসনের কথায় ভরসাই এখন মনোমধ্যে প্রবল হইয়াছে।

"রাণী আমার প্রশ্নে এবারে একটু হাসিল। হাসির সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘশ্বাস। আমি বড়ই বিস্ময়ে তাহার মুখপানে চাহিলাম। দেখি, তার গণ্ডের উপর ঝর-ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।

'দয়াদিদি! আমাকে চিনিতে পারিলে না?'

"আমি আবার চাহিলাম—আবার চাহিলাম—কই! কে তুমি? কে তুমি?—আমার আত্মীয়? চক্ষু মুদিয়া রাণীর মুখশ্রীকে মস্তিষ্কপথে পাঠাইলাম। সে পূর্ব্বজীবনের লুপ্ত স্মৃতিকে টানিয়া আনিতে মস্তিষ্কের প্রতি বিবরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল—কে তুমি, ভিখারিণীকে আয়ত্তে পাইয়া সম্পর্কের পীড়নে তাকে নিষ্পীড়িত করিতে, রাণীরূপে তার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছ?

'চিনিতে পারিলে না—পারিলে না দয়াদিদি?' 'নন্দরাণী?'

নন্দরাণী কাঁপিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে আমার দৃষ্টি জলে অবরুদ্ধ হইল। পরস্পরে বাহুপাশে আবদ্ধ—পরস্পরের স্কন্ধে পরস্পরের নির্ভরে বহুক্ষণ আমরা উভয়েই সংজ্ঞাহীনের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম।"

৪১

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দয়াদিদির পিতা ও শ্বশুর উভয়েরই অবস্থা এক সময়ে বেশ সচ্ছল ছিল। দয়াদিদির পিতা সে সময়ের একজন প্রসিদ্ধ বস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। যে গ্রামে তাঁহার বাস, সেখানে প্রতি সপ্তাহে

দুইবার কাপড়ের হাট বসিত। প্রতি হাটে প্রায় দুই তিন লক্ষ টাকার কাপড়ের আমদানী-রপ্তানী হইত। সেই হাটেই দয়াদিদির পিতার আড়ত ছিল।

নন্দরাণীর পিতা হারাধন সেই আড়তে সরকারী করিতেন। চাকরী উপলক্ষে হারাধন দয়াদিদিদের গ্রামেই বাস করিয়াছিলেন। বহুকালের ভৃত্য এবং বিশ্বাসী বলিয়া দয়াদিদির পিতার সঙ্গে হারাধনের প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ বন্ধুতায় পরিণত হইয়াছিল। হারাধনের উপাধি ছিল—মজুমদার, দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ।

সেই গ্রামেই নন্দরাণীর জন্ম। প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে আত্মীয়তার জন্য উভয়ের পরিবারবর্গের মধ্যে বিশেষ আত্মীয়তার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; এবং সেই জন্য "মজুমদার মহাশয়ে"র কন্যা নন্দরাণীর সহিত শৈশব হইতেই দয়াদিদি সখীত্ব সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়াছিল।

[illegible] দয়াদিদির অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট। দেখিতে বিশেষ সুন্দরী না হইলেও তাহার মুখ, চোক, অঙ্গের গঠনে সৌন্দর্য্যের অভাব ছিল না।

নন্দরাণী দয়াদিদির বিবাহ দেখিয়াছিল। কিন্তু দয়াদিদি নন্দরাণীর বিবাহ দেখে নাই। দশ বৎসর বয়সে দয়াদিদির বিবাহ। বার বৎসর বয়সে 'দ্বিরাগমনে' সে প্রথম শ্বশুরঘর করিতে যায়। যাইবার সময় সে নন্দরাণীর বিবাহের সম্বন্ধের কথা শুনিয়াছিল মাত্র। শ্বশুরগৃহ হইতে ফিরিয়া সে আর নন্দরাণীকে দেখিতে পায় নাই।

দয়াদিদির শ্বশুরগৃহ-অবস্থানকালে ম্যালেরিয়া নূতনের সমস্ত প্রকোপ লইয়া তাহার পিতার দেশ আক্রমণ করিল। সে আক্রমণে গ্রামের বহুলোক মরিল। মজুমদার মহাশয়ের গৃহও সে আক্রমণ হইতে

অব্যাহতি পাইল না। তাঁহার স্ত্রী মরিল, পুত্র মরিল, নন্দরাণী মরিতে মরিতে বাঁচিল। একমাত্র কন্যাকে লইয়া জর ও জরাজীর্ণ মজুমদার মহাশয় নিজের দেশে পলাইল।

শুধু নন্দরাণীকে নয়, দেশে ফিরিয়া দয়াদিদি তাহার গ্রামের সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের মধ্যে অনেককেই দেখিতে পাইল না। তাহার এক বৎসরের পিতৃগৃহে অনুপস্থিতির সময়মধ্যে ম্যালেরিয়া গ্রামের প্রায় অর্দ্ধেক লোককে গ্রাস করিয়াছে। তাহার পিতার জ্ঞাতি ও আত্মীয়স্বজন লইয়া যে তাঁতিপাড়া, তাহাও এই সময়ের মধ্যে একরূপ শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। নিজ বাটীর লোকের মধ্যেও দুই তিন জন তাহার দৃষ্টি হইতে চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে। সুতরাং একমাত্র নন্দরাণীর চিন্তায় কাতর হইতে দয়াদিদির বহুদিন অবসর রহিল না। তার পর দুর্ঘটনাপরম্পরায় তাহার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল আট দশ বৎসরের মধ্যে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। শোকসন্তপ্তা দয়াময়ীর ভবিষ্যৎ জীবনটা তাহার পূর্ব্বজীবনের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া, যেন নূতন ভাবে গঠিত হইয়াছে। গঠনের সঙ্গে সঙ্গে নন্দরাণীর স্মৃতিও মুছিয়া গিয়াছে।

আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে নন্দরাণীর সঙ্গে দয়াদিদির পুনঃসাক্ষাৎ। সেই জন্য প্রথমে সে তাহাকে চিনিতে পারে নাই। শুধু পারে নাই কেন, এই সময়ের মধ্যে উভয়ের অবস্থার এরূপ পার্থক্য হইয়াছে যে, দয়াদিদি নন্দরাণীকে চিনিয়াও চিনিতে সাহস করে নাই।

নন্দরাণীর এই অদ্ভুত অবস্থা-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কিছু বলিব। দেশে ফিরিয়া মজুমদার মহাশয় অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। সেখানে ম্যালেরিয়ার দ্বিতীয় আক্রমণে তাঁহার মৃত্যু হয়। রোগের জন্য তিনি

কন্যার বিবাহের কোনও ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বোপার্জ্জিত সামান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির এবং কন্যার ভার শ্যালকের উপর দিয়া গিয়াছিলেন।

নন্দরাণীর যখন পিতৃবিয়োগ হয়, তখন তাহার বয়স এগারো বৎসর। দুর্ঘটনাগুলা না ঘটিলে এই সময়ের মধ্যে তাহার বিবাহ হইবার সম্ভাবনা ছিল। পিতার মৃত্যুর পরেও তাহার বিবাহের সুযোগ ঘটিল না। সে ক্রমাগত তিন বৎসর ম্যালেরিয়ায় ভুগিল। তাহার দেহ কঙ্কালসার হইল। জীবনের আশা রহিল না।

তিন বৎসর পরে যখন সে রোগমুক্ত হইল, তখন লোকচক্ষে সে একাদশ বৎসরেরই বালিকা ছিল। রোগমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ছয়মাসের মধ্যে কন্যার জলের মত কৈশোরলাবণ্য চারিধার হইতে যেন নন্দরাণীর অঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার মাতুল এত দিন পরে তাহার জন্য পাত্র দেখিবার প্রয়োজন বুঝিল। তাহাদের বাড়ী ছিল মেদিনীপুর জেলায়, কাঁসাই নদীর তীরে একটি গ্রামে। একদিন নন্দরাণী তাহার প্রতি-বেশিনী একটি বৃদ্ধার সঙ্গে নদীতে স্নান করিতেছিল। সেই সময়ে সে দেশের জমীদারের দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

তাঁহার নাম ছিল—রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—এক কথায়—সাধারণ্যে সর্ব্বপরিচিত নাম রাজাবাবু। দেশে তাঁহার অক্ষুণ্ণ প্রতাপ ছিল। নামে বাঘে গরুতে জল খাইত। সম্পত্তির অধিকার লইয়া তাঁহার আদেশে কত যে মারামারি, কাটাকাটি, গ্রামদাহাদি ব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আইনের জাল-বন্ধনে তখনও পর্য্যন্ত জমীদারের প্রতাপ এখনকার মত ক্ষুণ্ণ হয় নাই। প্রজাগণ তখনও পর্য্যন্ত জমীদারকে

রাজার মত দেখিত, ভয় করিত, শ্রদ্ধা দেখাইত। নিজের স্বত্বে অভিমানী, কথায় কথায় জমীদারের সঙ্গে সমকক্ষতা দেখাইতে আদালতে উপস্থিত হইত না। তাহাদিগের আপনা আপনির ভিতরে অনেক মোকদ্দমা তাহারা জমীদারের সালিসীতেই মিটাইয়া লইত।

গবর্ণমেণ্টের দত্ত উপাধি না হইলেও প্রজাসকল রাজা বাবুকে রাজা বলিত। সুতরাং তাঁহার পত্নী রাণী।

রাজাবাবুর যখন ষাট বৎসর বয়স, তখন তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। তাঁহার গর্ভে পুত্রকন্যা কিছুই হয় নাই। বিষয়ের উত্তরাধিকারিতার নিমিত্ত 'রাজদম্পতির' হৃদয়ে তীব্র সন্তান-আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও, পত্নীর শাসনে রাজাবাবু পুত্রার্থে পত্ন্যন্তর-গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পোষ্যপুত্র-গ্রহণ সঙ্কল্প করিয়াই তিনি পত্নীর মনোমত কোন এক সুলক্ষণ বালকের মাতৃক্রোড়-পরিত্যাগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে বৃদ্ধা "রাণীর" পরলোক-প্রাপ্তি হইল। রাজাবাবুরও পুত্রহীনতার একটা দুর্নাম অপনোদনের সুযোগ ঘটিল। বিশেষতঃ, গৃহিণীর অদর্শনে নন্দী-গ্রামের বিশাল অট্টালিকার অন্তঃসারশূন্যতা একটা বিকট গ্রাসের লক্ষণ লইয়া রাজাবাবুকে নিত্য এমন বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল যে, তিনি অচিরে তাহাকে পূর্ণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিলেন না।

পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থা ছিল কি না, জানিবার উপায় নাই,—তবে যে কোন সূত্রেই হউক, অথবা বিধাতার একান্ত নির্ব্বন্ধেই হউক, পুনর্জীবনা-গতা কিশোরী নন্দরাণী পত্নীবিয়োগবিধুর জলবিহারী স্থিরসঙ্কল্প রাজা বাবুর দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পরেই এই যষ্টিপর বৃদ্ধের সঙ্গে তাহার পট্ট-উত্তরীয়াঞ্চলে

আবদ্ধা নন্দরাণী নন্দীগ্রামের রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে নন্দরাণীর মাতুল ও তাহার দুই একজন প্রতিবেশীর বৈষয়িক উন্নতিলাভ হইল।

সকলেই মনে করিয়াছিল, বিবাহের দুই তিন বৎসরের মধ্যেই বৃদ্ধ রাজাবাবু তাঁহার নবাগতা গৃহলক্ষ্মীটিকে তাঁহার অন্তঃপ্রজ্বলিত আত্মীয়-বর্গের তত্ত্বাবধানে নিক্ষেপ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া যাইবেন। কিন্তু তাহা ঘটিল না। দেশের লোকের চক্ষু নিত্যবিস্ফারণে উর্দ্ধনেত্রে পরিণত করিয়া, নন্দরাণী পূরা পঁচিশটি বৎসর তাহার আয়তি ধরিয়া রাখিল।

আরও বিচিত্র কথা—এই পঁচিশ বৎসরে নন্দরাণীর এক পুত্র ও এক কন্যা হইয়াছে। এই পুত্র ও কন্যা এবং কুলরক্ষিণী ভার্য্যাকে পশ্চাতে রাখিয়া, রাজাবাবু জীবনটি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া, বৎসর-দুই-পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

নন্দরাণীর পুত্রের নাম হরেন্দ্রনারায়ণ। কন্যার নাম ললিতা। কন্যা জ্যেষ্ঠা, বয়স এখন একুশ বৎসর; পুত্রের বয়স উনিশ।

পুত্রের বিবাহ শীঘ্র দিবার প্রয়োজন বুঝিলেও কালাশৌচের জন্য নন্দরাণী তাহার বিবাহ এখনও দিতে পারে নাই। বিবাহ দিবার ইচ্ছায় তাহার জন্য একটি পাত্রীর সন্ধানে সে কলিকাতায় আসিয়াছিল, এবং সেই সূত্রে দেবদর্শন উপলক্ষ করিয়া, কালীঘাটে বাসা লইয়াছিল। এইখানেই দেবীর কৃপায় প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে নন্দরাণীর সহিত দয়াদিদির পুনর্মিলন ঘটিল। দেবীর কৃপায় তিনটি অসহায়া স্ত্রীলোক এক শক্তিমতী ভূম্যধিকারিণীর আশ্রয়লাভ করিল।

(৪২)

কালীঘাটে নন্দরাণীর বাসায় দিন দুই অবস্থানের পর দয়াদিদি প্রভৃতি তাহাদিগের সঙ্গে নন্দীগ্রামে গমন করেন। আমাকে তাহারা যেরূপ দুর্গম পথ দিয়া নন্দীগ্রামে লইয়া গিয়াছিল, সে পথ দিয়া ইহারা যায় নাই।

দয়াদিদি বলিয়াছিল—"কালীঘাট হইতে বজরায় চড়িয়া প্রথমে আমরা তমলুকে যাই। সে স্থান হইতে পাল্কী করিয়া, আমরা নন্দরাণীর স্বামীর দেশে উপস্থিত হই। মধ্যে কত খালবিল যে আমাদের অতিক্রম করিতে হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এখন সে দেশের পথ কি রকম, জানি না। সে সময় তাহা কিন্তু বড় দুর্গম ছিল। ধনিপত্নীর সঙ্গে চলিয়াছিলাম বলিয়া, আমরা ততটা পথকষ্ট অনুভব করি নাই।

"গ্রামে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন অপরাহ্ণ। সেখানে উপস্থিত হইয়াই নন্দরাণীর বাড়ী ও বৈভব দেখিলাম। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কালীঘাটে তাহার সঙ্গের লোকলস্কর দেখিয়া, তাহার ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে একটা অনুমান করিয়াছিলাম। নন্দীগ্রামে গিয়া দেখিলাম, তাহা আমার অনুমানকে ছাপাইয়া গিয়াছে।

"এখন আমি নিঃস্ব হইয়াছি। কিন্তু এক সময়ে ধনীর কন্যা ও ধনীর পুত্রবধূ ছিলাম। ধনীর সংস্পর্শে সে সময় অনেকের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াছিলাম। সুতরাং কালীঘাটে নন্দরাণীর অবস্থা দেখিয়া, আমি তাহাতে বিস্মিত হইবার বিষয় কিছু বুঝিতে পারি নাই। এমন কি, তাহাকে সকলে রাণী বলিয়া সম্বোধন করিতেছে দেখিয়া, আমি মনে মনে কিছু বিরক্ত হইয়াছিলাম।

"কিন্তু নন্দীগ্রামে আসিয়া বুঝিলাম—সে রাণী বটে।

"তুমিও সে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পড়িয়াছিলে। তবে তখন নিতান্ত বালক বলিয়া এবং নানা কারণে চিত্তচাঞ্চল্যে অস্থির ছিলে বলিয়া, তাহা তুমি সম্যক্ বুঝিতে পার নাই।

"প্রথমে সে আমাদিগকে তাহার প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভিতরেই স্থান দিল। কিন্তু সেখানে প্রবেশের পর হইতেই তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে আমার সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। শুধু আমার নহে ; ঠাকুর-মাও এই রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিয়া, যেন কতকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন।

"নন্দরাণীর ব্যবহারে কোনও ত্রুটি ছিল না। সে আমাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মতই শ্রদ্ধা দেখাইতে লাগিল। ঠাকুরমাকে ও দাক্ষায়ণীকেও সে ভক্তি দেখাইতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করে নাই। তাহার পুত্র, কন্যা ও জামাতাকে দেখিলাম। দেখিলাম কেন, নন্দরাণী তাহাদিগকে দেখাইল। আমি তাঁতির মেয়ে—তাহারা কায়স্থ। সমাজে আমা হইতে তাহাদের উচ্চস্থান।—নন্দরাণী তথাপি তাহাদের জন্য আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল।

"দাস-দাসী রাণীর আদেশে, রাণীর মতই আমাদের সেবা করিতে লাগিল। তথাপি সঙ্কোচ। সঙ্কোচ শুধু আমাদের নিজের জন্য নয়। দাক্ষায়ণীর জন্য, সেটা যেন বিশেষরূপে অনুভব করিতে লাগিলাম। দাক্ষায়ণী সে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া অবধি যেন বিশেষ স্ফূর্ত্তি পাইতেছিল না। সে তাহার গলার ঠাকুরটি লইয়া যেন ত্রস্তভাবে সেখানে দিনযাপন করিতেছিল। বাড়ীর ভিতরে তাহার সমবয়সী অনেক বালিকা ছিল।

ধনীর গৃহে সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, অনেক আত্মীয়কুটুম্ব—দরিদ্র—নন্দরাণীর গৃহে প্রতিপালিত হইতেছিল। তাহাদের পুত্রকন্যাদিতে সে বিশাল অট্টালিকা একরূপ পরিপূর্ণ। তাহাদের মধ্যে দাক্ষায়ণীর বয়সী অনেকেই তাহার সহিত ক্রীড়াকৌতুক করিতে আসিত। কিন্তু এই অল্পভাষিণী বালিকার কাছে তাহারা বয়সোচিত প্রগল্‌ভতার সামান্য-মাত্রও প্রশ্রয় পাইত না।

"আমি বুঝিলাম, সে বাড়ীতে সে অসংখ্য লোকের মধ্যে আমাদের থাকা চলিবে না। সেখানে দিন চারি পাঁচ অবস্থানের পর আমি নন্দরাণীকে আমার মনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলাম।

"আমাদের অবস্থার ব্যাপার আমি এ পর্য্যন্ত নন্দরাণীকে খুলিয়া বলি নাই। পিতামহী ও দাক্ষায়ণীর বিশেষ পরিচয় প্রকাশ করি নাই। দাক্ষায়ণীর অবস্থার কথা বুঝিবার লোক আমাদের দেশে সেই সময় হইতেই বিরল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং সে কথা তুলিয়া, বিশেষতঃ ধনীর নিকটে তাহার উত্থাপনে ফল নাই বুঝিয়া, আমি দাক্ষায়ণীর ইতিহাস নন্দরাণীর কাছে যথাসম্ভব গোপন করিয়াছিলাম।

"এখন দেখিলাম—না বলিলে আর চলে না। বিশেষতঃ ঠাকুরমা যখন একদিন মুখ ফুটিয়া আমার কাছে কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিলেন, তখন অগত্যা নন্দরাণীর কাছে মনের কথা খুলিয়া বলিতে হইল।

"গন্তব্য স্থানের কোনও নির্দ্দেশ ছিল না বলিয়া, নন্দরাণীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আমরা তাহার সঙ্গে নন্দীগ্রামে আসিয়াছি। দাক্ষায়ণীর গলার ঠাকুরটির উপর সব নির্ভর করিয়া পথে বাহির হইয়াছি। এই জন্য নন্দরাণীর সঙ্গে অতদূরে আসিতে আমরা দ্বিধা করি নাই।

"যখন নন্দরাণী আমার কাছে ঠাকুরমা ও দাক্ষায়ণীর প্রকৃত ইতিহাস শুনিল, হুগলী হইতে আরম্ভ করিয়া ঘটনার পর ঘটনা যখন তাহার কাছে বিবৃত করিলাম, তখন সে কিয়ৎক্ষণের জন্য আমার সম্মুখে হতভম্বের মত বসিয়া রহিল। মনে হইল, যেন সে আমার কথা উপলব্ধি করিতে পারিল না।

"আমি উত্তরের প্রত্যাশায় কিছুক্ষণের জন্য নীরবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম, সে যেন কি এক কঠোর চিন্তায় তন্ময় হইয়াছে। তাহার মুখশ্রী মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বর্ণের উপর বর্ণ মাখিয়া চিন্তার ক্রম-পরিবর্ত্তিত ভাবতরঙ্গে যেন অবিরাম ভাসিয়া চলিয়াছে।

"কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার তন্ময়তা ঘুচিয়াছে বুঝিয়া, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'রাণি! আমার এ ইতিহাস শুনিয়া কিছু কি বুঝিতে পারিলে?'

"চিন্তাশেষে দেখি, নন্দরাণীর অপাঙ্গে অশ্রু সঞ্চিত হইয়াছে। আমার প্রশ্নের প্রহারেই যেন সে অশ্রু গণ্ডে পতিত হইল। সত্যকথা বলিতে কি, এ অশ্রুপতনের কারণ, আমি কখন নির্ণয় করিতে পারি নাই। আমি মনে করিলাম, দাক্ষায়ণীর কাহিনী শুনিয়া নারীর করুণ-হৃদয় হয় ত গলিয়া গিয়াছে। অশ্রুবিন্দু মমতাময়ী নারীর আর্ত্তের উদ্দেশে আকাশে নিক্ষিপ্ত চিরন্তন উপহার।

"আমি প্রথম প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া, দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে যাইতেছি, এমন সময় নন্দরাণী বলিয়া উঠিল—'দয়াদিদি! আমি ত বুঝি নাই; বুঝিতে পারিবও না। বুঝিবার অবস্থা গিয়াছে। তুমি কি বুঝিতে পারিয়াছ?'

"আমি একটু বিস্মিতের ভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'তোমার কি মনে হয়?'

'কিছু মনে করিও না। আমার মনে হয়, তুমিও বুঝিতে পার নাই?'

"আমি অতি উল্লাসে নন্দরাণীর হাত দু'টি সবলে জড়াইয়া ধরিলাম। বলিলাম—'নন্দরাণি! ঠিক বলিয়াছ—আমিও বুঝিতে পারি নাই। তবে তোমার মুখে এ কথা শুনিয়া বুঝিলাম, বিধাতা তোমাকে যে রাণী করিয়াছেন, তা ভুল করিয়া করেন নাই। তুমি রাণী হইবারই যোগ্য।'

"এ সুখ্যাতির বাক্য নন্দরাণীর যেন মনোমত হইল না। সে বলিল—'তবে কি জান দয়াদিদি, তোমার একদিন বুঝিবার উপায় আছে। আমার নাই।'

"আমি বলিলাম—'আমার যদি থাকে, তা হ'লে তোমারও আছে।'

"নন্দরাণী মাথা নাড়িল এবং বলিল—'ভগবান্ তোমার ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইয়া, দয়া করিয়া তোমাকে সতীর সঙ্গ দান করিয়াছেন। আমাকে ঐশ্বর্য্য দিয়া জন্মের মত বুঝিবার শক্তি কাড়িয়া লইয়াছেন। যে সদ্‌বুদ্ধিতে দেবতা প্রত্যক্ষ হয়, ধনের অহঙ্কারে তাহা অনেককাল চাপা পড়িয়াছে।'

"নন্দরাণীর এ আক্ষেপটা আমার মর্ম্ম বিদ্ধ করিল। এতটা আক্ষেপের কারণ ঠিক বুঝিতে না পারিলেও তাহার ধনের যে একটা খুব গর্ব্ব জন্মিয়াছে, সেটা তাহার সঙ্গে দুই চারি দিনের সহবাসেই বুঝিয়াছিলাম। আমার ও ঠাকুরমার কাছে যথেষ্ট দীনতা-প্রদর্শন সত্ত্বেও বাড়ীর ভিতরে ;অন্যত্র অনেক বিষয়ে তাহার অহঙ্কারকে পূর্ণমাত্রায় ফুটিতে দেখিয়াছি।

"আমাকে ইহার মধ্যে সে একদিন তাহার জমীদারী-পরিচালনা দেখাইয়াছে। তাহার পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণ এখনও নাবালক। স্বামীর উইলের মর্ম্মানুসারে অছি-স্বরূপ তাহাকেই জমীদারীর কার্য্য করিতে হয়। তাহার স্বামী যে ঘরে বসিয়া প্রজাদিগের মামলা-মোকদ্দমা শুনিতেন, সেই সুন্দর সাজানো ঘরের একাংশে চিক দিয়া, তাহারই ভিতর হইতে নন্দরাণী স্বামীর ন্যায় বিচারাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। একটা ঝি তাম্বূলের পাত্র লইয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে। দুইটা ঝি অবিরাম পশ্চাৎ হইতে বাতাস করে। পরিধানে ফিন্‌ফিনে চন্দ্রকোণা-ধুতি। কিন্তু সৌষ্ঠবে তাহার কাছে সধবার পরিহিত শাড়ী হার মানিয়া যায়। প্রজাদিগকে তাহার আদেশ শুনাইবার জন্য এবং প্রজাদিগের আবেদন তাহাকে শুনাইবার জন্য, চিকের বাহিরে একজন 'পেস্‌কার' দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু অন্তঃপুরিকার সরমঢাকা অর্দ্ধোচ্চারিত বাক্য প্রজা-দিগকে শুনাইবার জন্য পেস্‌কারের আর বড় প্রয়োজন হয় না। তাহারা বিনা আয়াসেই রাণী-মুখ-নিঃসৃত বাক্য শুনিয়া ধন্য হইয়া থাকে।

"তাহার ধনের অহঙ্কার অনেকটা দেখিয়াছি। তথাপি তাহার আক্ষেপ ও তজ্জনিত অশ্রুজলের মর্ম্ম আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই। যাহার চরিত্র সম্বন্ধে কিছু জানি না, অপ্রয়োজনে সে সম্বন্ধে সন্দেহ করাও পাপ। সুতরাং নন্দরাণীর আক্ষেপের কারণ বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া, তাহাকে বলিলাম—'রাণি!'—

"কথা কহিতে না কহিতে নন্দরাণী বলিয়া উঠিল—'এখানে কেহ নাই, এবং আমার হুকুম ভিন্ন আর কেহ এখন এখানে আসিবে না! তুমি আমাকে নন্দরাণীই বল।'

"'কেন ?—ভগবান্ যখন তোমাকে রাণী করিয়াছেন, তখন বলিতে বাধা কি ?'

"'বাধা নাই ; এবং কয়দিন তোমার মুখে 'নন্দরাণী' শুনিয়া—আমি বিরক্ত না হইলেও—আমার আত্মীয়কুটুম্ব ও দাসীগুলা বিরক্ত হইয়াছে।'

'আমি তাহা জানি, এবং সেই জন্যই সাবধান হইয়াছি। দোষ তাহাদের নয়, দোষ আমার। ভগবান্ যাকে মর্য্যাদা দিয়াছেন, তাকে মর্য্যাদা না দেখাইলে ভগবানের কাছে অপরাধী হইতে হয়।'

'তা হ'ক, তুমি আমাকে নন্দরাণী বল। শুধু এখন নয়, ইহার পরেও বলিবে। সকলের সুমুখে বলিবে। বাল্যে যেরূপ ভালবাসার আগ্রহে তোমাদের দীন কর্ম্মচারীর কন্যাকে কখন নন্দরাণী, কখন নন্দ, কখন বা নন্দী বলিয়া ডাকিতে, এখনও তোমার যখন যেরূপ অভিরুচি, সেই নামে আমাকে সম্বোধন করিও।'

"আমি কেবল নন্দরাণীর মুখের পানে চাহিলাম।

"নন্দরাণী বলিতে লাগিল—'ঐশ্বর্য্যমদে এমন অন্ধ হইয়াছিলাম যে, আমি কে, কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিয়াছি, সব ভুলিয়াছিলাম। এক একবার বাপ-মায়ের জন্য আমার আক্ষেপ হইত। কিন্তু সে কিসের জন্য ? তাহারা বাঁচিয়া থাকিলে কন্যার ঐশ্বর্য্যটা দেখিতে পাইত। এই ঐশ্বর্য্য তাহারা দেখিতে পাইল না বলিয়াই দুঃখ। কিন্তু তাহারা কি করিয়া যে জীবনবিসর্জ্জন দিয়াছে, সে বিষয় একদিনের জন্যও আমার ভাবিবার অবকাশ হয় নাই। তাহাদের শোচনীয় মৃত্যু-চিন্তায় আমার দুঃখ আসে নাই। আজ আমার পুত্র-কন্যার সামান্য একটু মাথা ধরিলে, ডাক্তার অষ্ট-প্রহর অসিয়া তাহাদের তত্ত্ব লয়। কিন্তু আমার ভাই—'

"নন্দরাণীর চোখে এইবারে ধারা ছুটিল। আমি বুঝিলাম, ঐশ্বর্য্যমদ এতকাল ধরিয়া অতি যত্নে নন্দরাণীর বাল্যস্মৃতিগুলাকে আগুলিয়াছিল। কোনও ক্রমে তাহাদিগকে তাহার মনের কাছে আসিতে দেয় নাই। ব্রাহ্মণবালিকার পুণ্যকাহিনী আজ সেই দ্বার খুলিয়া দিয়াছে।

"নন্দীগ্রামের রাণী, আবার আমাদের গ্রামের সেই মাথায় ঝুঁটি-বাঁধা নন্দরাণী হইয়াছে।

"ক্ষণেক নীরবতায় আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া নন্দরাণী আবার বলিতে লাগিল—'আমার ভাই—আমার পিতার একমাত্র বংশধর। ডাক্তার ও ঔষধের অভাবে তাহার শোচনীয় মৃত্যু দেখিয়াছি। সেই সঙ্গে তোমার পিতা ও তাঁহার পরিবারবর্গের মহত্বও দেখিয়াছি। আমার ভাইকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহাদের কি ব্যাকুলতা! আমার ভাইয়ের মৃত্যুতে তোমার মা পুত্রবিয়োগিনীর মত মাটীতে পড়িয়া রোদন করিয়াছে!'

"আমি বাধা দিলাম। বলিলাম—'আর পূর্ব্বকথা তুলিয়ো না বোন্। ভগবানের কৃপায় উত্তরোত্তর তোমার শ্রীবৃদ্ধি হউক। তোমার পুত্র-কন্যা সুস্থ, দীর্ঘজীবী ও সুখী হউক। ঐশ্বর্য্য ভগবান্ যখন দিয়াছেন, তখন তাহাকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। তবে তাহার যথাসম্ভব সদ্‌ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। তোমাকে সেই সে কালের ছোট বোন্‌টির মত দেখিলেও তোমাকে রাণী বলিব। তাহাতে তুমি আপত্তি করিও না।'

'তা হইলে, এতকাল পরে যে সামান্য একটু আলোক এই অন্ধ চক্ষুতে ফুটিয়াছে, সেটি আবার নিবিয়া যাইবে।'

"'তাহা যাইবার যদি ভয় দেখাও, তাহা হইলে, যখন যেমন বুঝিব, সেই ভাবেই তোমাকে সম্বোধন করিব।'

"এই সময় নন্দরাণী আমাকে গোটাকতক মনের কথা খুলিয়া বলিল। সেই কথাশেষে বুঝিলাম, এই কয়দিন একত্র বাসের পর আজ প্রথম নন্দরাণীর সহিত আমার সেই বাল্যকালের সখীত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

"সখীত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাহাকে অনেকগুলা মনের কথা খুলিয়া বলিলাম। বলিবার যোগ্য আর যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল, তাহা সময়ান্তরে একটা অবকাশে তাহাকে বলিবার জন্য প্রতিশ্রুত রহিলাম।

"আসল কথা, কথোপকথনের শেষে সে দিন আমি ঠাকুরমা ও দাক্ষায়ণীর ভবিষ্যৎ-স্থিতি সম্বন্ধে অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। ইহার পর দুঃখে অনভ্যস্তা দু'টি ব্রাহ্মণকন্যাকে দু'টি উদরান্নের জন্য আর বোধ হয় ইতস্ততঃ ঘুরিতে হইবে না। 'বোধ হয়' বলিলাম কেন, নন্দীগ্রামে বাস কেবল ঠাকুরমা ও দাক্ষায়ণীর পছন্দের উপর নির্ভর করিতেছে। তাহারা যদি বলে, সেখানে থাকিব না, তাহা হইলে আমার একান্ত অনিচ্ছা, অথবা নন্দরাণীর একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও, আমাকে নন্দীগ্রাম ত্যাগ করিতে হইবে। তখন ভবিষ্যতের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে আমার দৃষ্টি রাখিবার উপায় থাকিবে না।

"সেই একমাত্র পছন্দের অপেক্ষায় আমি একটিমাত্র মনের কথা—মনের আসল কথা সেদিন নন্দরাণীকে বলিতে পারিলাম না। সেটি তোমার সঙ্গে দাক্ষায়ণীর পুনর্মিলন-সংঘটন।

"নন্দরাণীর অবস্থা দেখিয়া, এবং তাহাদের প্রতাপের কথা শুনিয়া,

আমার আশা হইল, ইহাদের সাহায্যে যে কোন উপায়েই হউক, আমি দাক্ষায়ণীর স্বামি-সম্মিলন ঘটাইতে সমর্থ হইব।

"আমার বিলক্ষণ বোধ হইয়াছে, বিধিপ্রেরিতা হইয়া আমরা তিনটি অসহায়া স্ত্রীলোক নন্দীগ্রামে উপস্থিত হইয়াছি। নন্দীগ্রামে তিনি আমাদের সুখ অসম্পূর্ণ রাখিবেন না।

* * * * * *

"পরদিন প্রাতঃকালে নন্দরাণীর অট্টালিকা পরিত্যাগ করিয়া আমরা তৎকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট একটি সুন্দর নির্জ্জন বাগান-বাড়ীতে আশ্রয়গ্রহণ করিলাম।

"সেখানে আমাদের স্বচ্ছন্দে অবস্থানের প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা হইল। আমাদের পরিচর্য্যার জন্য ঝি-চাকর নিযুক্ত হইল। ফটকে দরোয়ান বসিল। ললিতার স্বামী ব্রজমোহনের উপর আমাদের তত্ত্বাবধানের ভার পড়িল।"

(৪৩)

এই বাগান-বাড়ীতে আসিবার পর হইতেই, দয়াদিদির মনে দাক্ষায়ণীর সঙ্গে আমাকে মিলিত দেখিবার বাঞ্ছা জাগিয়া উঠিল।

তাঁহার মনে হইল, এমন শক্তিমান্ জমীদারের আশ্রয় পাইয়াও, যদি সে শুভকার্য্য নিষ্পন্ন করিতে না পারিল, তাহা হইলে, ভবিষ্যতে বোধ হয়, আর তাহা ঘটিয়া উঠিবে না—এরূপ শুভ-সুযোগ জীবনে প্রায়ই একটিবারের জন্য আসে—আর আসে না!

আমাদের দেশের লোক কেহ নন্দীগ্রামের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই। দয়াদিদিও কখন শুনে নাই। নন্দীগ্রামে উপস্থিত হইয়া তাহার বোধ

হইয়াছে, সে দাক্ষায়ণী ও পিতামহীকে সাতসমুদ্র তেরনদীপারে উপস্থিত করিয়াছে।

ভগ্নমন ও ভগ্নদেহ লইয়া পিতামহী আবার যে সে স্থান হইতে প্রাণে প্রাণে দেশে ফিরিতে পারিবে, দয়াময়ীর সে আশা রহিল না। পিতামহীকে দেখিয়া এবং তাহার সঙ্গে দুই একটা কথা কহিয়াই সেটা সে বুঝিতে পারিয়াছে।

তাহার বোধ হইল যেন, শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মত, দেহ হইতে বহির্গমনোন্মুখ প্রাণকে তিনি কোনও প্রকারে জোর করিয়া দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। একটু অন্যমনস্ক হইলেই, যেন সে পিঞ্জর ফেলিয়া অনন্ত আকাশলক্ষ্যে ছুটিয়া যাইবে।

দাক্ষায়ণীকে পাইয়া, তাঁহার সুখেরও অবধি ছিল না—দুঃখেরও অবধি ছিল না। যুগে যুগে অজস্র-সঞ্চিত পুণ্য না হইলে দাক্ষায়ণীর মত বধূ কখন ঘর আলো করিতে আসে না। কিন্তু বড় দুঃখ, বধূ যদি আসিল, সে চৌকাঠে পা দিতে না দিতেই, গৃহস্বামীর পাপে ঘর ভাঙ্গিয়া গেল। বধূ, শ্বশুরগৃহবাসের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়াও, তাহাতে প্রবেশ করিতে পাইল না!

শৈত্য ও উত্তাপের অত্যধিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ, শৈলদেহ-গ্রন্থিসকল উত্তরোত্তর শিথিল করিয়া কালে তাহাকে যেরূপ বালুকাস্তূপে পরিণত করে, উল্লাস-বিষাদের নিত্যঘাত-প্রতিঘাতে পিতামহীর হৃদয়ও দিন দিন সেইরূপ চূর্ণ হইতেছিল।

এতদিন নানা ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া দয়াদিদির তাহা লক্ষ্য করিবার অবকাশ হয় নাই। দুই চারি দিন নূতন বাড়ীতে বাস করিতে না করিতে পিতা-

মহীর অবস্থা সে বুঝিতে পারিল। বুঝিল, ঠাকুরমা অধিকদিন বাঁচিবেন না। বালিকা দাক্ষায়ণী সেটা বুঝিতে পারে নাই। পিতামহী, সদানন্দময়ীরূপে তাহাকে অঙ্কগত করিয়া, নিজের আভ্যন্তরিক অবস্থা বুঝিতে দেন নাই। বিশেষতঃ, নূতন-বাসায় আসিয়া সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। বিপুল ঐশ্বর্য্যের আবরণভার তিনজনের কাহারও সহ্য হইতেছিল না—দাক্ষায়ণীর একেবারেই না। সাধ করিয়া যাহার পিতা-মাতা দরিদ্রতাকে আলিঙ্গন করিয়াছিল, তাহাদের ভাবপুষ্টা বালিকা নন্দরাণীর অট্টালিকার মধ্যে কাঞ্চন-পিঞ্জরাবদ্ধা পাখীটির মত, নিজের সৌভাগ্যের মর্ম্মটা ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না।

বাগানবাড়ীতে আসিয়া তাহার অনেকটা স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। বালিকা এরূপ বাড়ী জীবনে কখন দেখে নাই। তবু স্থান নির্জ্জন এবং রাজান্তঃপুরযোগ্য কোলাহল হইতে অনেকটা দূরে বলিয়া, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের বিভীষিকা দুই দিনের ভিতরেই তাহার অন্তর হইতে দূর হইয়া গিয়াছে।

পিতামহীর দৈহিক অবস্থা দাক্ষায়ণী বুঝিতে না পারিলেও, দয়াদিদির তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সে মনে মনে স্থির করিল, ঠাকুরমার অবসাদের ঔষধ-সংগ্রহের একবার চেষ্টা করিবে। সে ঔষধে পিতামহীর জীবনরক্ষা হয়, সুখের কথা; না হয়, তাঁহার দেহত্যাগের পূর্ব্বে চিত্তের অপ্রসন্নতা অন্ততঃ বিদূরিত হইবে।

দয়াদিদি আমার হরণ-ব্যাপারের একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছিল। তাহাতে সাধারণের সন্তুষ্টির সম্ভাবনা না থাকিলেও, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম, কথাটা লোকচক্ষে বিগর্হিত হইলেও,

তাহা করা ভিন্ন তাহার অন্য উপায় ছিল না; অথবা, উপায় থাকিলেও, তদবলম্বনে তাহার সাহস ছিল না।

সত্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে অসদুপায় অবলম্বনের যে ফল, তাহা ফলিয়াছিল। তথাপি, আমি তজ্জন্য দয়াদিদিকে দোষ দিতে পারি না। দোষ যাহা, তাহা আমার ভাগ্যের।

দয়াদিদি বলিয়াছিল—"প্রথম তিনদিন ঠাকুরমা'র অবস্থা বুঝিবার আমি অবসর পাই নাই। প্রথম দিনটা ঘর গুছাইতেই একরূপ কাটিয়া গেল। আমাদের মধ্যে কাহারও গুছাইয়া রাখিবার মত সম্বল কিছুই ছিল না, কিন্তু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, নন্দরাণী আগে হইতেই সেখানে আমাদের ব্যবহারের উপযোগী অনেক দ্রব্যই পাঠাইয়াছে। ব্রজ-মোহনের উপর সেগুলি গুছাইয়া রাখিবার ভার ছিল; কিন্তু আমরা এত শীঘ্র নন্দরাণীর ঘর হইতে চলিয়া আসিয়াছি যে, সে এই অল্পসময়ের মধ্যে দ্রব্যগুলি যথাস্থানে রক্ষা করিতে পারে নাই।

"সে স্থানে উপস্থিত হইয়া, ব্রজমোহনের সাহায্যেই আমাকে দিনটা অতিবাহিত করিতে হইল।

"দ্বিতীয়, তৃতীয় দিবসও সুবিধা হইল না। আমাদিগকে, বিশেষতঃ দাক্ষায়ণীকে দেখিবার জন্য গ্রামবাসিনী বৃদ্ধা, তরুণী, বালিকা, সধবা, বিধবা, অনূঢ়া ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অপরজাতীয়া স্ত্রীলোক, একরূপ দলে দলে আসিতে লাগিল। দাক্ষায়ণীর কথা ইতিমধ্যে রাজান্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া সারাগ্রামটায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে!

"তৃতীয় দিনের শেষভাগে জনতা এত অধিক হইয়া পড়িল যে, বাধ্য হইয়া ব্রজমোহনকে সেখানে সর্ব্বসাধারণের প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা প্রচার

করিতে হইল। তৃতীয় দিবসে আমরা নিজেদের বিপন্ন বোধ করিয়াছিলাম। মেয়েগুলা যে আসিয়া শুধু আমাদের দেখিয়াই নিশ্চিন্ত হইবে, তাহা নয়। তাহাদের অবিরাম প্রশ্নে আমাকে উত্ত্যক্ত হইতে হইয়াছিল। দাক্ষায়ণী বালিকা; সে সকল প্রশ্নের কি উত্তর দিবে? ঠাকুরমা উত্তর দিতে অশক্ত; তাহাদের প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর আমিই দিতে লাগিলাম। শেষে, উত্তর দেওয়া আমারও পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। ব্রজমোহন সেটা বুঝিল এবং লোকজনের আসা একরূপ বন্ধ করিয়া দিল।

"চতুর্থ দিবসে আমরা লোকের দেখা হইতে নিস্তার পাইয়াছি।

"এতদিন কিন্তু রাজবাড়ী হইতে কেহই আমাদের দেখিতে আসে নাই—না নন্দরাণী, না তাহার কন্যা ললিতা, না তাহাদের অপর কোন আত্মীয়া। একমাত্র ব্রজমোহন মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাদের তত্ত্ব লইতে-ছিল। আমরা, অন্যসকল বিষয়ে তাহাদের আচরণে নিশ্চিন্ত হইলেও, তাহাদের না আসাতে কিছু বিস্মিত হইয়াছিলাম।

"প্রথম তিনদিন মনে করিলাম—বহুলোকের সমাগম দেখিয়া আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তার সুযোগ হইবে না বলিয়া, তাহারা আসে নাই; অথবা, আসিয়া, বাগানের ফটক হইতে ফিরিয়া গিয়াছে।

"চতুর্থ দিবসের সন্ধ্যা পর্য্যন্তও যখন কেহ আসিল না, তখন আমাদের মনে কেমন একটা সন্দেহ হইল।

দাক্ষায়ণী অবশ্য আজ লোকের অভাবে কতকটা ফুরসৎ পাইয়া, বাড়ীর সংলগ্ন সুন্দর পুষ্করিণীর তীরে চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। লোক না থাকিলেও, সেখানে তাহার সঙ্গীর অভাব ছিল না। পুষ্করিণীর চারিধারে গোলাপ, বেলা, রজনীগন্ধা প্রভৃতি নানাবিধ ফুলের গাছ ছিল।

মাঝে মাঝে সুন্দর কেয়ারিকরা কামিনীফুলের গাছ, আপনাদেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখার আবরণে এক একটি কুঞ্জের মূর্ত্তিতে, সেই ছোট ছোট ফুলগাছগুলির অভিভাবিকা-সঙ্গিনীর মত দাঁড়াইয়া ছিল। বালিকা, সেই সকল ফুলগাছের পার্শ্বে এক একবার দাঁড়াইয়া, শুধু দৃষ্টি দিয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেছিল।

"প্রয়োজন হইয়াছিল—ঠাকুরমার এবং তাঁহাদেরই জন্য, তাহা হইতেও অধিক প্রয়োজন হইয়াছিল—আমার। নন্দরাণীর পরিচয় সম্বল করিয়া আমিই ত তাহাদের এখানে আনিয়াছি!

"একবার মনে করিলাম, ব্রজমোহনকে জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলাম না। মনে করিলাম, দেখিই না, কত দিন তাহারা না আসিয়া থাকিতে পারে। দুইচারি দিন অপেক্ষা করিব। আসে ভালই, না আসে, পুরীর পথ ধরিয়া ভিক্ষা করিতে করিতে, শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইব। আমরা ত সন্ন্যাসিনী; লোকের সঙ্গে আমাদের বাধ্যবাধকতার প্রয়োজন কি?

"ঠাকুরমার মনে কিন্তু কি যেন একটা কি অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে। সেটা প্রথম প্রথম ঠিক করিতে না পারিলেও, আমি মনে মনে বুঝিয়াছিলাম;—নন্দীগ্রামে আমাদের অবস্থানে তিনি বিশেষ সুখী ছিলেন না।

"আমি তাঁতির মেয়ে—ভাগ্যবশে ব্রাহ্মণকন্যা দুটির সঙ্গিনী হইয়াছি। সঙ্গিনী হইবার পর হইতে এই কয়মাস ধরিয়া তাঁহাদের আচারনিষ্ঠা দেখিতেছি।

শুধু ব্রাহ্মণকন্যা বলি কেন—ইঁহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা বিধবা, অপর একজন কুমারী ব্রহ্মচারিণী। দুই জনেই বিষম কঠোরতা অবলম্বনে, অতি সন্তর্পণে, জীবনযাপন করিতেছেন।

"আমি তাঁহাদের মধ্যে পড়িয়া, সঙ্গগুণে অল্পে অল্পে 'বাম্‌নী' হইতে-ছিলাম। আমারও আচার-ব্যবহার ধীরে ধীরে অনেকটা ব্রাহ্মণবিধবার মত হইতেছিল। আমাদের জাতির বিধবাদের যে সমস্ত আচার দোষাবহ নয়, সেগুলা ক্রমে ক্রমে আমার চক্ষে মন্দ ঠেকিতে লাগিল। আমি এখন ইহাদেরই মত হবিষ্যাশী একাহারী। ঠাকুরমার মত আমিও একাদশীর দিনে নিরম্বু উপবাস করি। প্রথম প্রথম বড়ই ক্লেশ হইত; কিন্তু ঠাকুরমাকে সম্মুখে আদর্শ পাইয়া অভ্যাসবশে এখন আমার কষ্ট সহিবার ক্ষমতা হইয়াছে। সত্যকথা বলিতেছি, আমি তাঁতির মেয়ে এ কথা না বলিলে কাহারও আমাকে শূদ্রাণী বুঝিবার সাধ্য ছিল না। দেশভেদে আচারভেদ। আমাদের দেশে কায়স্থ-বিধবারাই ব্রাহ্মণ-বিধবারই মত আচার পালন করেন; কিন্তু এখানে তাহার কিছু পার্থক্য দেখিলাম। শুধু কায়স্থ নয়,—এ স্থানের ব্রাহ্মণ-বিধবারাও আমাদের দেশের মত বৈধব্যের কঠোরতা অবলম্বন করে না।

"নন্দরাণীর বাড়ীতে আসিয়া এই পার্থক্যটাই আমাদের প্রথম লক্ষ্যস্থল হইয়াছিল। যদিও ঠাকুরমা ইহার জন্য তাহাদের কাহাকেও দোষ দিতেন না, তথাপি রাজবাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে সংস্রবে তাঁহার কেমন একটা কুণ্ঠাবোধ হইত। সেখানে যে কয়দিন ছিলাম, সেই কয়দিনই তাঁহাকে দেখিয়া সেটা আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম।

"কিন্তু রাজবাড়ী হইতে অনেকটা দূরে আসিয়াও তাঁহার মনের অস্থিরতা কেন যে দূর হইতেছিল না, সেটা আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই। তবে তাঁহার মুখ দেখিলেই মনে হইত, তিনি যেন সর্ব্বদাই চিন্তা-কুলিত চিত্তে অবস্থান করিতেছেন।

"আমি কিন্তু সে সম্বন্ধে তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করি নাই ; প্রশ্ন করিবার কোনও প্রয়োজন বুঝি নাই। দাক্ষায়ণী এ বাড়ীতে আসিয়া অবধি অনেকটা আনন্দিত আছে দেখিয়া আমি সুখী হইয়াছিলাম। তোমরা যাহা বল, অথবা যাহা বুঝ, আমি কিন্তু তাহার সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়াছিলাম। দাক্ষায়ণীর সহচরী হইবার পর হইতে সেই ধারণা আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

"আমি তাহাকে সর্ব্বদা ভিতর হইতে দেখিবার চেষ্টা করিতাম। চেষ্টায় সফল হইতাম কি না, জানি না ; কিন্তু তাহার মুখ দেখিলেই মনে হইত, সে তাহার দৃষ্টির এক-আনা অংশ বাহিরে রাখিয়া, অবশিষ্ট পোনেরো-আনা ভিতরে লুকাইয়া রাখিয়াছে।

"সেই পোনেরো-আনা দৃষ্টি-শক্তি লইয়া লোকের ভিতরে, যখন সে একবার চক্ষু স্থাপিত করিত, তখন ভিতরের কোন সামগ্রী তাহার আর অগোচর রহিত না।

"এ আমি নিজের বেলায় একদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই দাক্ষায়ণী কতকটা স্ফূর্ত্তিহীন হইয়াছিল। নন্দরাণীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়াই আমার কিন্তু মনোমধ্যে ঈর্ষার উদয় হইয়াছিল। অবশ্য, নানা উপদেশে মনকে অনেকটা শান্ত করিলেও বুদ্‌বুদ্‌গুলাকে নিবারণ করিতে পারিতেছিলাম না। একদিন সেই এক-একটা বুদ্‌বুদের মাথায় আমার পূর্ব্ব-জীবনের এক-একটা ছবি তাহার সমস্ত সুখ-দুঃখের কথা বুকে পুরিয়া, আমার কানের ভিতরে ধ্বনি তুলিতে লাগিল। পিতার ঐশ্বর্য্য, শ্বশুরের সম্পদ্, সম্পত্তির নাশ, মৃত্যুর লীলা, পুত্রের অপঘাত—ছবিগুলার সারি এক-একটা সূচীর আকারে আমার বক্ষ বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

"দাক্ষায়ণী আমার পার্শ্বে বসিয়া সম্মুখে একখানি আর্সী রাখিয়া, সিঁথায় সিন্দুর দিতেছিল এবং মাতৃদত্ত সেই ভস্মমাখা সিন্দুরে অতি-যত্নে কপালে টিপ পরিতেছিল। চোখ ঘুরাইয়া, ঘাড় ফিরাইয়া, সে যেন নিজের সেই অবস্থানের অপূর্ব্ব রূপটি ওলটপালট করিয়া দেখিতেছিল।

"দেখিতে দেখিতে আর্সী হইতে চোখ তুলিয়াই সে বলিয়া উঠিল— 'হাঁ দিদি, তুমি শ্বশুরঘর ছাড়িয়া আসিলে কেন?'

"কথা শুনিবামাত্র আমি চমকিয়া উঠিলাম। প্রত্যুত্তরে আমি প্রতি-প্রশ্ন করিলাম—'কেন ভাই, আসিয়া কি অন্যায় করিয়াছি?'

'আগে বল, কেন ছাড়িয়া আসিয়াছ?'

"বংশের সব নির্ম্মূল হইয়া গেল ও অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইল; একমাত্র ছেলে ছিল, তাকেও শৃগালে খাইল—এই সকল কারণে সেখানে তিষ্ঠিতে পারিলাম না।'

"দাক্ষায়ণী শুনিল, কিন্তু কোনও উত্তর করিল না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—'হাঁ ভাই, আমি কি শ্বশুরের ভিটা ছাড়িয়া অন্যায় করিয়াছি?'

"দাক্ষায়ণী ন্যায়-অন্যায়ের কথা কিছুই না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল— 'শ্বশুরের বাস্তভিটায় সন্ধ্যার দীপ জ্বালিবার জন্য তোমার শ্বশুরবংশের আর কেহ কি অবশিষ্ট আছে?"

"আমি বলিলাম—'কেহ নাই।'

"'কেহ নাই?'

"'না দাক্ষায়ণী, আমি বংশের শেষ বধূ।'"।

"দাক্ষায়ণী আর্সী হইতে মুখ তুলিল—'আমার মুখের পানে অতি

কোমলদৃষ্টিতে চাহিল। সেই মধুময় দৃষ্টিই আমার প্রশ্নের সদুত্তর দিল; তাহার চাহনিতেই বুঝিলাম, আমি অন্যায় করিয়াছি।

"আমি কৈফিয়ত দিবার জন্য বলিলাম—'পোড়া পেটের জন্য আমাকে ঘর ছাড়িতে হইয়াছে।'

"এইবার বালিকা ঈষৎ বিরক্তির সহিত বলিল—'না দিদি, ও কথা বলিও না। ও কথা বলিলে মিথ্যাকথা হয়। আমার বাবার পায়ে তুমি হাত দিয়াছ, তুমি সত্য বলিতে ভয় পাইতেছ কেন?'

"আর আমি তাহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলাম না; চিন্তার-ভারে আক্রান্ত হইয়া তাহার সমীপে বসিয়া রহিলাম—অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। নন্দরাণীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মনে যে ঈর্ষা জাগিয়াছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। আমার বোধ হইল, আমার শ্বশুরের অট্টালিকার ভগ্নাবশিষ্ট ইটগুলি সব সোনার। আমি, সে অতুল ঐশ্বর্য্যের মর্ম্ম না বুঝিয়া, নিজেকে দরিদ্র ভাবিয়া, গৃহত্যাগ করিয়াছি। আমি গ্রামত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমাদের বাড়ীর দুইটি ঘর অবশিষ্ট ছিল। ঘর দুইটি অর্দ্ধভগ্ন হইলেও, আমার মত বিধবার সেখানে যথেষ্ট স্থান ছিল। বাস করিতে ইচ্ছা করিলে—গ্রামে আমার যে চাকরী জুটিত না, এমন নহে। শুধু অভিমানে ও লজ্জায়, আমি গ্রামবাসীর কাহারও গৃহে চাকরী স্বীকার করিতে পারি নাই।

"আমি সেই দশমবর্ষীয়া ক্ষুদ্র বালিকার কাছে অপরাধ স্বীকার করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমি যে এই অধর্ম্মের কাজ করিয়াছি, তাহাতে আমার গতি কি হইবে?'

"দাক্ষায়ণী হাসিয়া উত্তর করিল—'তোমার যা গতি দিদি, আমারও তাই। আমিত তোমাকে ছাড়িতে পারিব না।'

"এই এক কথাতেই আমি আশ্বস্ত হইলাম। পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করিয়া, তাহার পদধূলি লইলাম।

"রাত্রিকালে আমি স্বপ্ন দেখিলাম—আমার স্বামী, শ্বশুর প্রভৃতি শ্বশুর-কুলের চৌদ্দপুরুষ, আমার সেই ভগ্নগৃহের ঘনান্ধকারমধ্যে আবদ্ধ হইয়াছে। মুক্তির অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া, পরস্পরে জড়াজড়ি করিয়া, সকলে একসঙ্গে যেন কাহার সাহায্য-প্রত্যাশায় বসিয়া আছে। আমি সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র, সকলে কাতরকণ্ঠে আমার সাহায্য প্রার্থনা করিল। 'ওগো! বংশের শেষপ্রতিনিধি মমতাময়ী কুলবধু! শীঘ্র আমাদিগকে এই অন্ধকূপ হইতে মুক্ত কর।' কিন্তু হায়, আমার হাতে দীপ নাই! আমি তাহাদের মুক্ত করিব কি—আমি নিজেই গাঢ়-অন্ধকার দেখিয়া ভীত হইয়াছি। মুক্ত করিব কি, আমিই মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছি।

"আমার মনে তখন এক বিষম অনুতাপ উপস্থিত হইল। সন্ধ্যার দীপ দূরে ফেলিয়া, হায়, কি লোভে আমি শ্বশুরের বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়াছি? আমার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল, বক্ষ বিদীর্ণপ্রায় হইল। এমন সময় দেখি—দাক্ষায়ণী, এক অপূর্ব্ব সোনার প্রদীপহস্তে, বাড়ীর সম্মুখের পথ আলোকিত করিতে করিতে, আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়াই আমাকে বলিল—'দিদি! তোর চৌদ্দ-পুরুষের ঐশ্বর্য্য এই বাস্তুভিটার দীপ! ইহাকে নিক্ষেপ করিয়া, তুই কার ভস্ম-সম্পত্তিতে লোভ করিয়াছিলি? এই নে—ইহার সাহায্যে তুই তোর চৌদ্দ-পুরুষকে অন্ধকার-কারাগার হইতে উদ্ধার কর্।'

"পরদিন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া, বুঝিয়াছিলাম—সুবর্ণদীপ হাতে লইয়া সতী সংসারের অন্ধকারময় পথে বাহির হইয়াছে;

জন্মান্তরের পুণ্যফলে আমি তার আঁচল ধরিয়াছি। কার্পণ্য না করিয়া, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যদি তাহার সেবা করিতে পারি, তাহা হইলে শ্বশুরকুলের মুক্তির জন্য আমার আর চিন্তা করিতে হইবে না।

"সুতরাং, নূতন বাড়ীতে আসিবার পর হইতে, নন্দরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়ায় আমি বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলাম। দাক্ষায়ণীকে প্রফুল্ল দেখিয়াই কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম; ভাবিলাম, দাক্ষায়ণীর প্রতি অগাধ স্নেহই পিতামহীর ব্যাকুলতার কারণ হইয়াছে।

"আমাদের বাড়ীখানি খুব বড় না হইলেও, দেখিতে অতি সুন্দর ছিল। গৃহস্থের হিসাবে তাহাকে ঠিক বাড়ী বলা চলে না—অনেকটা বৈঠকখানারই ধরণের। তাহার সদর অন্দর দুই'ই সমান ছিল। কেবল একটা রান্নাবাড়ী তাহার সঙ্গে সংলগ্ন ছিল বলিয়া, তাহা আমাদের বাসযোগ্য হইয়াছিল। তবে সে বাগানে পুরুষ-মানুষের প্রবেশ নিষেধ ছিল; এইজন্য আমাদের সদর-অন্দর আলাহিদা করিবার প্রয়োজন হয় নাই। বাহিরের দিকে এক দরোয়ান পাহারা দিত; সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। আমাদের মধ্যে দুই জন বিধবা, আর একটি বালিকা; সুতরাং দরোয়ানকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইবার মত লোক আমাদের মধ্যে কেহই ছিল না।

"দাক্ষায়ণী পুষ্করিণীতীরে বেড়াইতেছিল। আমি বাহিরদিকের বারান্দায় বসিয়া, সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখিয়া, তাহার গতিবিধি দেখিতেছিলাম। দূরে ফটকের পার্শ্ববর্ত্তী ঘরের রোয়াকে বসিয়া, দরোয়ান অতি তন্ময়তার সহিত সিদ্ধি বাটিতেছিল। ফটক ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত হইয়া, মাদকসেবনের পূর্ব্বেই তার চিন্তার নেশায় বুঁদ হইয়াছিল।

"আমি দেখিলাম, দাক্ষায়ণী বেড়াইতে বেড়াইতে পুষ্করিণীর তীর পরিত্যাগ করিয়া ফটকের দিগভিমুখে চলিল। ভাবিলাম, সদরের দিকে যাইতে তাহাকে নিষেধ করি। আবার ভাবিলাম, সঙ্গিহীন বালিকার ইচ্ছামত ভ্রমণের আনন্দে বাধা দিবার প্রয়োজন নাই। বাধা দিলাম না। দাক্ষায়ণী দরোয়ানের সম্মুখ দিয়া, বাড়ীর অপরপার্শ্বের আমকাঁটালের বাগানের দিকে চলিয়া গেল। যেখানে বসিয়া ছিলাম, সেখান হইতে আর তাহাকে দেখা গেল না। দেখিলাম, দরোয়ানও তাহাকে দেখিতে পাইল না।

"তাহার দাসীত্ব গ্রহণের দিন হইতে আমি তাহাকে সর্ব্বদাই চোখে-চোখে রাখিয়া আসিতেছি। জাগরণে, এক দণ্ডের জন্যও যে তাহাকে কাছছাড়া করিয়াছি, অথবা একা থাকিতে দিয়াছি, ইহা আমার মনে হয় না।

"সুতরাং দৃষ্টির অন্তরাল হইবামাত্র বাড়ীর অপর পার্শ্বের বারান্দায় যাইবার জন্য আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের মধ্য হইতে একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম। শব্দটায় অনুমান হইল, একটা গুরু-সামগ্রী যেন মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

"আমি ছুটিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল; দেখি, ঠাকুরমা মেঝের পড়িয়া সংজ্ঞা হারাইয়াছেন! আমি সে দৃশ্য দেখিয়া, নিজেই প্রথমে সংজ্ঞাহারার মত হইলাম। সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। ঝি কাজকর্ম্ম সারিয়া, কিয়ৎক্ষণের জন্য ছুটি লইয়া, নিজের বাড়ীতে গিয়াছে।

ঠাকুরমার সাহায্য করিতে আমি একা। দাক্ষায়ণীকে ডাকিবার আমার ইচ্ছা ছিল না; সে বালিকা, মায়ের অবস্থা দেখিলে ভয়ে ব্যাকুল হইতে পারে।

"মুহূর্ত্তে, সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া, আমি নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইলাম। ক্ষিপ্রগতিতে অপর গৃহে রক্ষিত জলের ঘড়া লইয়া আসিলাম। জলাধার ভূমিতে রাখিয়া, একবার অঞ্চলে কোমর বাঁধিলাম।

"সেই ঘরের একপার্শ্বে মেজের উপরেই ঠাকুরমার শয্যা ছিল। আমি ভাবিলাম, শয্যা বিছাইয়া, অগ্রে তাহার উপর শয়ন করাইয়া, তাঁহার শুশ্রূষা করি—অথবা তাঁহাকে সুস্থ করিয়া পরে শয্যার উপর রক্ষা করি? শেষোক্ত কার্য্যটাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া, আমি কলসী হইতে প্রথমে অঞ্জলি পূরিয়া জল লইলাম। ঠাকুরমাকে তদবস্থ দেখিয়া, চিত্তের অত্যন্ত চাঞ্চল্যবশতঃ আমি একটা ঘটী আনিতে ভুলিয়াছিলাম। এইজন্য এক হস্তের অঞ্জলি ভিন্ন জল-সংগ্রহের আমার অপর উপায় ছিল না।

"মুখে জল দিতে গিয়া আমার মনে হইল, ব্রাহ্মণকন্যার, বিশেষতঃ ঠাকুরমার মত নিষ্ঠাবতী বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার মুখে শূদ্রাণী হইয়া কেমন করিয়া অঞ্জলির জল দিব।

"মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত হইতে জল পড়িয়া গেল। যাহা জীবনে কখন করি নাই, তাহা করিতে আমার সাহস হইল না। হিন্দু-বিধবা দেহটাকে সত্য-সত্যই আত্মার পিঞ্জর মনে করিয়া থাকে। নিজে ভাঙিলে আত্মহত্যা হয় জানিয়া, পবিত্র স্থানে পবিত্র মুহূর্ত্তে পবিত্রভাবে তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য মৃত্যুর আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে।

"মুখে জল দিতে সাহসী না হইয়া, সিক্তহস্ত তাঁহার বক্ষে সংলগ্ন করিয়া আমি তাঁহাকে ডাকিলাম—উপর্য্যুপরি তিনবার ডাকিলাম—ঠাকুরমার সংজ্ঞা ফিরিল না। তখন মনে করিলাম, শুশ্রূষার জন্য দাক্ষায়ণীকে লইয়া আসি।

"চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই গৃহত্যাগ করিলাম। বাহিরে আসিয়াই বাগানের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম। তখন সন্ধ্যার একরূপ সূচনা হইয়াছে। জগৎকে আচ্ছন্ন করিবার প্রাক্‌কালে আঁধারের দেবতা নিজের দলবল লইয়া সঙ্গোপনে যেন গাছের ঝোপ আশ্রয় করিতেছে। বাগানের বাহিরে দাক্ষায়ণী ত নাই!—বাগানের ভিতরেও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না!

"আমি ডাকিলাম—'দাক্ষায়ণি!'—উত্তর পাইলাম না! একবার, দুইবার, তিনবার। তৃতীয়বারেও যখন তাহার উত্তর পাইলাম না, তখন বুঝিলাম, সে বাগানের ভিতর নাই। হয় ত এদিকে কিছুক্ষণের জন্য বেড়াইয়া আবার সে পুষ্করিণীর দিকে ফিরিয়া গিয়াছে।

"বাড়ী বেড়িয়া পুষ্করিণীর দিকে যাইতেছি, এমন সময় দেখি, যেন বাবুর মত কে একজন—সন্ত্রস্তভাবে ফটকের দিকে চলিয়া গেল।

"কে গেল, গেল—কি না গেল, তাহা জানিবার তখন সময় ছিল না। আমি দেখিলাম, দরোয়ান তখনও পর্য্যন্ত সেইরূপ একমনে সিদ্ধি বাটিতেছে। আমার উপস্থিতি যখন তাহার লক্ষ্য হইল না, তখন বুঝিলাম —সেই অপরিচিত ব্যক্তিও তাহার অলক্ষ্যে বাগানে প্রবেশ করিয়া আবার চলিয়া গিয়াছে।

"পুষ্করিণীর দিকে আসিয়াও দাক্ষায়ণীকে দেখিতে পাইলাম না। তখন

মনে একটা বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইল ! এখন একরূপ হাসিতে হাসিতেই সে দিনের কথা বলিতেছি ; কিন্তু আমার সে দিনের অবস্থা কেহ স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিলেই আমার আতঙ্কটাও সেই সঙ্গে প্রণিধান করিতে পারিবেন। একদিকে, পিতামহী সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় পড়িয়াছেন ; অন্যদিকে দাক্ষায়ণীর দেখা মিলিতেছে না—সঙ্গে সঙ্গে কি জানি কেন, কোথা হইতে কেমন-করিয়া-আসা একটা লোকের সন্দেহজনক গতিবিধি। আমার বুক এরূপ তীব্রবেগে কাঁপিয়া উঠিল যে, মনে হইল—আমিও বুঝি পিতামহীর মত পথের মাঝে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হই।

“অতি কষ্টে হৃদয়কে একরূপ স্থির করিলাম। বাড়ীর পূর্ব্বদিকে জলাশয়, দক্ষিণে ফটক, পশ্চিমে বাগান। এ তিনদিকেই আমি দেখিলাম। দেখিতে বাকি শুধু উত্তরদিক ; কিন্তু সে দিকে বেড়াইবার স্থান ছিল না। উত্তরদিকেই আমাদের পাকশালা ; তাহার দুইচারি হাত দূরেই বাগানের উত্তর সীমার প্রাচীর, তাহার গায়ে একটি ছোট দ্বার দেখিয়াছি মাত্র—সে দ্বার আমরা আজিও পর্য্যন্ত কেহ খুলি নাই। সুতরাং প্রাচীরের ওপাশে কি আছে, তাহা দেখিবার অবকাশ পাই নাই।

“পিতামহীর অবস্থা কি হইল—বুড়ী বাঁচিল কি মরিল—তাহা দেখিবার এখন আমার সময় নাই। আমি রান্নাঘর বেড়িয়া উত্তরদিকের প্রাচীরের গায়ের সেই ছোট দ্বারটির নিকট উপস্থিত হইলাম।

“উপস্থিত হইয়া দেখি, দ্বার খোলা। দ্বার হইতে মুখ বাহির করিয়া দেখি, একটি সরু খাড়ি। একটি ছোট শানবাঁধা ঘাট দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া খাড়িমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এখন কূলে কূলে জোয়ার ; প্রচণ্ড-বেগে জলরাশি বাগানের প্রাচীরের গা বাহিয়াই যেন ছুটিয়াছে। ঘাটের

সবেমাত্র চারিটি ধাপ ডুবিতে বাকি আছে—তাহা ডুবিতেও আর বড় বিলম্ব নাই। যেরূপ তেজে এখনও জল ছুটিতেছে, আর একটুপরেই তাহা দ্বারের চৌকাঠ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে।

"খাড়ি ও সেই সঙ্গে দ্বার খোলা দেখিয়া আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। আমি একেবারে বুঝিলাম, দাক্ষায়ণীকে হারাইয়াছি। কৌতূহল-বশে দ্বার খুলিয়া, বালিকা সিঁড়ি বাহিয়া জলে নামিয়াছে, অমনি কোনও রকমে পদস্খলিত হইয়া স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে!

"কি করিব? ঠাকুরমার ঐরূপ অবস্থা—বুঝি আর তাঁর সংজ্ঞা ফিরে নাই; এদিকে দাক্ষায়ণীও স্রোতে ভাসিল! তবে আমার আর জীবন রাখিবার প্রয়োজন কি? মনে করিলাম, আমিও স্রোতের জলে ঝাঁপ দিই। সহসা তখন মনের অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে, যদ্যপি জলে পড়িলে মৃত্যু হইবে বুঝিতাম, তাহা হইলে সেই দণ্ডেই—শ্রাবণের পুঞ্জপুঞ্জ মেঘাচ্ছাদিত আকাশতলে, নদীর জোয়ারেরই মত প্রচণ্ডবেগে আগত অন্ধকারমুখী সন্ধ্যায়—আমি নদীজলে ঝাঁপ দিতাম; কিন্তু জলে পড়িয়া দাক্ষায়ণী ডুবিয়াছে বলিয়া, আমি অভাগিনীও যে ডুবিব, তাহার সম্ভাবনা কি? দাক্ষায়ণী সাঁতার জানে না, আমি সাঁতার জানি। ডুবিতে গিয়া, যদি নদীতীরের কোন স্থানে সংলগ্ন হই?

"একবার ঠাকুরমাকে দেখিয়া পরে মরিবার জন্য কোন ব্যবস্থা করিব, স্থির করিলাম। মৃত্যুর সংকল্পই আমার সার হইল। মরণ-ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই আমার আরাধ্য সচল দেবীর প্রতিমাটি আমার চোখের উপর পড়িয়া গেল। দ্বার বন্ধ করিয়া দুই চারি পদ অগ্রসর হইতেই দেখি—দাক্ষায়ণী! এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া সে যেন আমাকেই অন্বেষণ করিতেছে।

"দেখিবামাত্র অতিহর্ষে এমন বেগে গণ্ডপথে অশ্রুধারা ছুটিল যে, আমি কিছুক্ষণের জন্য দাক্ষায়ণীকে দেখিতে পাইলাম না। চলিতে চলিতে আমাকে একবার দাঁড়াইতে হইল; সেই অবস্থাতেই বাষ্পগদগদকণ্ঠে আমি বলিয়া উঠিলাম—'এতক্ষণ কোথায় ছিলি দাক্ষায়ণি?'

"দাক্ষায়ণী এতক্ষণ আমাকে দেখিতে পায় নাই—দেখিতে পাইলে সে চুপ করিয়া থাকিত না। অন্ধকার দেখিতে দেখিতে বেশ ঘন হইয়াছে। তাহার উজ্জ্বল মুখশ্রী ঢাকিবার অন্ধকার বিধাতার ভাণ্ডারে নাই বলিয়াই আমি তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম।

"দাক্ষায়ণী উত্তর করিল—'তুমি কোথায়? আমিই ত তোমাকে খুঁজিতেছি। ঠাকুরমা তোমাকে ডাকিতেছেন।'

'ঠাকুরমা কেমন আছেন?'

'কেন, তাঁর কি হইয়াছে।'

"এই প্রশ্নেই বুঝিলাম, ঠাকুরমা সুস্থ হইয়াছেন। দাক্ষায়ণীকে তিনি তাঁহার মূর্চ্ছার কথা বলেন নাই। প্রশ্ন করিয়া আমি বিপদ্‌গ্রস্ত হইলাম। দাক্ষায়ণীকেত মিথ্যাকথা কহিতে পারিব না। সেই সত্যবাদিনীর সঙ্গিনী হইয়াও যদি মিথ্যা কহিতে হয়, তাহা হইলে জন্মই বৃথা। অথচ ঠাকুরমা যখন শুনান নাই তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, দাক্ষায়ণীকে অসুখের কথা বলাটা আমি ভাল বিবেচনা করিলাম না। এই জন্য, তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, আমি প্রতি-জিজ্ঞাসা করিলাম—'এ দোর কি তুমি খুলিয়াছিলে?'

"দাক্ষায়ণী বলিল—'না।'

"তবে কে খুলিল?"

"দাক্ষায়ণী বলিল, 'ঘরে চল ; সেখানে গেলেই সকল কথা জানিতে পারিবে। ঠাকুরমা তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন।'

"ঘরে ফিরিয়া দেখি, ও মা! এ কে!—'খুড়া-মহাশয় কোথা হইতে আসিলে?'

"খুড়ামহাশয় উচ্চ হাস্যের সহিত বলিয়া উঠিল—'যমপুরী হইতে আসিতেছি, বেটি, তোমার মুণ্ডপাত করিবার জন্য। দুনিয়ায় এমন কোন্ জায়গা আছে যে, সেখানে লুকাইয়া যমকে ফাঁকি দিবে?'

"খুড়া একখানি অতি সুন্দর লালপেড়ে ফরাসডাঙ্গার ধুতি পরিয়াছিল। গায়ে একটি পরিষ্কার বেনিয়ান ও মাথায় পাগড়ী ছিল। খুড়ার বেশের পারিপাট্য এই আমি প্রথম দেখিলাম। যতদিন তাহাদের দেশে ছিলাম, একদিনও হাঁটুর নীচেয় পড়া কাপড় তাঁহাকে পরিতে দেখি নাই। একখানি গামছা কাঁধে থাকিয়া সর্ব্বদাই উত্তরীয়ের কাজ করিত। আমি বলিলাম—'খুড়া, এ রাজবেশ কোথায় পাইলে?' খুড়া বলিল,—'রাজার বাড়ী আসিতেছি, এ বেশ না হ'লে মানাইবে কেন? শুধু কি তাই, সঙ্গে আমার বরকন্দাজ আসিয়াছে।'—'তুমিই কি বাবুবেশে বাগানে বেড়াইতেছিলে?' খুড়া একটু মৃদু হাসিয়া বলিল—'বাগানটা যেন নিজের, মনে হইয়া গেল। পা আপনা আপনি 'চারি' করিতে লাগিল। কিন্তু হাঁ দয়াময়ি, খুব পাহারাদার ত তোমাদের ফটকে রহিয়াছে। কতবার তাহার পাশ দিয়া আসিলাম, সে ত দেখিতে পাইল না!' আমি বলিলাম—'এখন সে নন্দীভৃঙ্গীকে দেখিতেছে। বাবু দেখিবার তার সময় নাই।'

"এক মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত উদ্বেগ-আতঙ্ক উল্লাসে পরিণত হইয়াছে।

আমি খুড়াকে প্রণাম করিতে করিতে বলিলাম,—'তোমাদের বউ থাকিতে যমপুরীর কাহারও এখানে প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই। তুমি শিবের পুত্র গণেশ—সর্ব্বসিদ্ধিদাতা—তাই এই সতীমন্দিরে প্রবেশ করিতে পাইয়াছ।'

"অধিকক্ষণ ধরিয়া আলাপের তখন অবকাশ ছিল না। ঠাকুরমাকে মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম। সর্ব্বাগ্রে তাঁহার তথ্য লওয়া প্রয়োজন, বুঝিয়া আমি তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলাম।

"দেখিলাম, ঠাকুরমা সুস্থ হইয়াছেন; ইহারই মধ্যে হাত-পা-মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া, আহ্নিকে বসিয়াছেন। সুতরাং এ সময়ে কোনও কথা কহিয়া তাঁহাকে ব্যস্ত করিতে ইচ্ছা করিলাম না। আমি আবার খুড়া মহাশয়ের কাছে ফিরিলাম।

"খুড়ামহাশয়ের আগমনে আমি বিশেষ বিস্মিত হই নাই। হুগলীতে খুড়ার চরিত্রের আভাস পাইয়াছিলাম। পরবর্ত্তিকালে তাহাদের গ্রামে থাকিয়া, তাহাকে বিশেষভাবে চিনিয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম, খুড়া আমাদের অনুসন্ধানে বাহির হইবেই—আমাদের সন্ধান না করিয়া সে নিরস্ত হইবে না। ঠাকুরমা'র উপর তার ভক্তি অতুলনীয়, অগাধ! তবে এত শীঘ্র যে সে আমাদের খুঁজিয়া পাইবে, এটা বিশ্বাস করি নাই।

"তাহাকে পাইয়া, আমাদের সকলেরই আনন্দের অবধি রহিল না। নন্দরাণী ও তাহার আত্মীয়বর্গের অনুপস্থিতিতে যদিও আমাদের অসন্তুষ্ট হইবার কিছু ছিল না, তথাপি আমার মন একেবারে আশঙ্কা-শূন্য হয় নাই। আমরা তিনটি স্ত্রীলোক; আসিয়াছি—দেশ হইতে অনেক দূরে; পড়িয়াছি—এক বলবান্ জমীদারের আয়ত্তের ভিতরে।

এ দেশের লোকের সঙ্গে এখনও আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই।

"নানাকারণে স্বভাবতঃই আমার মন কিছু উদ্বিগ্ন ছিল। বিশেষতঃ ক্ষণ-পূর্ব্বে আমি বড়ই ভয় পাইয়াছিলাম। এখন সেটা অমূলক বুঝিলেও, আমি মনে মনে পূর্ব্ব-ভয়ের দুই একটা কারণ গড়িয়া লইয়াছিলাম।

"এখনও নিতান্ত বালিকা হইলেও, দাক্ষায়ণীর রূপ অপূর্ব্ব। এই বালিকা-বয়সেও তাহার নয়নাভিরাম রূপের জ্যোতিঃ লোকের দৃষ্টি যেন সবলে আকর্ষণ করে;—তা সে পুরুষই হউক, অথবা স্ত্রীলোকই হউক। এখানে আসিবার দুই তিন দিনের মধ্যেই বালিকার রূপের খ্যাতি গ্রামের সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়াছে! সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

"আমি কিন্তু বুক দিয়া ঢাকিয়া, পুরুষমানুষের দৃষ্টি হইতে সে রূপ সরাইয়া রাখিয়াছি। ললিতার স্বামী ব্রজমোহন দেখিয়াছে কি না, জানি না; রাজবাড়ীর আর কেহ, এমন কি, নন্দরাণীর পুত্রকেও আমি দাক্ষায়ণীকে দেখিতে দিই নাই। যখন তাহাদের বাড়ীতে ছিলাম, তখন বালক—মাকে দেখিবার অছিলায়—মাঝে মাঝে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিত। অন্বেষণ করিতে করিতে, মহলের যে অংশে আমরা থাকিতাম, সেই দিকে আসিত। তার মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া বুঝিতাম —মাতৃ-অন্বেষণের ছলে সে দাক্ষায়ণীকে দেখিতে আসিয়াছে।

"উনিশ-বৎসর বয়সের হইলেও, হরেন্দ্রের আকার বালকেরই মত ছিল; মুখে-চোখেও আমি তাহার বালকভাবই লক্ষ্য করিয়াছিলাম। দাক্ষায়ণীকে দেখিবার আকিঞ্চন তাহার কৌতূহলমাত্র, আমি অনুমান

করিয়াছিলাম ;—তাহার দুরভিসন্ধি অনুমান করি নাই। এই জন্য কাহাকেও তাহার কথা বলি নাই। একবার তাহার কৌতূহল চরিতার্থ দেখিতে আমার ইচ্ছাও হইয়াছিল; কিন্তু আমি ত জোর করিয়া অথবা কৌশল করিয়া, দাক্ষায়ণীকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিব না! সুযোগ ঘটিলে সে তাহাকে দেখিতে পাইত; সুযোগ ঘটে নাই, তাই, দেখিবার অনেক চেষ্টা করিয়াও, সে দেখিতে পায় নাই।

"আমি মনে করিয়াছিলাম, হয় ত হরেন্দ্রই দাক্ষায়ণীকে দেখিবার লোভে সকলের অজ্ঞাতসারে বাগানে প্রবেশ করিয়াছে।

"সে তা করিলে, আমার বিলক্ষণ চিন্তার বিষয় হইত। তা করিলে, আমাদের নন্দীগ্রাম ত্যাগ করিতে হইত; দুই দিনও আমাদের সেখানে বাস চলিত না।

"তৎপরিবর্ত্তে খুড়ামহাশয়কে দেখিয়া আমি সর্ব্বপ্রকারে নিশ্চিন্ত হইলাম।

"বহুদূর হইতে, তিন চারি দিন ধরিয়া খুড়া আসিতেছে। তাহার পথের ক্লেশ আমাদের নিজের কষ্ট হইতেই আমি অনুমান করিয়া লইয়াছি। তবু নন্দরাণী আমাদিগকে রাণীর মত যত্নেই লইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং, তাহাকেও সে সময় অন্য প্রশ্নে উত্ত্যক্ত না করিয়া তাহার পরিচর্য্যাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয় বোধ করিলাম।

"আমি বলিলাম—'আজ বোধ হয়, সারাদিন অন্নাহার হয় নাই।'

"সারদিন কেন—চারদিন সারাপথ কেবল হাড়ের মত চিঁড়ে চিবাইয়াছি।'

"আমি আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া, একটা ঘটী জলপূর্ণ করিয়া

আনিলাম। দাক্ষায়ণী পূর্ব্বেই তাহাকে বসিবার আসন দিয়াছিল। পা ধুয়াইয়া দিবার জন্য তাহাকে আসন ত্যাগ করিতে বলিলাম। খুড়া বলিল, 'পুষ্করিণীতে, পা ধুইয়াছি।'

"এই সময়ে রাজার দেবালয়ে আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে রাজবাড়ীর দেউড়ী হইতে নহবতের ধ্বনি উঠিল। আমি বলিলাম—'তবে শীঘ্র সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া মুখে কিছু জল দাও!'

"জল পরে দিব। আগে তামাক খাইব।'

"সর্ব্বনাশ! তামাক কোথা পাইব?

"তামাক নাই শুনিয়া, খুড়া একটু তেজস্বিতার সহিত বলিয়া উঠিল—'সে কি দয়াময়ি! এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে আমার জ্যেঠাইমাকে সঙ্গে আনিয়া সংসার পাতিয়াছ। আমার মত দু'দশটা ভূতপ্রেত সঙ্গে সঙ্গে আসিবে, এটা কি বুঝিতে পার নাই?'

"তুমি কি ভূত?'

"শুধু ভূত—গো-ভূত। আমি জানি, যখন ঘর ছাড়িয়াই তোমরা আসিয়াছ, তখন তীর্থস্থান ভিন্ন অন্য কোথাও তোমরা যাইবে না। এমন ভাগাড়ে আসিবে, তা কেমন করিয়া জানিব? ভারতের সমস্ত তীর্থ খুঁজিয়া তোমাদের বাহির করিবার জন্য দাদা আমাকে পথের খরচ দিয়াছেন। মানুষ হইলে ফাঁকতালে তীর্থ দেখিয়া আসিতাম। গো-ভূত বলিয়া এই ভাগাড়ে আসিয়াছি।'

"খুড়ার কথায় লজ্জিত হইবার কারণ থাকিলেও, মনে মনে বড় খুসী হইলাম। হরিহরের বাপ-মা তাঁদের ভ্রম বুঝিয়াছেন—মায়ের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারে অনুতপ্ত হইয়াছেন—মাকে ফিরাইতে লোক

পাঠাইয়াছেন। মায়ের সঙ্গে দাক্ষায়ণীও নিশ্চয়ই এইবার শ্বশুরের ঘরে স্থান পাইবে; হরিহরের সঙ্গে মিলিত হইবে।

"মনের উল্লাস মনেই রাখিয়া, আমি খুড়ামহাশয়কে—'অপেক্ষা কর, আমি তামাকের ব্যবস্থা করিতেছি।' এই বলিয়াই আমি ডাকিলাম—'ঝি!' উত্তর পাইলাম না। ভৃত্য স্বরূপচন্দ্র সন্ধ্যার পর হইতেই বারান্দায় থাকিয়া, সারারাত্রি আমাদের প্রহরায় নিযুক্ত থাকে। এতক্ষণে আসিয়াছে মনে করিয়া ডাকিলাম—'স্বরূপ!' তাহারও উত্তর পাইলাম না।

"খুড়া বলিল—'ইহাদের কেন ডাকিতেছ?'

"দোকান হইতে হুঁকা, কলিকা, তামাক আনিয়া দিবার জন্য।'

"অত কষ্ট তোমাকে করিতে হইবে না'—এই বলিয়া খুড়া বারান্দার দিক্ লক্ষ্য করিয়া একটু মিটেকড়া সুরে কাহারে ডাকিল—'ভাই গো ভূত!'

"বারান্দা হইতে কে উত্তর দিল—'হুজুর!'

"একটু তামাক সাজ্।'

"স্বর যেন পরিচিত; যেন কোথায় কতদিন ধরিয়া শুনিয়াছি। বিস্মিতভাবে খুড়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'কাহাকে সঙ্গে আনিয়াছ?'

"নিজেই গিয়া দেখিয়া আইস।'—এই বলিয়া খুড়া আসনত্যাগ করিল এবং একটা পুঁটুলির সঙ্গে বাঁধা হুঁকা বাহির করিল। আমার হাতে দিয়া বলিল—'দয়াময়ি! এইটাকে আগে পেট ভরিয়া জল খাওয়াইয়া দাও।' এই বলিয়াই খুড়া গান ধরিল—

'যে ভাব জানে না, ওরে মন, তার কিসের আনাগোনা।
যে ভাবের ভাবুক, সেই বোঝে রে ধিন্তাধিনা পাকা-নোনা॥'

"খুড়ার গান শুনিতে শুনিতে, হুঁকাতে জল পূরিবার জন্য আমি ঘাটে চলিলাম। বারান্দায় পা দিবামাত্র, কে একজন ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

"আমাকে ব্রাহ্মণী-জ্ঞানে প্রণাম করিয়াছে মনে করিয়া আমি নিজের অবস্থা জানাইয়া, তাহাকে প্রতিপ্রণাম করিতে যাইতেছি, এমন সময় সে বলিয়া উঠিল, 'খুড়ী আমি যে কার্ত্তিক।'

* * * *

"সে রাত্রির আনন্দের কথা তোমাকে আর কি বলিব হরিহর! আনন্দে সারারাত্রির মধ্যে এক লহমার জন্যও আমি চোখের পলক ফেলিতে পারি নাই। সে দিনের সন্ধ্যাকালের বিষম আতঙ্কমুখে কোথা হইতে যেন কার্ত্তিক-গণেশ দুইপুত্র দ্বারিরূপে মন্দিরদ্বার আগুলিতে ছুটিয়া আসিয়াছে!"

(৪৪)

পিতামহীর অনুসন্ধানে বাহির হইয়া গণেশখুড়া প্রথমেই কালীঘাটে উপস্থিত হইয়াছিল। উদ্দেশ্য, যদি সেখানে সে পিতামহীসম্বন্ধে কোনও কিছু জানিতে পারে। যদি না পারে, খুড়া স্থির করিয়াছিল, সে স্থান হইতে একেবারে কাশী অভিমুখে চলিয়া যাইবে। কাশীই হিন্দুর পক্ষে, বিশেষতঃ হিন্দু বিধবার পক্ষে শ্রেষ্ঠতীর্থ—তাহার শেষজীবনের পবিত্রতম অবস্থান-ভূমি।

গণেশখুড়া কালীঘাটে, নানা উপায়ে, ঠাকুরমার তত্ত্ব লইবার চেষ্টা করিল; তাহার চেষ্টা নিষ্ফল হইল না। এইখানে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়। ব্রহ্মচারীর সাহায্যেই খুড়া নন্দীগ্রামে পিতামহীর অবস্থান জানিতে পারিয়াছিল।

অনুসন্ধানের সূত্র ধরিয়া খুড়া নন্দীগ্রামে উপস্থিত হইয়াছে! কিন্তু মাঝখান হইতে খুড়া, তাহার পরমস্নেহাস্পদ পেয়াদাপ্রবর, শ্রীমান্ কার্ত্তিকচন্দ্র সরদারকে কোথায় লাভ করিল? গণেশখুড়া দয়াদিদির কাছে ঐরূপ ভাবেই কার্ত্তিকের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধপ্রকাশ করিয়াছিল। এ মিলনে একটু বিশেষত্ব ছিল। কেন না, তাহার সঙ্গে খুড়ার পুনর্ম্মিলনের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। আমাদেরই ছিল না, তা খুড়ার! আমরা জানিতাম, চাকরীসূত্রে আর আমরা হুগলীতে প্রত্যাগমন করিব না। সুতরাং বন্ধুরূপে আমরা এই একবৎসর সেখানে যাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলাম, তাহাদের সঙ্গে সে মিষ্টসম্বন্ধ আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। অনেকের সঙ্গে হয় ত এ জীবনে আর আমাদের সাক্ষাৎ হইবে না!—কার্ত্তিকও তাহাদের মধ্যে একজন।

দৈবঘটনায় সেই কার্ত্তিক নন্দীগ্রামে গণেশখুড়ার সঙ্গী! কালীঘাটেই তাহার সহিত গণেশখুড়ার সাক্ষাৎ। সাক্ষাতের পরেই বিনা-মাহিনার চাকর-রূপে সে খুড়ার অনুগামী হইয়াছে।

গণেশখুড়াকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেও, কার্ত্তিককে তাহার সঙ্গে দেখিয়া দয়াদিদি অধিকতর বিস্মিত হইয়াছিল। কৌতূহলপরবশ হইয়া সে তাহার আগমনসম্বন্ধে দুই একটা প্রশ্ন করিয়াছিল—উভয়কেই করিয়াছিল। কিন্তু কেহই তাহাকে সদুত্তর দেয় নাই। প্রশ্নে বুঝিয়াছিল, কার্ত্তিক চাকরীতে ইস্তফা দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কেন আসিয়াছে, তাহা দুইজনের কেহই তাহাকে পরিষ্কাররূপে বলে নাই।

দয়াদিদি জানিত, কার্ত্তিক যে-চাকরী করে, তাহার মাহিনা অল্প হইলেও, পাঁচরকমে সে অনেক পয়সা রোজগার করিত। এমন চাকরী

সে হঠাৎ পরিত্যাগ কেন করিল, দয়াদিদির জানিবার ইচ্ছা হইয়াছিল।—ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই।

ইচ্ছা পূর্ণ হইতে গণেশখুড়াই দেয় নাই। সে দয়াদিদিকে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল—"আমরা আসিয়াছি, এই-মাত্র জানিয়া রাখ। কার্ত্তিককে কালীর দানরূপে পাইয়াছি। তাহার সংসারে কেহ নাই। তাহার অসদুপায়ের উপার্জ্জনে যাহা-কিছু সে কিনিয়াছিল, মা কালী করুণাবশে তাহা সমস্ত কাড়িয়া লইয়াছেন। তাহাকে তোমাদের চাকর করিয়া রাখিতে ইচ্ছা কর—আমরণ সে তোমাদের চাকরী করিবে।"

দয়াদিদি ইহার পর কার্ত্তিককে তৎসম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। সে তাহাদের রক্ষিরূপে সঙ্গে থাকিবে—এই জানিয়াই দয়াদিদি আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। কার্ত্তিকের বয়স তখন পঞ্চাশের উপর। এরূপ বিজ্ঞ ভৃত্যকে সে যথেষ্ট লাভ মনে করিয়াছিল।

কিন্তু, একটা প্রশ্ন করিবার লোভ দয়াদিদি ত্যাগ করিতে পারে নাই। আহারাদিকার্য্য নিষ্পন্ন করাইয়া সে যখন কার্ত্তিকের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতেছিল, তখনও কার্ত্তিক তাহাকে 'খুড়ীমা' বলিয়া সম্বোধন করিল।

হুগলীতে কার্ত্তিক দয়াদিদিকে 'ঝি' বলিয়া ডাকিত। একদিনও তাহার মুখ হইতে একটা সামান্য সম্মান-সূচক বাক্য বহির্গত হইতে সে শুনে নাই। আজ উপর্য্যুপরি তাহার মুখ হইতে এই অপূর্ব্ব আপ্যায়ন-কথা নির্গত হইতে শুনিয়া দয়াদিদি জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ, কার্ত্তিক! বাছিয়া বাছিয়া এ সম্পর্ক কোথা হইতে পাইলে?"

কার্ত্তিক বলিল—"তোমাকে দেখিয়া প্রথমটা আমি কতকটা হতভম্বের

মত হইয়াছিলাম। সেখানে তোমাকে 'ঝি' বলিয়া ডাকিতাম। একদিন ভুলে 'ঝিমা' পর্য্যন্ত বলি নাই। কি বলিয়া তোমাকে ডাকিব, ভাবিতে গিয়া মুখ হইতে ঐ কথাটাই বাহির হইয়া গিয়াছে।"

"তা, এত সম্পর্ক থাকিতে, অমন উদ্ভট্-সম্পর্কই বা মনে উদয় হইল কেন? আমাকে 'ঝিমা' ত বলিতে পার।"

"তোমার মুখ দেখিয়া তোমাকে 'ঝি' বলিতে আমার সাহস হইল না।"

"এখানকার চাকর-বাকরে আমাকে 'মাসীমা' বলিয়া ডাকে—রাজার পুত্রকন্যাও আমাকে ঐ সম্পর্কেই সম্বোধন করিয়া থাকে। তুমিও আমাকে তাই বলিও।"

"তুমি বলিতে বল, বলিব; কিন্তু তোমাকে দেখিয়া হঠাৎ আজ আমার এক খুড়ীমার কথা মনে পড়িয়া গেল।"

"সে কি তোমাদেরই জাত?"

"না। অনেকদিন আগে আমি তাহাদের ঘরে চাকরী করিতাম। তুমি যেমনি ঘর হইতে বাহির হইয়া বারন্দায় পা দিয়াছ, অমনি দেওয়ালের আলোটা তোমার মুখের উপর পড়িল;—পড়িতেই মনটা যেন কেমন ছাঁৎ করিয়া উঠিল। বহুদিন পূর্ব্বে দেখা একখানি মুখ আমার মনে পড়িল; আমি তাঁহাকে 'খুড়ীমা' বলিতাম—তাঁহার স্বামীকে 'খুড়া মহাশয়' বলিতাম। সেই সব কথা মনে হঠাৎ জাগিয়া উঠিতেই আমি তোমাকে 'খুড়ীমা' বলিয়াছি।"

"হুগলীতে ত আমাকে কতকাল দেখিয়াছ; সেখানে কি একদিনও তা'র কথা মনে পড়ে নাই?"

"কই, তা' ত পড়ে নাই।"

"তাদের ঘরে কি চাকরী করিতে ?"

"রাখালি করিতাম।"

দয়াদিদি বলিয়াছিল—"রাখালের কথা শুনিবামাত্র আমি চমকিত হইয়াছিলাম। আমি তাহার মুখের পানে একদৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। তাহার এখনকার আধপাকা দাড়ীগোঁফঢাকা মুখখানা কিয়ৎক্ষণ দেখিতে দেখিতে আমারও বহুপূর্ব্বের একখানা শ্মশ্রুগুম্ফ-বিরহিত মুখ মনে পড়িয়া গেল।

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'কতদিন তাহাদের গৃহের চাকরী পরিত্যাগ করিয়াছ ?'

"প্রায় পঁচিশ বৎসর।' 'কেন পরিত্যাগ করিলে ?"

"তাহার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য আমি এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। কার্ত্তিক প্রথমে একবার উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। আমি তাহার সে ভাব বুঝিতে পারিয়া উত্তর শুনিতে একটু জেদ করিলাম। বলিলাম—'বল না—কেন পরিত্যাগ করিলে।' কার্ত্তিক ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। বোধ হইল, যেন সে বলিবার চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারিতেছে না।

"তাই দেখিয়া, আমি বলিলাম—'তা হ'লে, বোধ হয়, তুমি কোনও অকার্য্য করিয়াছিলে ?'

"কার্ত্তিক একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—'করিয়াছিলাম,—খুড়ীমার একছড়া মুড়কিমাদুলী।'

"শুনিয়া কার্ত্তিকসম্বন্ধে সমস্তই বুঝিলাম। সে ত আমার শ্বশুরগৃহেই চাকরী করিত। আমারই মুড়কিমাদুলী সে চুরি করিয়াছিল।

"সে অপ্রিয় কথোপকথন হইতে নিরস্ত হইবার জন্য আমি তাহার কাছে অন্যপ্রসঙ্গের উত্থাপন করিলাম ; বলিলাম—'খুড়া মহাশয়ের কাছে শুনিলাম, তোমার সংসারে কেহ নাই।'

"কেহ নাই! অসদুপায়ের উপার্জ্জনে সংসার পাতিয়াছিলাম, সে সংসার টিঁকিবে কেন? এক পুরুষেই শেষ হইয়াছে। একটা ডাকাতীর আসামী হইয়া দায়মাল যাইতেছিলাম। হুজুরের শরণাপন্ন হইয়া রক্ষা পাইয়াছিলাম। সেই অবধি তাঁহারই আরদালি হইয়াছিলাম।'

"কিন্তু তোমার ত মা-বাপ-ভাই-ভগিনীতে পরিপূর্ণ জাজ্বল্যমান সংসার ছিল! সকলেই ত আর অধর্ম্মের অর্থ উপার্জ্জন করে নাই! আমি জানি—তোমার বাপ, মধু, একজন ধার্ম্মিক ছিল।

"এই কথা শুনিবামাত্র কার্ত্তিক বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিল—'তুমি কেমন করিয়া জানিলে?'

"আমি সে কথার উত্তর না দিয়া, আবার বলিলাম—'তোমার নাম-কার্ত্তিক ছিল না?'

"কার্ত্তিকের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল—'কে তুমি?'

"তোমার নাম ছিল—বনমালী, মনিবের বাড়ীর মেয়েছেলেরা তোমাকে 'বুনো' বলিয়া ডাকিত।

"কে তুমি?'

"আমি সেই তোমার খুড়িমা।

"সে তীব্রদৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিল। দেখিয়া-দেখিয়াও সে যেন দেখার মীমাংসা করিতে পারিল না।

"আমি বলিলাম—'আমার কথায় কি তোমার বিশ্বাস হইতেছে না ?'

"কেমন করিয়া হইবে ?'

"সে আমার শ্বশুরগৃহে রাখালির কাজ করিত। আমাদের ঐশ্বর্য্য সে দেখিয়াছে। সেই বাড়ীর বধূ আমি, উদরান্নের জন্য পরগৃহে দাসীবৃত্তি করিতেছি—ইহা সে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে ? আমার কথায় তাহার মাথা গুলাইয়া গিয়াছে। সে বিড়-বিড় করিয়া কি দু'চার কথা আপনার মনে বলিল—আমি বুঝিতে পারিলাম না। তার পর সে আমাকে বলিল—'হুগলীতে তবে কি, আমি তোমাকে দেখি নাই ?'

"আমার কাঠামোকে দেখিয়াছিলে।

"তোমাদের সে ঐশ্বর্য্য ?'

"তার-কথা আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়! কিছু থাকিলে কি আর পরের ঘরে দাসীবৃত্তি করিতে আসিতাম ?

"কার্ত্তিক শুনিল। এবারে হুঙ্কারের সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। তার পর বলিল—'অমন ধর্ম্মের সংসারও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! রাজার বউ, আজ দাসী হইয়াছে!'

"এই বলিয়াই কার্ত্তিক আমার পদপ্রান্তস্থ ভূমিতে মাথা সংলগ্ন করিল। আমি বলিলাম—'য'রা চলিয়া গিয়াছে, তা'রা ত পুণ্যবান্;—আমি পাপিষ্ঠা, তাহাদের শোকে অহোরাত্র জ্বলিবার জন্য বাঁচিয়া আছি!'

"কার্ত্তিক বোধ হয়, আমার এ উত্তর শুনিতে পাইল না। সে কিয়ৎক্ষণের জন্য অবনতমস্তকে আমার পায়ের কাছে বসিয়া রহিল। তার পর সহসা বালকের মত ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিব কি!—কোথা হইতে অতর্কিতে এক

বিপুল শোকাবেগ আসিয়া আমার হৃদয় ঘেরিয়া ফেলিল; দেখিতে দেখিতে আমারও চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল।

"এই সময়ে খুড়া মহাশয় ঠাকুরমার ঘরে তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া,কথা-বার্ত্তা কহিতেছিল। কার্ত্তিকের কান্নার শব্দ শুনিয়া খুড়া বাহিরে আসিল।

"তাহার ক্রন্দনের কারণ খুড়া বোধ হয় অন্যরূপ বুঝিয়াছিল। তাই সে ঈষৎরুক্ষস্বরে কর্ত্তিককে বলিল—'কি রে, গাড়োল! ইহাদিগকে চীৎকারে উত্ত্যক্ত করিতে কি এখানে তোমাকে সঙ্গে আনিলাম?'

"কার্ত্তিক বলিল—'না, খুড়াঠাকুর, আমি চীৎকার করি নাই।'

'তবে ও গাধার মধুর ডাক কার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল?'

'একশালা নেমকহারাম খুড়ীমার মাদুলী চুরি করিয়াছিল। আজ বহুকাল পরে, খুড়ামহাশয়!—যুগপরে—এখানে তাহাকে ধরিয়াছি, ধরিয়াই দুই হাত দিয়া, চোরটার গলা টিপিয়াছি। সেই টিপুনীর জোরে সে মরণ যাতনায় গোঁ গোঁ করিয়া উঠিয়াছে।' 'কোথায় সে?'

'কোথায় সে! শুনিলে—কার্ত্তিকের হাতের সে টিপ খাইয়াছে। এ শুনিয়াও সে কোথায়, তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ? তোমার কাছে হার মানিয়াছি বলিয়া কি আমি দুনিয়ার যার তা'র কাছে হার মানিব? এক টিপুনিতেই তা'র ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছি।'

"তাহার কথা বুঝিতে না পারিয়া, খুড়া কিছুক্ষণ যেন অপ্রতিভের মত দাঁড়াইল। কার্ত্তিকের কথা শুনিয়া আমারও শোকাবেগ আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হইয়া গেল। আমার মুখে হাসি আসিল।

"খুড়া আর কার্ত্তিককে কিছু না বলিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—'হাঁ দয়াময়ি! গাড়োলটা বলে কি?'

৯

"আমি তাহাকে কার্ত্তিকের কথায় কান দিতে নিষেধ করিলাম, এবং আমাদের পরস্পরের পূর্ব্বসম্বন্ধের যৎসামান্য আভাস দিলাম। কার্ত্তিক সেই আভাস অবলম্বন করিয়া খুড়াকে আমাদের পূর্ব্ব-ইতিহাস শুনাইতে বসিয়া গেল।

"খুড়া হুঁকা-হাতে শুনিতে বসিল। কার্ত্তিক তামাক সাজিতে সাজিতে গল্প আরম্ভ করিল। আমি আর সে পুরাকাহিনী শুনিয়া মনটাকে নিরর্থক অবসন্ন করা ভাল বোধ করিলাম না। আমি ঠাকুরমা'র কাছে চলিয়া গেলাম।

"ঠাকুরমার ঘরের সমীপে উপস্থিত হইতেই দাক্ষায়ণীর সঙ্গে তাঁহার কথোপকথন আমার কর্ণগোচর হইল। সে কথাবার্ত্তায় বাধা না দিয়া, তাহা শুনিবার জন্য দোরের পার্শ্বেই একটু কান পাতিয়া দাঁড়াইলাম।

"এটা ওটা দুইচারিটা কথার পর ঠাকুরমা বলিলেন—'নাতবৌ! তোমাকে লইয়া যাইবার লোক আসিয়াছে—কাল'ই তোমার খুড়শ্বশুরের সঙ্গে দেশে চলিয়া যাও।'

"দাক্ষায়ণী। 'আমি একা যাইব?'

"ঠাকুরমা। 'ভাল, দয়াময়ীকেও তোমার সঙ্গে দিব।'

"দাক্ষায়ণী। 'আর তুমি?'

"ঠাকুরমা। 'আমিও যতদূর পারি, তোমাদের সঙ্গে যাইব।'

"দাক্ষায়ণী। 'বাড়ী যাইবে না?'

"ঠাকুরমা। 'আমি আর বাড়ী কোন্‌মুখে যাইব?'

"দাক্ষায়ণী। 'কেন ঠাকুরমা, বাবা-মা ত তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছেন!'

"ঠাকুরমা। 'পাঠাইয়াছেন, তুমি যাও—আমার কুললক্ষ্মী, শ্বশুরের ঘর আলো কর।—আশীর্ব্বাদ করি, তুমি স্বামি-সোহাগিনী হও।'

"দাক্ষায়ণী। 'তুমি, তা হ'লে, কোথায় থাকিবে?'

"ঠাকুরমা। 'তোমাদের কালীঘাট পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে, আমি সেখান হইতে কাশী যাইব। তবে আমার মত পাপিষ্ঠাকে বিশ্বনাথ কি চরণে স্থান দিবেন? কালীঘাট পর্য্যন্ত যদি পঁহুছিতে পারি, তা হ'লে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করিব।'

"কথাটা শুনিয়াই আমি শিহরিয়া উঠিলাম! বুঝিলাম, যে শারীরিক দৌর্ব্বল্যে ঠাকুরমা আজ মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, সেরূপ দুর্ব্বলদেহে জীবন লইয়া কালীঘাট পর্য্যন্ত পঁহুছিতেও তাঁ'র সন্দেহ হইয়াছে! দাক্ষায়ণী, ঠাকুরমার এ কথার কি উত্তর করে, শুনিবার জন্য আমি আর একটু দাঁড়াইয়া রহিলাম। দাক্ষায়ণী নীরব হইয়াছে। বুদ্ধিমতী, ঠাকুরমার কথার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে।

"তখন রাত্রি অনেক হইয়াছিল। আমাদের পরিচর্য্যার জন্য যে ঝি নিযুক্ত হইয়াছিল, সে ঠাকুরমার শয্যাতলে বিছানা পাতিয়া ঘুমাইতে-ছিল। আমাদের রক্ষকস্বরূপ চাকরেরও নাসিকাধ্বনি ভিতরদিকের বারান্দা হইতে শোনা যাইতেছিল। কেবল আমরা কয়জনেই জাগিয়া আছি। অন্য দিন হইলে আমরাও এতক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িতাম। ঠাকুরমার শরীর অসুস্থ; খুড়া মহাশয়ের জন্য আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দাক্ষায়ণীও ক্লান্ত। আর অধিকক্ষণ রাত্রি জাগিলেই উভয়ের শারীরিক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া, তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় বাধা দিতে আমি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

"প্রবেশ করিয়াই মিছামিছি রাত্রিজাগরণের জন্য আমি উভয়কেই তিরস্কার করিলাম। দাক্ষায়ণীকে এক অপ্রিয় বিষয় লইয়া আর বেশীক্ষণ কথা কহিতে অবসর দিলাম না। খুড়া মহাশয়কে যখন অভাবনীয়রূপে এতদূর পাইয়াছি, তখন বুঝিয়াছি, আমাদের আতঙ্ক-আশঙ্কার একরূপ মীমাংসা হইয়াছে। পরদিন হউক অথবা তাহারও দুই-একদিন পরেই হউক, আমরা নন্দীগ্রাম পরিত্যাগ করিব।

"দাক্ষায়ণী, ঠাকুরমাকে আর কোন প্রশ্ন করিল না। সে আমার তিরস্কারে অপ্রতিভ হইয়াই যেন, নিজের শয্যায় শয়ন করিল। আমি, ঠাকুরমা'র পদসেবার অছিলায় তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিবার অবসর খুঁজিতে লাগিলাম।

"যখন নিশ্চিত বুঝিলাম, দাক্ষায়ণী ঘুমাইয়াছে, তখন যথাসম্ভব অনুচ্চস্বরে ঠাকুরমার সঙ্গে দুই একটা কথা কহিলাম। ঠাকুরমাকে মৃতবৎ ফেলিয়া আমি দাক্ষায়ণীর অনুসন্ধানে গিয়াছিলাম। তার পর, আর শুশ্রূষা করা দূরে থা'ক্, এযাবৎ তাঁ'র অসুখসম্বন্ধে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই।

"ঠাকুরমা আমার দিকে পিছন করিয়া, পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিলেন। যদি নিদ্রিত হ'ন, তা হ'লে আর তাঁহাকে জাগাইব না, এই মনে করিয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিলাম—'ঠাকুরমা!'

"ঠাকুরমা উত্তর দিলেন, 'কেন?'

"তোমার ঘুমের কি ব্যাঘাত করিলাম?

"ঠাকুরমা পার্শ্বপরিবর্তন করিয়া বলিলেন—'না—আমি ঘুমাই নাই। কিছু কি বলিতে চাও?'

'খুড়ামহাশয়ের সঙ্গে কি তোমার কোন কথা হইয়াছে ?'

'অন্য কোনও কথা হয় নাই। আমি তাহাকে, দেশের কে কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করিয়াছি মাত্র।'

'সে কথা আমিও জিজ্ঞাসা করিয়াছি ;—সকলেই ভাল আছে।'

'না—সকলে ভাল নাই।'

'সে কি ! খুড়া ত আমাকে বলিল, সকলে ভাল আছে।'

'তুমি কা'দের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ ?'

'কেন—তোমার পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রের !'

'আমি তাহাদের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। একবার হরিহরের কথা জিজ্ঞাসা করিব, মনে করিয়াছিলাম ; কিন্তু তা'র নাম মুখ হইতে বাহির হইল না।' 'বল কি ঠাকুরমা !'

'তা'র কল্যাণ—যে দিবানিশি কামনা করিতেছে, সেই করুক। আমি আর কল্যাণ-কামনার ছলে, মমতা জাগাইয়া, তার অকল্যাণ করিতে ইচ্ছা করি না।'

"কথা শুনিয়া, আমি স্তম্ভিতের মত বসিয়া রহিলাম ; আমার মুখ হইতে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

"ঠাকুরমা বলিতে লাগিলেন—'যার কল্যাণে আমার কল্যাণ, আমার গ্রামের কল্যাণ সেই সাধুই ভাল নাই—গোবিন্দ-ঠাকুরপো আমার শোকে শয্যাগত হইয়াছেন—ইহজন্মে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হইল না !'

'খুড়ামশাই যে আমাদের লইতে আসিয়াছে !'

'তোরা যা। দাক্ষায়ণীকে লইয়া তা'র বাপমায়ের কাছে ফিরাইয়া

দে। তাঁ'দের বলিস্, আমার যতদিন তাঁ'কে কাছে রাখিবার সামর্থ্য ছিল, রাখিয়াছি ; আর আমার সামর্থ্য নাই—আমি মরিতে বসিয়াছি !'

"বলিতে-বলিতে নীরব হইলেন। এ কথা শুনিয়া, তাঁহাকে যে কি বলিব, বুঝিতে না পারিয়া, আমিও কিছুক্ষণের জন্য নীরব রহিলাম। —তাঁহার মনের অবস্থা কতকটা যেন হৃদয়ঙ্গম করিলাম ; মন দুঃখে ভরিয়া গেল। নীরবে চোখের জল ফেলিতে-ফেলিতে মনে মনে বলিলাম—'মমতাময়ি ! এত অভিমান যে, একমাত্র পুত্রের নাম পর্য্যন্ত সে অভিমানগর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে !'

"মনের কথা যেন ঠাকুরমা শুনিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিলেন—'দেখ, দয়া ! শুধু মুখে কেন, পাষণ্ডপুত্রের নাম মনে-মনে উচ্চারণ করিতেও আমার ঘৃণা আসিয়াছে।'

"ঠাকুরমা আবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আবার বলিলেন—'ইহাতে তাহারই বা দোষ কি ? দোষ আমার !'—বলিতে-বলিতে তিনি একবার নিরস্ত হইলেন। বুঝিলাম, স্বামি-নিন্দা সাধ্বীর মুখ হইতে বাহির হইল না।

"আমি তাঁহার অসম্পূর্ণ কথা শেষ করিলাম।—'দোষ তোমার অদৃষ্টের।'

'ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপালন করিয়া বংশের এক-একটা ছেলে, এক-একটা সার্ব্বভৌম হইতে পারিত। যেমন করি নাই, তাহার ফল পাইয়াছি ! সত্যবস্তু কি, যে জানে না, সে আজ পরের অপরাধের বিচার করিতে বসিয়াছে ! হায় ! লোভে, অহঙ্কারে, হতভাগা কত নিরীহের যে

সর্ব্বনাশ করিবে—কত লোকের যে অভিসম্পাত আমার বংশের উপর পড়িবে—'

"শোকোচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া, আমি বলিলাম,—'ঠাকুরমা! রাত্রি অনেক হইয়াছে; একটু বিশ্রাম কর!'

"যথাসম্ভব কথায় জোর দিয়া, ঠাকুরমা বলিলেন—'বিশ্রাম? দয়া! আজ একেবারেই বিশ্রাম লইতেছিলাম!'

'আমি তা দেখিয়াছি।'

'দেখিয়াছিস্?'

'দেখিয়াছি। কিন্তু আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে, দেখিয়াও তোমার পরিচর্য্যা করিতে পারিলাম না।'

'কেন, দয়াময়ি?'

'ঠাকুরমা! তোমার মুখে জল দিতে আমার সাহস হয় নাই।'

'আঃ আমার পোঁড়াকপাল! তোর দেওয়া জল মুখে দিয়া মরিবার আশাতেই যে আমি ঘর হইতে বাহির হইয়াছি!'

"আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। ঠাকুরমা বলিতে লাগিলেন,—'আমি যে পুত্র হারাইয়া, কন্যা পাইয়াছি! এ জন্মে তোকে গর্ভে ধরি নাই বলিয়া, আমার গর্ভ দিবারাত্রি কাঁদিতেছে!'

"ঠাকুরমার কথার মাধুর্য্য আমি সহ্য করিতে পারিলাম না। আমি কাঁদিতে-কাঁদিতে দাঁড়াইয়া উঠিলাম।

"ঠাকুরমার কণ্ঠও বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তিনি আমাকে বিশ্রামের আদেশ দিয়া মুখ ফিরাইয়া শুইলেন। বুঝিলাম, গভীর শোকে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে। এ সময় তাঁকে অধিক কথা কহাইলে

নিরর্থক উৎপীড়িত করা হয়; বুঝিয়া—আমি আবার বাহিরে আসিলাম। দেখি, কার্ত্তিক-গণেশ দুইজনে তখনও পর্য্যন্ত মুখামুখী বসিয়া ধূমপান করিতেছে।

"আমাকে দেখিবামাত্র খুড়া বলিয়া উঠিল—'দয়াময়ি! মুড়কি-মাদুলী তোমার সোনারচাঁদ ভাসুরপো'র গলায় আটকাইয়া গিয়াছে। যদি বেচারাকে বাঁচাইতে চাও, তা হইলে কা'ল থেকে ওকে প্রসাদ দিতে আরম্ভ কর। তোমার পাতের প্রসাদ অবিরত গলাধঃকরণ না করিতে পারিলে, সে মুড়কি বেচারীর হজম হইবে না।'

'বেশ! সে যা কর্‌বার, কা'ল করা যাইবে। আজ উভয়েই বিশ্রাম কর।' 'তথাস্তু।'—

"এই বলিয়াই খুড়া, কার্ত্তিককে বলিল—'কি রে গাড়োল, দয়াময়ীমা'র প্রসাদ খাইবি?"

"কার্ত্তিক কলিকায় প্রাণভরা এক টান দিয়া, মুখ হইতে ধূমরাশি বাহির করিতে করিতে বলিল—'যত দিন বাঁচিব।'

"আমি তাহাদের পাগ্‌লামীর কথায় কান না দিয়া, খুড়াকে বলিলাম,—'তোমার জন্য ঘরের মধ্যে বিছানা প্রস্তুত করিয়াছি।'

"খুড়া বলিল—'আপ্যায়িত।' "তবে আর রাত্রি করিতেছ কেন?'

'রাত্রি আমি করি নাই—বিধাতা করিতেছেন।'

"তাহার উঠিবার ইচ্ছা নাই, বুঝিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য বিশ্রাম লইতে আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

'সবে মাত্র শুইয়াছি, অমনই খুড়া আবার গান ধরিল। সেই গানের শব্দ শুনিয়া দরোয়ান দেউড়ী হইতে 'কোন্ হ্যায়'—বলিয়া চীৎকার

করিয়া উঠিল। বুঝিলাম, এতক্ষণ পরে বাগানে লোক ঢুকিয়াছে বলিয়া দরোয়ানজীর হুঁস হইয়াছে।

"খুড়ামহাশয় উত্তর করিলেন—'হাম্ হ্যায়।'

"ইহার পরেই দরোয়ানজীর আগমনের নিদর্শন পাইলাম। প্রথম-প্রথম, দুই একটা অর্দ্ধবীরত্বসূচক কথা; তার পর বিড়্‌বিড়্—ফিস্‌ফিস্; সর্ব্বশেষে একেবারে চুপ্! সঙ্গে সঙ্গে এক তীব্রধূমের গন্ধ আমারও গৃহপর্য্যন্ত প্রবেশ করিল।

"আমি বুঝিলাম, খুড়ামহাশয়ের তামাকের তলব আছে!"

(৪৫)

"তখনও ভোর হইয়াছে কি না সন্দেহ—কোনও স্থান হইতে একটিও পাখী সাড়া দেয় নাই, খুড়া গম্ভীরস্বরে ডাকিয়া উঠিল—'দয়াময়ি!'

"আমি তাড়াতাড়ি মুখ-চোখে জল না দিয়াই বাহিরে আসিলাম। আমাকে দেখিয়াই খুড়া বলিয়া উঠিল—'জ্যেঠাইমাকে উঠিতে বল, বৌমাকে উঠিতে বল। নৌকা ঠিক করা হইয়াছে। এখনি রওনা হইতে হইবে।'—দেখি, কার্ত্তিক লাঠির ডগায় পুঁটুলি বাঁধিতেছে। খুড়ার কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া আমার যা যৎকিঞ্চিৎ ঘুমের ঘোর ছিল, তাহা দেশ ছাড়িয়া পলাইল। 'সে কি খুড়া, এখনি যাইব কি?'

'খাড়ীতে ভাঁটা পড়িতে সুরু হইয়াছে। দেরী করিলে 'গণ' বহিয়া যাইবে। জোয়ারের পূর্ব্বে বড় নদীতে পড়িতে পারিব না।'

'এখন কেমন করিয়া যাইব?'

'কেন, কি এমন নশো-পঞ্চাশ টাকার মালমসলা সঙ্গে আনিয়াছ?

'ইহাদের কাহাকেও ত বলা হইল না!'

'বলিবার প্রয়োজন?'

'চোরের মত কাহাকেও না বলিয়া চলিয়া যাওয়া কি ভাল হয় খুড়াম'শায়?'

'বেশ, কার্ত্তিকে! দরোয়ানকে বলিয়া আয়, আমরা চলিয়া যাইতেছি।'

"খুড়ার আদেশমাত্রেই কার্ত্তিক ছুটিল। আমি বুঝিলাম, খুড়ার এ গোঁ ফিরানো আমার সাধ্য নহে। তথাপি আর একবার বলিলাম—'কয়দিন পেটে অন্ন ঢুকে নাই। আজ এখানে আহারাদি কর। একান্তই যদি যাইতে হয়, ওবেলা যাইলেও ত চলিতে পারে!'

'চলিবে না। এখন না যাওয়া হইলে, আবার কা'ল এমনি সময়। রাত্রিকালে মেয়েদের নিয়ে এ বর্ষাকালে আমি বড় নদীতে পড়িতে ভরসা করি না। পথের একস্থানেই আহারের ঠিক করিয়া লইব। মাঝি বলিয়াছে, পথে গঞ্জ আছে।'

"খুড়ার সঙ্গে তর্ক করা নিষ্ফল বুঝিয়া আমি ঠাকুরমার শরণাপন্ন হইতে চলিলাম। অধিক দূর যাইতে হইল না। দেখি, তিনি উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়াছেন। তিনি বোধ হয়, আমাদের কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। বলিলেন—'কি বলিতেছ গণেশ?'

'জ্যেঠাইমা! এখনি আমাদের যাত্রা করিতে হইবে।'

'সেটা কি ভাল দেখায়! ইহারা আমাদের আনিয়াছে। নিরাশ্রয় জানিয়া আশ্রয় দিয়াছে। যত্ন করিয়াছে—'

'যত্ন ত খুব দেখিতেছি। শুনিলাম, তিন দিন তাঁহারা কেউ তোমাদের খোঁজ লয় নাই।'

"সে স্থান ত্যাগ করিতে খুড়া এত ব্যস্ত হইয়াছে কেন, এইবারে বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম, ইহাদের ব্যবহারে খুড়া ক্রুদ্ধ হইয়াছে। ঠাকুরমা বলিলেন—'এরূপটা হইল কেন, সেটাও ত জানা প্রয়োজন।'

খুড়া বলিল—'কিছু না। জ্যেঠাইমা! এখন যাত্রা না করিলে, একটা দিন মিছে নষ্ট হইবে।' ঠাকুরমা এবারে দৃঢ়স্বরে বলিলেন—'না গণেশ, যদি ইহাদের কাহারও কোন অসুখ হইয়া থাকে! গোপনভাবে চলিয়া গেলে তাহারা আমাদের কি মনে করিবে?'

"ঠিক এমনি সময়ে পাখীর ডাকে দাক্ষায়ণী জাগিল। অন্যদিকে কার্ত্তিক ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'পাঁড়েজি বলিল, দেউড়ি ছাড়িতে তাহার উপর হুকুম নাই। ছাড়িয়া একপা বাহিরে গেলে তাহার চাকরী যাইবে।'

"খুড়া এইবারে কার্ত্তিককে তামাক সাজিতে আদেশ করিল এবং আমাকে বলিল—'বেশ দয়াময়ি, আজ তুমি আমাদের কি খাওয়াইতে পার দেখিব।'

"আমরা যেখানে ছিলাম, তাহা রাজবাড়ী হইতে প্রায় আধপোয়া দূরে—গ্রামের একরূপ বাহিরে। প্রতিদিন প্রভাতে ব্রজমোহন আমাদের তত্ত্ব লইয়া যাইত। আমাদের ব্যবহারের জন্য কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন, সেই সঙ্গে জানিয়া লইত। বেলা দশটা না বাজিতেই রাজবাড়ী হইতে চাকর আমাদের দৈনিক ব্যবহারোপযোগী খাদ্য-দ্রব্যাদি দিয়া যাইত। দুর্ভাগ্যবশে সে দিন প্রভাতে ব্রজমোহন আসিল না। সে দিন ভূরিভোজী দু'টি জীব আমাদের ঘরে অতিথি হইয়াছে। খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে যাহা কিছু মজুদ ছিল, পূর্ব্বদিন রাত্রিতে গণেশ ও

কার্ত্তিক তাহার পূর্ণ-ব্যবহার করিয়াছে। তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। থাকিলে তাহারও কিরূপ ব্যবহার হইত, আমি জানিবার অবকাশ পাই নাই। আমার মনে হইয়াছিল, পূর্ব্ব-রাত্রিতে তাহাদের কাহারও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় নাই।

"যখন ব্রজমোহনের আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, অথচ রাজ-বাড়ী হইতে অন্য কেহও আমাদের তত্ত্ব লইতে আসিল না, তখন নবাগত অতিথি দুইটির জন্য আমার মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। প্রত্যহ যে পরিমাণে সিধা আসে, আমাদের পক্ষে তা প্রচুর হইলেও, আজ অন্ততঃ তাহার চতুর্গুণ না হইলে ত চলিবে না। এ দিকে পূর্ব্ব হইতে সংবাদ না দিলে, নিত্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাহা আসে, তাহাই আসিবে।

"রাজবাড়ীতে খবর পাঠাইতে আমি একবার স্বরূপের সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। স্বরূপ রাজবাড়ীতে যাইতে সাহস করিল না। বলিল— 'সেপাইরা আমাকে দেউড়ীতে ঢুকিতে দিবে না।' সে দেউড়ীতে ঢুকিতে পাইবে না, দরোয়ান ফটক ছাড়িয়া এক পাও বাহিরে যাইবে না। কি করি, তাহাদের আহারের ব্যবস্থা আমিই করিব ঠিক করিলাম। আমাদের যা কিছু পয়সা-কড়ি, সমস্তই আমার হাতে থাকিত। আমি তাহা হইতে দুইটা টাকা লইয়া কার্ত্তিককে চুপি চুপি ডাকিলাম এবং তাহার হাতে টাকা দিয়া বাজার করিয়া আনিতে বলিলাম। আমি খুড়াকে লুকাইয়া কাজ সারিবার চেষ্টায় ছিলাম। বোকা কার্ত্তিকের জন্য তাহা হইল না। সে জিজ্ঞাসা করিল—'বাজার কোথায়?'

"খুড়ামহাশয় তাহার বিছানার এক প্রান্তে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, কার্ত্তিকের কথা শুনিয়াই বলিয়া উঠিল—'সত্য সত্য তুমিই কি আমাদের

সেবার ভার লইবে দয়াময়ি ?' আমি বলিলাম—"বহুজন্মের ভাগ্যে তুমি তোমার কন্যাকে যখন করুণা করিতে চাহিলে, তখন রাজাদের তাহার ভাগ নিতে দিব কেন ?' খুড়া সোল্লাসে বলিল—'বেশ বেটি, আমরা আজ তোরই অতিথি।'

"এই বলিয়াই খুড়া প্রিয়-সম্ভাষণে কার্ত্তিককে আপ্যায়িত করিল—'বেটা ন্যাকা। ও গৃহস্থের মেয়ে, বাজার কোথায়, ও কেমন করিয়া জানিবে ? তুই নিজে খুঁজিয়া দেখ্।'

"আমি বলিলাম—'না কাত্তিক, বাজার কোথায়, আমি জানি না।'

'বাজার আছে কি না, তা জানো ?'

"খুড়া তামাক টানিতে টানিতেই বলিয়া উঠিল—'ঝাটা বাগ্দী এই বারে সেই হুগলীর চড় খাইল। বলি, গাঁয়ে বাজার যদি না থাকে,বড় জমীদারের গ্রাম—এখানে কি একটা গোলদারি দোকানও নাই ? সেখানে চাল, ডাল, ঘি, মসলা এ সকলও ত মিলিবে ? কি বলিস্ দয়া ?'

"আমি বলিলাম—'তা অবশ্যই আছে।'

'বস্. তবে আর কি ! তুই দোকান হইতে এই সকল লইয়া আয়। আমি মাছের সন্ধানে যাইতেছি। মাছ পাই ভাল, না পাই, চালে-ডালে-ঘিয়ে আমরা কাজ সারিয়া লইব।'

"ঘরে যে ঝি আছে, সেটা আমার মনেই ছিল না। আমি ডাকিলাম—'ঝি।' সে রান্নাঘর পরিষ্কার করিতেছিল। ডাকিতেই কাছে আসিল। গ্রামে বাজার আছে কি না, তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

"সে বলিল—'বাজার নাই, শনি-মঙ্গলবারে হাট বসে।'

'আজ ত মঙ্গলবার ?'

'এতক্ষণ বোধ হয় হাট বসিয়াছে।'

"হাট বসার কথা শুনিয়াই খুড়া হুঁকা রাখিল এবং ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'দুধ-দই মেলে?' ঝি যেন একটু গর্ব্বের সঙ্গে উত্তর করিল—'এ অঞ্চলে এমন হাট আর বিশ ক্রোশের ভিতর নাই। দুধ-দই মিলিবে না? কত চাও ঠাকুর?'

"খুড়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—'মাছ?'

"ঝি বলিল—'যত চাও। যত রকমের চাও। তবে বড় মাছ আসিলে, রাজা-মশা'য়রা আগে না লইলে কাহারও লইবার যো নাই। তাহারা লইয়া যাইবার পর যাহা পড়িয়া থাকিবে, তাহা অপরে লইতে পারিবে।'

"খুড়া এইবারে উঠিল। ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিল এবং কার্ত্তিকের হাতের টাকা দেখিল। দেখিয়াই আমাকে বলিল, 'এত টাকা কেন ময়ামরি?'

"তখনকার দুই টাকা—এখনকার নয়। তখন তার কিনিবার শক্তি এখনকার দশ টাকা হইতেও বেশী। বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে সে সময় দুই টাকায় সারা হাটটাই কিনিয়া আনা চলিত। সুতরাং তুচ্ছ দুটি টাকাকে 'এত' বলিয়া খুড়া অন্যায় করে নাই। 'এত' কথা শুনিয়াই আমি হাত-যোড় করিয়া বলিলাম—'তোমার প্রসাদ পাইলে অনেকের জন্ম সার্থক হইবে। যদি পেটের কোনও একটু জায়গা খালি থাকে, তা হ'লে বুঝিব, তুমি যে কন্যাকে স্নেহ দেখাইতেছ, সেটা কেবল মুখের।'

"খুড়া আমার কথার উত্তর দিল না। কার্ত্তিকের বাহুমূল ধরিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে বলিল—'অন্ধকারে আসিয়াছি, দেশটা কিরূপ, দেখা হয় নাই। চল্, নন্দীগ্রাম বস্তুটা কি, একবার দেখিয়া আসি।'

"কার্ত্তিক বলিল—'তবে দাঁড়াও হুজুর, লাঠিগাছটা লই।' খুড়া তাহা লইতে দিল না। বলিল—'তুই কালভৈরব। নন্দীর গ্রামে তোর আবার ভয় কি?"

"সিঁড়ি বাহিয়া দুইজনে নীচে না নামিতে নামিতে, পিছন হইতে দাক্ষায়ণী আমাকে ডাকিয়া উঠিল। আমি মুখ ফিরাইবামাত্র বলিল—'কার্ত্তিককে ডাকিয়া লাঠিটে দাও না কেন!' আমি সবিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিলাম। দাক্ষায়ণী বলিল—'খুড়াম'শায় যদি সবার বড় মাছটাই লইয়া আসেন?'

"আমি যে আরও খানিকটা সময় দাঁড়াইয়া তার মুখ দেখিব, সে অবকাশ পাইলাম না। কার্ত্তিককে ফিরাইতে তাড়াতাড়ি নীচে নামিলাম। দেখি, কার্ত্তিক আপনিই ফিরিতেছে। সে কাছে আসিতে আসিতে বলিল, 'খুড়াম'শাইয়ের যেমন কাণ্ড, আমাকে টানিয়া আনিল। কিন্তু কিসে যে তরি-তরকারি আনিব, তার হুঁস নাই। খুড়ীমা! ঘরে বড় রকমের ডালাটালা আছে?' আমি বলিলাম—'আছে, দিতেছি। ডালা লও, আর সেই সঙ্গে লাঠিগাছটাও লইয়া যাও। হাঁ কার্ত্তিক! তুমি কি ভাল লাঠিখেলা জানো? তোমার বাপ খুব লাঠী খেলিতে জানিত।'

"আমার কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই পিছন হইতে দাক্ষায়ণী তার হাতে লাঠী দিল। বালিকাকে দেখিবামাত্র কার্ত্তিক প্রথমে যেন কাঁপিয়া উঠিল। পরক্ষণেই নীরবে দাক্ষায়ণীর দুটি পায়ের উপর লাঠিগাছটি রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তার পর উঠিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিলে খুড়ীমা?'

'খুড়াকে ত ওই পাগল-মানুষ দেখিতেছ ?'

'যদি বড় মাছটা তুলিয়া লয় ? খুড়ীমা ! আজ পৃথিবীর পালোয়ান একদিকে হইলেও তোমার ছেলের জয় কাড়িয়া লইতে পারিবে না।'

"আমি তাহার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। আমি জানিতাম, ডাকাতি যাহাদের ব্যবসায়, তাহাদের পক্ষে এমন শুভ সঙ্কেত আর নাই। ডাকাতি করিতে যাইবার পূর্ব্বে দস্যুরা কালীপূজা করিয়া থাকে। সেই সময় যদি কোনও কুমারী নিজের ইচ্ছায় কাহারও হাতে অস্ত্র আনিয়া দেয়, সে বিশ্বাস করে, স্বয়ং দেবী তাহাকে অস্ত্র উপহার দিয়াছেন। যুদ্ধে জয়ী হইতে সে দিন তাহার আর সন্দেহ থাকে না।

"তথাপি তাহাকে খুড়া সম্বন্ধে যথাশক্তি সাবধান হইতে উপদেশ দিয়া আমি ডালা আনিয়া দিলাম।

"যা ভয় করিয়াছিলাম, তাই হইল। রাজবাড়ী হইতে নিত্য যেমন আমাদের সিধা আসে, ভৃত্য আজও সেইরূপ লইয়া আসিল। আমি তাহার কাছে নন্দরাণীর সংবাদ লইলাম। সে বলিল, রাণী তাঁহার পুত্র কন্যাকে সঙ্গে লইয়া কয়দিন কোথায় গিয়াছেন। আজিও আসেন নাই। ব্রজমোহন শুধু বাড়ীতে আছে। সে আজ আসিল না কেন, ভৃত্য বলিতে পারিল না।

"এইবারে সত্য সত্যই নন্দরাণীর উপর আমার রাগ হইল। তাহার আচরণের মর্ম্ম ত আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যদি প্রয়োজন বুঝিয়া কোন স্থানে তাহাকে যাইতেই হইয়াছে, আমাকে বলিতে তাহার দোষ কি ছিল ? আমার নিজের সম্বন্ধে হইলে আমি ততটা মনে করিতাম না; কিন্তু আমার কথা ও আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আর দুইটি অবলা

আমার সঙ্গে আসিয়াছে। তাহাদের প্রতি নন্দরাণীর এ কি আচরণ! এইরূপ অবজ্ঞা দেখাইবে বলিয়া কি সে আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া নন্দীগ্রামে লইয়া আসিল!

"ভৃত্য মাথা হইতে ডালা নামাইতেছিল। আমি বলিলাম—'আজ আমাদের আর সিধার প্রয়োজন নাই। তুমি উহা ফিরাইয়া লইয়া যাও।'

"আমার কথায় সে একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। বলিল—'তোমরা কি তা হ'লে আজ কিছুই খাইবে না?'

'খাইব না কেন—তোদের মনিবদের জিনিস খাইব না। হাটে জিনিষ আনিতে আমাদের লোক গিয়াছে।'

"সে লোকটা তবু দাঁড়াইয়া রহিল। আমার কথা যেন বুঝিতে পারিল না। আমি বলিলাম—'আমাদের লইয়া যাইতে দেশ হইতে লোক আসিয়াছে। আমরা আজই এখান হইতে যাইতেছি।'

'এ আমি এখন কোথায় লইয়া যাইব? ভাঁড়ারী চলিয়া গিয়াছে।'

'চুলোয় ফেলিয়া দি গে যা।'

"সে হতভম্বের মত খানিকটা দাঁড়াইয়া, না যাওয়ার মত করিয়া বড় অনিচ্ছায় যেন চলিয়া গেল। সে চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই দরোয়ান আসিয়া আমাকে বলিল—'হাঁ মায়ীজী, যে দু'জন লোক আসিয়াছে, উহারা তোমাদের কে?'

"আমি ঈষৎ টিট্কারির সহিত তাহাকে বলিলাম—'কা'ল থেকে এক কলিকায় সকলে গাঁজায় দম দিতেছ, পরিচয় লইবার বুঝি ফাঁক পাও নাই?'

'বুঝেছি, ওরা তোমাদের আপনার লোক।'

'এ অদ্ভুত আবিষ্কার কেমন করিয়া করিলে?'

'সিধা ফিরাইয়া দিলে, তোমাদের ভোজন কি হইবে?'

'সে ভাবনা তোমাকে ভাবিতে হইবে না। তুমি যেমন দেউড়ী আগু-লিয়া বসিয়া আছ, সেইরূপ থাক।'

"আর বেশি কথা কহিতে হইল না। হঠাৎ দূরে একটা কোলাহল উঠিল। শুনিয়াই আমি শিহরিয়া উঠিলাম। দরোয়ানও কোলাহল শুনিয়া বেগে দেউড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

"কোলাহল উত্তরোত্তর বাড়িয়া আমাদের বাগান-বাড়ীর দিকেই যেন চলিয়া আসিতে লাগিল। শব্দ ঠাকুরমারও কানে পৌঁছিয়াছে। তিনি বাহিরে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এত গোলমাল কিসের জন্য দয়া?'

'এখান হইতে কেমন করিয়া বুঝিব? তবে ঠাকুরমা, আজ আমাদের ভোরে রওনা হওয়াই উচিত ছিল।'

'তখন বলিলি না কেন?'

'আমার গ্রহ। যাই হ'ক, তুমি ঘরেই যাও, আমি একটু আগে যাইয়া দেখি।'

'গণেশকে লইয়া গেল না কি?'

'তাই বা কেমন করিয়া বলিব। খুড়া ও কার্ত্তিক হাটে গিয়াছে।

"ঠাকুরমা'র যাইতে ইচ্ছা ছিল না। আমি জোর করিয়া তাঁহাকে ঘরে পাঠাইলাম এবং কি করিব, স্থির করিতে না পারিয়া দাক্ষায়ণীর কাছে ফিরিলাম। দেখিলাম, সে উনানের কাছটিতে 'আসনপিঁড়ি' হইয়া বসিয়া আছে। বসিয়া কার্ত্তিক ও খুড়ামহাশয়ের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা

করিতেছে। আমাকে দেখিয়াই সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল—'দিদি! খুড়া মহাশয় যদি মাছ আনেন, কেমন করিয়া কুটিবে? আঁশবঁটি ত ঘরে নাই।' আমি বলিলাম—'ঘোড়া হইলে চাবুকের জন্য আটকাইবে না। আগে নিরামিষ কুটিয়া আমাদের বঁটিই আঁশ করিয়া লইব। কা'ল একাদশী—পরশু আমরা হয় ত এতক্ষণে তোমার শ্বশুরের ঘরে উপস্থিত হইয়াছি।'

'আজই কি এখান হইতে চলিয়া যাইবে?'

'তাতে আর সন্দেহ আছে? আজ ভোরেই আমাদের চলিয়া যাওয়া উচিত ছিল।'

'রাণীকে না জানাইয়া যাইবে?'

'কোথায় রাণী? সে চুলায় গিয়াছে। সে কবে ফিরিবে, আর ফিরিবে কি না ফিরিবে, তার ঠিক কি? কয়দিন আমরা তার জন্য অপেক্ষা করিব?'

'কিন্তু রাণী ত আমাদের ভালবাসিয়াছে।'

'তার ভালবাসার কাঁথায় আগুন। আমরা বিদেশী অসহায় তিনটি স্ত্রীলোক। আমাদিগকে একটা বনের মধ্যে ফেলিয়া, চারদিনের মধ্যে আর সে দেখা করিল না। দেখা চুলায় যাক্, একটা মেয়েলোক পাঠাইয়া, আমরা কেমন আছি, আছি কি না আছি, খোঁজ পর্য্যন্ত লইল না।'

'কখন্ যাইবে?'

'সেটা খুড়া আসিলেই ঠিক হইবে। খুড়া যদি আসিয়া বলে, এখনি উঠিতে হইবে, আমরা এখনি উঠিব।'

"এমন সময় খুড়াম'শায় ভিতর-বারান্দার দিক্ হইতে ডাকিল—'দয়াময়ি'! চকিতের মত অমনি ঘর হইতে বাহির হইলাম। খুড়াকে না

দেখিয়াই উদ্দেশে তাহাকে শুনাইয়া বলিলাম—'এই তোমার নাম করিতে-ছিলাম। তুমি অনেক কাল বাঁচিবে।' কিন্তু খুড়াকে দেখিয়াই—এ কি! খুড়া একটা প্রায় আধমণ রুইমাছ হাতে ঝুলাইয়া আনিয়াছে। সন্দেহা-কুলিতচিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'এত বড় মাছ কোথা পাইলে?' —'হাট হইতে কিনিয়া আনিলাম।' 'দাম?' 'আমার মাথার ঘি।' বুঝিলাম, খুড়া হাঙ্গামা বাধাইয়াছে। 'তবে কি সবার বড় মাছটা উঠাইয়া আনিয়াছ?'

'সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়।'

"উত্তর দিব কি, আমি শুধু তার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। খুড়া বলিল—'মুখের পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিলে চলিবে না। শীঘ্রই এটাকে বনাইবার ব্যবস্থা কর। মাছ রাঁধিয়া আমি কার্ত্তিককে মুড়া খাওয়াইব। সে বেটা আজ আমাকে বড়ই সন্তুষ্ট করিয়াছে।'

"তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে বাহির-বারান্দার দিক্ হইতে কার্ত্তিক বলিয়া উঠিল—"খুড়ীমা! খুড়াম'শায় আসিয়াছে?" আমাকে আর উত্তর দিতে হইল না। খুড়া ডাকিল—'কার্ত্তিকে!' ডাকের সঙ্গে সঙ্গে কার্ত্তিক নানাবিধ দ্রব্যপূর্ণ ডালা-মাথায় আমাদের কাছে উপস্থিত হইল। দ্রব্যাদি ও লাঠী ভূমিতে রাখিল এবং হাসিতে হাসিতে বলিল,—'হুজুর! আসিয়াছ?'

"খুড়া বলিল—'কেন রে ব্যাটা, পাঁচটা মেনীমুখো পা'কের সঙ্গে যুঝিতে গিয়া তোর চোক কপালে উঠিয়া গেছে না কি?—'আসিয়াছি কি না, দেখিতে পাইতেছ না?'

'ছুটিয়া আসিতে হয় নাই ত?'

'এক পাও নয়। বাবুর মতই আসিয়াছি।'

"তখন এ সকল্ কথার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া, আমি খুড়ার হাত হইতে মাছ লইলাম। লইলাম কেন, খুড়ার হাত হইতে মেজের ফেলিয়া দিলাম। কার্ত্তিক বলিল—'খুড়ীমা! খুড়াম'শায়ের পায়ে জল দাও, আর শীঘ্র তেল দাও, উনি স্নান করিয়া আসুন।—নাও খুড়াম'শায়, কথা রাখিয়া ব'স।' এই বলিয়া বারান্দার কোণে একখানা আসন ছিল, সেখানা আনিয়া খুড়ার কাছে পাতিয়া দিল।

"খুড়াকে কার্ত্তিক যে প্রতি কথায় 'হুজুর' বলিয়া সম্বোধন করে এবং খুড়া যে কেন তা সহ্য করে, আগে সেটা ভাল বুঝিতে পারি নাই। সেই সময় বুঝিলাম। "দুই দুইবার 'খুড়াম'শায়' শুনিয়া খুড়া বলিল—'কি বল্লি বেটা; খুড়াম'শায়?'

'আজ্ঞা, ভুল হইয়াছে হুজুর।'

'একটা দিনের জন্যও তুমি আমাকে বাবু হইতে দিবে না? এখানেও তুমি আমাকে গণেশের মার গণেশ করিতে চাও '

'হুজুর! আমার ঘাট হইয়া

'যা, তামাক সাজ। কেউ কি আর লাঠী-শোঁটা নিয়ে আস্‌বে মনে করেছিস্?'

'যে বেটা তোমার মাথার ঘি বাহির করিবে বলিয়াছিল, তাহাকে একটুকু বুঝাইয়া দিয়াছি। তাহার মাথায় একবিন্দু বুদ্ধি থাকিলেও সে আসিবে না। তবে অন্যে আসিতে পারে। বিশেষতঃ রাজবাড়ীর সরকার—তার হাত হইতে তুমি হাটের মধ্যে মাছ কাড়িয়া লইয়াছ। সে অপমান শুধু

তার নয়, রাজাদেরও তাতে অপমান হইয়াছে। তারা কি চুপ করিয়া থাকিবে ?'

"আমি বলিলাম—'তাই ত খুড়াম'শায়, একটা গণ্ডগোল বাধাইলে !'

"ঈষৎ কোমল-কণ্ঠে খুড়া বলিল—'গণ্ডগোল বাধাইবার ত চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু বাধে কই ? কার্ত্তিক ! সহজে আমার ক্রোধ হয় না। হুগলীতে যখন আমি তোকে প্রহার করি, তখন তোর উপর আমার এতটুকুও ক্রোধ হয় নাই। অনর্থক একটা কটু কথা কহিল বলিয়া শিক্ষা দিবার জন্য সরকারকে একটি চড় দিয়াছি—রাগে দিই নাই। কিন্তু এইবারে আমার ক্রোধ হইতেছে। অতি দূরদেশ হইতে তিন-তিনটি অসহায়া অবলাকে নিজেদের আয়ত্তে আনিয়া এ হতভাগারা তাহাদের প্রতি এ কি হীনের মত আচরণ করিতেছে !'

"খুড়ামহাশয় আরও দুই একটা কি বলিতে যাইতেছিল। কার্ত্তিক করযোড়ে তাহাকে শান্ত হইতে অনুরোধ করিল। আমিও অনুরোধ করিলাম। বলিলাম—'যে আমাদের আনিয়াছে, সে স্ত্রীলোক। আনিয়া সে আমাদের যথেষ্ট যত্ন করিয়াছে। তাহার এখনকার এরূপ আচরণের কারণ যখন বুঝিতে পারিতেছি না, তখন হে নারায়ণ ! তাহার উপর ক্রোধ করিবেন না।'

"খুড়া উচ্চহাস্যে বলিয়া উঠিল—'এ গণ্ডমূর্খ দরিদ্র ব্রাহ্মণের ক্রোধে কার কি ক্ষতি হইবে দয়া ? ঠিক এমনি সময়ে দাক্ষায়নী ঘরের ভিতর হইতে আমাকে বলিল—'দিদি, খুড়ামহাশয়কে বল, উনি ক্রোধ করিলে ইহাদের বড় ক্ষতি হইবে।' কথা আর আমাকে শোনাইতে হইল না। খুড়া নিজেই শুনিল। শুনিয়া হো হো করিয়া

হাসিয়া বলিল—'হাঁ মা জগদম্বা, আমি এমন?' দাক্ষায়ণী জলপূর্ণ একটি ঘটি হাতে ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া খুড়ার কাছে আসিল এবং নিজহস্তে তাহার ধূলামাখা চরণ ধুইয়া দিল। খুড়া প্রথমে যেন একটু কিন্তু দেখাইল। বলিল—'কর কি মা, এত লোক থাকিতে তুমি কেন?' দাক্ষায়ণী কথা শুনিল না। পা ধোয়াইয়া, নিজের আঁচল দিয়া মুছিয়া, একটি গড় করিয়া চলিয়া গেল।

"খুড়া বলিল—'কার্ত্তিক! এইখান থেকেই আমার হুজুরীর শেষ হইল। গণেশের মা'র গণেশের ক্রোধের মুখে এইবারে আগুন লাগাইয়া দে।'

"কার্ত্তিক খুড়াকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তামাক সাজিতে চলিয়া গেল।

(৪৭)

"খুড়ার গোঁ কে ফিরাইবে? সে সেই আধমোণ মাছই রাঁধিতে বসিয়া গেল। আমি একবার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম —'আরও ত পাঁচটা সামগ্রী আছে, অত মাছ রাঁধিয়া কি হইবে?' খুড়া শুনিল না; বলিল—'অন্নপূর্ণার ঘর, কখন কোথা হইতে কে অভুক্ত আসে তার ঠিক কি? কেহ না আসে, রাজবাটীতে প্রসাদ পাঠাইয়া দিব। সুতরাং আমাকে আবার তদুপযুক্ত তৈলাদিরও ব্যবস্থা করিতে হইল।

"মাছের চারি পাঁচ রকম তরকারি খুড়া নিজেই রাঁধিল। ঠাকুরমা আমার নিষেধ সত্ত্বেও সমস্ত নিরামিষ ব্যঞ্জন নিজে রাঁধিলেন। দাক্ষায়ণী

উভয়েরই পরিচর্য্যা করিল। যখন সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে, তখন বেলা প্রায় দুইটা। আমিও ইহাদের রন্ধনের যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছিলাম, আর প্রতি মুহূর্ত্তে রাজবাড়ী হইতে দরোয়ান আসার ভয় করিতেছিলাম। আর কেবল ভগবান্‌কে ডাকিতেছিলাম—'হে ঠাকুর, যেন খুড়ার খাওয়াটা পণ্ড না হয়।'

"দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল, কেহ আসিল না। এখন অনেকটা ভয় ঘুচিয়াছে। কাকা মহাশয় রন্ধনান্তে তাহার আহ্নিকের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, সেইটুকু সারিতে বসিয়াছে। আমি তাহার আহারের স্থান-পরিষ্কারে নিযুক্ত হইয়াছি। এমন সময় ফটকের দিকে লোককোলাহলের মত শব্দ শ্রুত হইল। শুনিবামাত্র শরীর শিহরিল। আমি বুঝিলাম, এতক্ষণ পরে দলবদ্ধ হইয়া রাজবাড়ী হইতে গুণ্ডারা খুড়ামহাশয়কে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। আমি কার্ত্তিককে ভিতর হইতে ডাকিলাম—উত্তর পাইলাম না। মনে করিলাম, স্নানান্তে সে বিশ্রাম করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তখন ছুটিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম, বারান্দায় কার্ত্তিক নাই। সেই স্থান হইতে কান পাতিয়া শুনিলাম। কোলাহল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল। মনে হইল, জনসঙ্ঘ যেন উন্মত্তের মত উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বারান্দার নীচে নামিয়া ব্যাপারটা দেখিতে আমার সাহস হইল না।

"আমি ছুটিয়া খুড়ামহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, ভগবানের ধ্যানে ব্রাহ্মণের চক্ষু-দুটি মুদ্রিত। আমি ধ্যানভঙ্গের অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। ডাকিলাম—'খুড়ামহাশয়, খুড়ামহাশয়, খুড়া-মহাশয়!'

"তৃতীয়বারের সম্বোধনে খুড়ার চক্ষু-পলক উন্মুক্ত হইল। কিন্তু তাহার চোখের ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, এখনও তাহার মন সম্পূর্ণ বহির্মুখ হয় নাই। আমি আবার তাহাকে ডাকিলাম। খুড়ার উত্তর পাইতে না পাইতে কার্ত্তিক বাহির হইতে বলিয়া উঠিল—'খুড়ীমা, প্রভুকে শীঘ্র একবার বাহিরে পাঠাইয়া দাও।'

"তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে কোলাহল-তরঙ্গ প্রবলবেগে বারান্দার সিঁড়িতে আসিয়া যেন একটা আছাড় খাইয়া নীরব হইল। বুঝিলাম, বহুলোক-বাহিত একখানি পাল্কী আমাদের বারান্দার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।

"খুড়া গৃহ হইতে সত্বর বাহির হইয়া ব্যাপার কি দেখিতে চলিল। আমি তাহার অনুগমন করিলাম।

"বারান্দায় আসিয়া দেখি, যথার্থই একটি অপূর্ব্বসুন্দর পাল্কী। বাস্তবিক এমন সুন্দর ও বড় পাল্কী আমি ইহার পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। কিন্তু ভিতরে? হরিহর! পাল্কীর ভিতরে সে দিন যে এক অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, তাহা সে দিনের পূর্ব্বে কিংবা পরে আর কখনও দেখি নাই। এক অতি-বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পাল্কীর ভিতরে অর্দ্ধশায়িতভাবে অবস্থান করিতেছিলেন।

"আটজন বেহারায় পাল্কী বহিয়া আনিয়াছে। তাহারা পাল্কী ভূমিতে রাখিয়া সেটাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। পাল্কীর দ্বারে প্রকাণ্ড লাঠি-হাতে অতিদীর্ঘদেহ এক মুসলমান সর্দ্দার। তাহার কথা তোমাকে আর বলিতে হইবে না। তোমাকে লুঠিয়া আনিতে সেই সর্দ্দারই তোমাদের গ্রামে গিয়াছিল।

"অন্যের সাহায্য বিনা বৃদ্ধ পাল্কী হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার বুটের ডালের মত বর্ণ। কেশ, ভ্রূ, গুম্ফ বক্ষের রোমরাজি সমস্ত কুন্দফুলের মত শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে। বৃদ্ধ বাহিরে আসিয়াই একগাছি লাঠিতে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। উচ্চতায় তাঁহার মাথা মুসলমান সর্দ্দারের সমান হইল। দেহে তাঁহার সামান্যমাত্রও বক্রতা আসে নাই। কিন্তু তাঁহার বয়স? পরে শুনিয়াছিলাম, একশো পূরিতে আর পাঁচটি বৎসর মাত্র বাকি।

"তাঁহার বিষয়ে অধিক আর কি বলিব! অপূর্ব্বরূপের সেই বৃদ্ধকে দেখিয়াই আমাদের দুইজনেরই হৃদয় ভক্তিতে পূরিয়া গেল।

"সমস্ত লোক চারিধারে দাঁড়াইয়া। সকলেই নিস্তব্ধ। বাগানের দরোয়ান পর্য্যন্ত দেউড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছে। সে একটু দূরে চোরটির মত দাঁড়াইয়া আছে।

"বাহিরে দাঁড়াইতেই খুড়া সিঁড়ি হইতে নামিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। দেখাদেখি আমিও তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

"খুড়াকে যোড়হস্তে প্রতিপ্রণাম করিয়াই বৃদ্ধ অর্দ্ধবিকম্পিত-স্বরে বলিলেন, 'বীর! তুমিই আমার হাত ধরিয়া আমাকে উপরে উঠাইয়া লও। লোকনাথ চাটুজ্জের সারাজীবনের বিজয়ফল তুমি তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার বাড়ীর দ্বারে আসিয়া কাড়িয়া লইয়াছ। এ হাত তোমার হাতেই আমি ভর করিলাম।'

"খুড়া অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে মাঝের দালানে উঠাইয়া আনিলেন। আমি সত্বর একখানা আসন আনিয়া তাঁহার বসিবার ব্যবস্থা করিলাম।

"বৃদ্ধ বলিলেন,—'মাকে না দেখিয়া আমি বসিব না।'

"তাঁহার কথা শেষ না হইতেই দেখি, অবগুণ্ঠনবতী পৌত্রবধূর হাত ধরিয়া, অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনে মুখ আবরিয়া ঠাকুরমা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া প্রণতা হইলেন। দাক্ষায়ণীও ঠাকুরমার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরকে প্রণাম করিল।

"ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'মা! রাণী এখানে ছিল না। আমি কাশী পলাইতেছিলাম। তাহাকে লুকাইয়া পলাইতেছিলাম। খবর পাইয়া পুত্রকন্যা সঙ্গে লইয়া রাণী আমাকে দেখিতে ছুটিয়াছিল। কাহাকেও খবর দিবার সময় পায় নাই। তোমাদের কথা শুনিয়া আমি ফিরিয়া আসিয়াছি। আমার আর কাশী যাওয়া হইল না। ব্রজমোহনও আজ এখানে নাই। এমন সময় কতকগুলা হতভাগা গণ্ডমূর্খের বুদ্ধির দোষে একটা মহা অনর্থ ঘটিয়া গিয়াছে। রাণী আসিয়াই আপনাদের মর্য্যাদা-হানির কথা শুনিবামাত্র মৃতপ্রায় হইয়াছেন। তথাপি তাঁহার অপরাধ হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধী আমি। আমি বর্ত্তমানে অতিথি-সেবাপরায়ণ রাজাবাবুর ঘরে দেবতা-অতিথির অপমান হইয়াছে। মা! এই হতভাগ্য বৃদ্ধ সন্তানকে ক্ষমা কর।'

"ঠাকুরমা প্রথমে কোন উত্তর করিলেন না, উত্তর করিতে পারিলেন না। তাঁহার অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে দুইচারি বিন্দু অশ্রু ভূমিতে পতিত হইল। একটু প্রকৃতিস্থা হইয়া তিনি বলিলেন—'বাবা! আগে বসুন।'

"খুড়া বলিল—'ক্ষমা বুঝি না। আজ দ্বিপ্রহরে নারায়ণ অতিথি পাইয়াছি। বৈদিকের গৃহের এই দেবীর হাতের প্রস্তুত অন্নগ্রহণে যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আতিথ্য-গ্রহণে আমাদের কৃতার্থ করুন।'

"কেন খাইব না ভাই? বৈদিক আমার গুরু।'

"বিচিত্র সমাবেশ! ব্রাহ্মণ দাক্ষায়ণীর পিতার নাম করিলেন। বলিলেন—'দেশপ্রসিদ্ধ মহাত্মা শিবরাম সার্ব্বভৌম আমার গুরু-পুত্র।'

"খুড়া সোল্লাসে দাক্ষায়ণীকে দেখাইয়া বলিল,—'এই যে সম্মুখে তাঁহারই কন্যা!'

"সেই অতিবৃদ্ধ অমনি ভক্তি-গদ্‌গদ-কণ্ঠে 'মা, মা' বলিতে বলিতে দাক্ষায়ণীর চরণপ্রান্তে প্রণত হইলেন।

(৪৮)

আমি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা কহিতেছি। তখন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বয়স প্রায় শত বৎসর। সুতরাং কোম্পানীর রাজত্বের প্রারম্ভকালেই বৃদ্ধের জন্ম হইয়াছিল। এই শত বৎসরে বাঙ্গালার উপর দিয়া একটা যেন পৌরাণিক যুগের প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে। ইহার একটা দশক ও তৎপরবর্ত্তী দশকের মধ্যে যেন সত্য-ত্রেতার ব্যবধান! ইহার মধ্যে কত যে বাস্তব ঘটনা বিহঙ্গমা-বিহঙ্গমীর গল্পে পরিণত হইয়াছে, তাহা আমি কেন, বিচক্ষণ প্রত্ন-তত্ত্ববিদেও নির্ণয় করিতে অসমর্থ।

বৃদ্ধ সেই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের যুগে জন্মিয়াছিলেন। এরূপ বৃদ্ধের জীবন-কাহিনী শুনিতে লোকের মনে স্বতঃই কৌতূহল জাগিয়া উঠে; আমারও জাগিয়াছিল। আমি দয়াদিদির কাছে সে কাহিনী শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলাম। কিন্তু তখনকার বাঙ্গালী-রমণীর মনে আমার আগ্রহের শতাংশও জাগে নাই। সে সেই বৃদ্ধের পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিল; এবং দাক্ষায়ণী ও পিতামহীর মর্য্যাদা দৃঢ়-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল বুঝিয়া, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিল।

ব্রাহ্মণ উপযাচক হইয়া তাহাদের কাছে যেটুকু পরিচয় দিয়াছিলেন, একান্ত অবান্তর হইবে না বলিয়া আমি তাহা আপনাদিগকে শুনাইব।

তাঁহার নাম লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই আদিকালে কলিকাতার সন্নিহিত কোনও গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি 'স্বভাব'কুলীন—সেই সেকালের কুলীন। সুতরাং তিনি মাতুল-গৃহেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, কেন না, তাঁহার পিতার বহুবিবাহ ছিল।

দাক্ষায়ণীর পিতৃপিতামহগণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতুলদিগের কুলগুরু। মাতুলদিগের অনুকরণে উপনয়ন-সংস্কারের:অব্যবহিত পরেই তিনি দাক্ষায়ণীর পিতামহের কাছে তান্ত্রিক দীক্ষা লইয়াছিলেন। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অবস্থার উন্নতি আরম্ভ হয়।

প্রথম উন্নতি বিবাহ। রাজাবাবুর পিতা রঘুনাথ চৌধুরী হিজলিতে কোম্পানীর তরফে নিমকির দেওয়ান ছিলেন। কোম্পানীর এই এক-চেটিয়া ব্যবসায়ে দেওয়ানী করিয়া সে সময় বহু লোকে সম্পত্তিশালী হইয়াছিলেন। রঘুনাথবাবুও তাঁহাদের মধ্যে একজন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রঘুনাথবাবুর গুরুকন্যাকে বিবাহ করেন, এবং সেই সূত্রে তাঁহার জমীদারী সরকারে চাকরী গ্রহণ:করেন। সেই সময় হইতেই এই দেশে তাঁহার বাস।

কার্য্যকুশলতায় রঘুনাথকে তিনি এমন সন্তুষ্ট করিলেন যে, ক্রমে রঘু-নাথ তাঁহারই হস্তে জমীদারী-পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়া নিজে একরূপ অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই 'দেওয়ান লোকনাথ' বলিয়া দেশমধ্যে তাঁহার প্রসিদ্ধি হইল।

রাজাবাবুর যখন বিশ বৎসর বয়স, তখন রঘুনাথের মৃত্যু হয়। রাজা-

বাবুর বিষয়বুদ্ধি বড় প্রখর ছিল না। সুতরাং দেওয়ানজীর উপর সম্পত্তির সমস্ত ভারই সমর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

অন্যূন ষাট বৎসর তিনি এই সরকারের দেওয়ানী করিয়াছেন। রাজাবাবুর জীবদ্দশায় তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও অবসর লইতে পারেন নাই। এই ষাট বৎসরে জমীদারীর আয় প্রায় দশগুণ বাড়িয়াছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, এই বিশ্বাসী অথচ প্রতিভাশালী দেওয়ানের উপর কথা কহিতে রাজাবাবুরও সাহস ছিল না। রাজাবাবু নামে প্রভু, দেওয়ানই প্রকৃতপক্ষে এ সংসারের কর্ত্তা ছিলেন।

জমীদারীর উন্নতিসাধন করিয়াই দেওয়ানজী নিশ্চিন্ত ছিলেন না। জমীদারীর উত্তরাধিকারীর অভাব দেখিয়া সেই অভাব-পূরণেও তিনি সচেষ্ট হইয়াছিলেন। দেওয়ানজীর আদেশেই রাজাবাবু বৃদ্ধবয়সে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন।

দেওয়ানজীর এ চরিত্রের সমর্থন করিতে গিয়া কেন আমি তোমাদের অপ্রীতিভাজন হইব? আমি সেই বৃদ্ধের কথাই তোমাদের শুনাইয়া দিব।

কথা দয়াময়ীর মুখেই শুনিয়াছি। আমি ভাগ্যহীন—নন্দীগ্রামে যাইয়া সে দেবদুর্লভ মূর্ত্তির দর্শন পাই নাই।

শুধু আমি কেন—বাঙ্গালীর কপাল হইতে এ সৌন্দর্য্য দেখার সুখ মুছিয়া গিয়াছে। এখন বাঙ্গালী চল্লিশ বৎসরে বৃদ্ধ হয়, এবং পঞ্চাশ অতিক্রম করিতে না করিতে বৈতরণীর পারে চলিয়া যায়। বাঙ্গালীর আয়ুষ্কাল গড়পড়তায় এখন কুড়ি বৎসরে দাঁড়াইয়াছে। আমরা এখন পিতৃপুরুষগণ হইতে সকল বিষয়েই অধিকতর উন্নত হইয়াছি। কিন্তু হায়, পিতৃপরম্পরা-প্রাপ্ত দীর্ঘ-জীবনরূপ পুণ্য আমাদের চলিয়া গিয়াছে।

দয়াদিদি বলিয়াছিল—"ব্রাহ্মণের পদার্পণের সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের আবাসে আনন্দ যেন এক অভিনব মূর্ত্তি ধরিয়া ফিরিয়া আসিল। তার পর দাক্ষায়ণীর সঙ্গে যখন তাঁহার সম্বন্ধের পরিচয় পাইলাম, তখন কি জানি কেন, আমার মনটা গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল। নন্দরাণীর সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া আমি ত ঠাকুরমাকে এ দেশে আনি নাই! ক্ষুদ্র বালিকার প্রতি অচলা ভক্তির উপর নির্ভর করিয়াই আমি যে ব্রাহ্মণকন্যাকে আনিয়াছি! ভগবান্ আমার মুখরক্ষা করিয়াছেন। অকূলে আজ তিনি আমাকে কূল দিয়াছেন। সে তীর-ভূমি যেমন-তেমন নয়; চোখ মিলিয়া দেখি, একটা সর্ব্বরত্ন-ভরা ছায়াকীর্ণ বাগান আমাদের প্রাপ্য হইয়াছে!

"সেবার পূর্ব্বে অতিথির পরিচয় লইতে নাই—এ শাস্ত্র-শাসন তখন প্রায় সকল হিন্দুগৃহস্থের জানা ছিল। অতিথি—বিশেষতঃ বৃদ্ধ অতিথি—আমরা নারায়ণজ্ঞানে সকলে মিলিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবা করিলাম।

"আহারান্তে ব্রাহ্মণ আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বলিতে হইবে না, সেই সঙ্গে তাঁহার বাহকগুলির কল্যাণে খুড়ার আধ মণ মাছের তরকারির সুব্যবহার হইল। যাইবার সময় তিনি বলিয়া গেলেন—'আমি সত্বরই ফিরিয়া আসিতেছি! আসিয়া আমার পরিচয় দিতেছি।'

"তাঁহাকে দেখিয়া আমরা সকলেই যেন নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তাঁহার পরিচয় দিবার আভাসের ভিতর কত আশ্বাস যেন নিহিত রহিয়াছে!

"এ ভাব শুধু আমার মনে উদয় হয় নাই; ঠাকুরমার মনে উদয় হইয়াছে, খুড়ামহাশয়ের মনে উদয় হইয়াছে—এমন কি, দাক্ষায়ণীর মনে উদয় হইয়াছে।

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই আমার মনে গর্ব্ব হইয়াছিল।

তাঁহার সেবাকার্য্যে অপর সকলের সহায়তা করিতে গিয়া আমি একটু অহঙ্কৃতার মত ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছিলাম। খুড়ামহাশয় তাহা কোন-রূপে জানিতে পারিল। খুড়া অনুচ্চস্বরে আমাকে কি করিতে আদেশ করিয়াছিল। আমি শুনিতে পাই নাই। খুড়া একটু মিষ্ট রহস্যে আমাকে বলিয়াছিল—'কি দয়া, এখন হইতেই গরীবের কথা কানে-তোলা বন্ধ করিয়া দিলি নাকি?"

"নন্দরাণীর উপর যে ক্রোধ হইয়াছিল, ব্রাহ্মণের কথার সঙ্গে সঙ্গে তা দূর হইয়াছে। এখন আমি বরং মনে মনে লজ্জিত হইয়াছি।

"সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পরেই—আমি ঘরের সকল স্থানে ধূনা দিয়া ঠাকুরমাকে প্রণাম করিতেছি, এমন সময় বাহির হইতে কথা উঠিল—'কই মা দয়াময়ি!'

"কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র আমার বুঝিতে বাকি রহিল না—কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না। ঠাকুরমা বলিলেন—'ছুটিয়া যা, দয়া! অতি যত্নে ব্রাহ্মণকে ধরিয়া লইয়া আয়। ব্রাহ্মণ যাতায়াত করিতেছেন, আর আমার বুক কাঁপিতেছে। অতি অভাগী আমি। শেষকালে কি ব্রাহ্মণের অপঘাত দেখিয়া মরিব! ছুটিয়া যা, অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে লইয়া আয়। আমি আসন পাতিয়া রাখিতেছি।'

বাহিরে পা দিতে-না-দিতে, ব্রাহ্মণকে দেখিতে-না-দেখিতে তিনি আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—'এই লও মা, পরিচয় আমি সঙ্গে আনিয়াছি।'

"দূর হইতে দেখিলাম, একটি স্ত্রীলোকের সাহায্যে ঠাকুর সিঁড়ি বাহিয়া বারান্দায় উঠিতেছেন। সে দিন কৃষ্ণা একাদশীর নিশা—দিনমানে

অল্পক্ষণ মাত্র দশমী ছিল। সুতরাং সন্ধ্যার সঙ্গে-সঙ্গেই অন্ধকারের সূচনা হইয়াছে। কে ঠাকুরের হাত ধরিয়াছিল, দূর হইতে ভাল বুঝিতে পারিতেছিলাম না।

"যথাসম্ভব দ্রুত তাঁহাদের নিকটস্থ হইলাম। তখন দেখিলাম, বুঝিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—'কি মা, ললিতা?'

"হাঁ মাসীমা, আমি।"

"তখন দেখি, ব্রাহ্মণের পশ্চাতে, বারান্দা ও পুষ্করিণীর মধ্যবর্ত্তী অপ্রশস্ত পথ অবলম্বনে—যতদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়—সারি দিয়া লোক দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের মধ্যে পুরুষও আছে, স্ত্রীও আছে; বালকও আছে, বৃদ্ধও আছে।

"আমি আর চাহিলাম না, চাহিতে সাহস করিলাম না। অতি উল্লাসের আতঙ্ক আমার বক্ষোদেশ অবরোধ করিল। আমি তাড়াতাড়ি সিঁড়িতে নামিয়া ঠাকুরকে উপরে উঠাইতে ললিতাকে সাহায্য করিলাম। সুতরাং কে আসিয়াছে না আসিয়াছে, আমার সে সময় খুঁটিয়া দেখা ঘটিয়া উঠিল না। মনে মনে বলিলাম—'তাই ত ঠাকুর, এ কি বিচিত্র পরিচয় তুমি কয়টা বিদেশিনী ভিখারিণীকে দিতে আসিয়াছ?'

"একদিকে ললিতা, অপরদিকে আমি—দুই জনে অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে বারান্দায় উঠাইলাম। অতি সন্তর্পণে একেবারে ঘরের ভিতরে ঠাকুরমার সম্মুখে লইয়া আসনে বসাইলাম। ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট হইলে ঠাকুরমা আবার তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ললিতা ঠাকুরমাকে প্রণাম করিল।

"এ দিকে মাঝের দালান লোকে ভরিয়া গেল। প্রথম যখন তাহাদের

দেখি, তখন সকলেই নিস্তব্ধ ছিল। এখন তাহাদের ভিতর হইতে দুই-চারিজন অনুচ্চস্বরে কথা আরম্ভ করিয়াছে।

"আমি ললিতাকে বসিতে অনুরোধ করিলাম। ব্রাহ্মণ নিষেধ করিলেন। বলিলেন—'এখনি বসিবে কি? যা ললিতা, আগে তোর মাকে ডাকিয়া আন্।'

"আমি তখন বুঝিলাম, রাজাবাবুর সংসারে এই ব্রাহ্মণের কোন না কোন কারণে একটা বিশেষ রকমের প্রতিষ্ঠা আছে। আর এই প্রতিষ্ঠাই আমাদের ন্যায় বিদেশীর সম্মুখে তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট পরিচয়। কিন্তু সে প্রতিষ্ঠা কিরূপ ও কিসের জন্য, তাহা সে সময় বুঝিতে পারি নাই। এইজন্য জানিয়াও না জানিবার মত—ললিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'তোমার মাও আসিয়াছেন?'

ললিতা বলিল—'শুধু মা? আমাদের বাড়ীতে যে যেখানে আছে, দেওয়ানজীর বাড়ীতেও যে যেখানে আছে,—প্রায় সবাই আসিয়াছে।'

"ললিতার এক কথাতেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পরিচয় আমার জানা হইয়া গেল। আমি কিন্তু ব্রাহ্মণকে নিজের কোনও পরিচয় দিই নাই। দিনের বেলায় যখন তিনি আমাদের ঘরে অতিথি হইয়াছিলেন—আমার বেশ মনে আছে—তখন ব্রাহ্মণের সম্মুখে কেহ আমার নাম ধরিয়া ডাকে নাই। অতি সম্ভ্রমের সহিত, এমন কি, একরূপ নীরবেই আমরা তাঁহার সেবা করিয়াছিলাম। অথচ গৃহপ্রবেশ-মুখে তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আমি চুপি চুপি ললিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'হাঁ ললিতা, তোরা কি ঠাকুরকে আমার সম্বন্ধে কোনও কথা বলিয়াছিস্?'

"ললিতা বলিল—'মা বলিয়াছে।'

'তোমার মা কোথায় ?'

'মাও আসিয়াছে, কিন্তু লজ্জায় তোমার কাছে আসিতে পারিতেছে না।'

"আমি নন্দরাণীকে আনিবার জন্য বাহিরে যাইতেছিলাম। দেওয়ানজী বাধা দিলেন। বলিলেন—'তুমি কি জন্য যাইবে দয়াময়ি ? যাহাদের কাজ, তাহারা করুক। তুমি আমার মাকে লইয়া আইস। মাকে দেখিতেছি না কেন ?'

"আমি জানিতাম, দাক্ষায়ণী কি করিতেছে। সে প্রতিদিন সন্ধ্যায় যা করে—নারায়ণের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছে। সে আপনি না উঠিলে এ যাবৎ আমি একদিনও তার ধ্যানে বাধা দিই নাই। আমি ঠাকুরমার মুখের পানে চাহিলাম।

"ঠাকুরমা বলিলেন—'আড়াল্ হইতে দেখিয়া আয়। এতক্ষণে বোধ হয়, তার ঠাকুরপূজা শেষ হইয়াছে।'

"ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি ঠাকুর ?'

"'সে একটি নারায়ণ আনিয়াছে। দু'বেলাই সে তার অর্চনা করে।'"

"'স্ত্রীলোকে শালগ্রামশিলা পূজা করে ?'—বিস্ময়ের সহিত দেওয়ানজী ঠাকুরমাকে প্রশ্ন করিলেন।

"তাঁহার উত্তর শুনিবার আর সময় হইল না। ঠাকুরমা উত্তর দিতে-না-দিতে নন্দরাণী আসিয়া পড়িল। দেখিলাম, সে অবগুণ্ঠনবতী। আমি তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম না। সে আসিয়াই ঠাকুরমার চরণপ্রান্তে মাথা দিয়া পড়িল। আমি দাক্ষায়ণীকে দেখিতে চলিলাম।

"ঠাকুরমার ঘরের পার্শ্বে একটি ছোট কুঠারীর মত ঘর ছিল। দাক্ষায়ণী সেইটিকেই তার ঠাকুর-ঘর করিয়া লইয়াছিল। আমি সেই প্রকোষ্ঠের

দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখি, সে পূজা সাঙ্গ করিয়া ঠাকুরটিকে আবার পুঁটুলির ভিতর পুরিতেছে। আমি তাহাকে ব্রাহ্মণের পুনরাগমন-সংবাদ শুনাইয়া বলিলাম—'সত্বর উঠিয়া আইস। তিনি তোমাকে খুঁজিতেছেন।'

"দাক্ষায়ণী উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় মাঝের দালানে যে সকল লোক সমবেত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একটা মৃদু কোলাহল উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গে দেওয়ানজীর ধমকে অমনি সকলেই নিস্তব্ধ।

"সে গুরুগম্ভীর স্বর শুনিয়া আমিও চমকিয়া উঠিলাম। তাঁহার এক ধমকেই তাঁহার পূর্ণ-পরিচয় পাইলাম। বুঝিলাম, তিনি দেওয়ান বটে।

"আমি দাক্ষায়ণীকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরমার ঘরে আবার প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই দেখি, ঠাকুরমা, নন্দরাণী, ললিতা—তিনজনেই মাঝের দালানে চলিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ একাকী মাথাটি হেঁট করিয়া আসনের উপর বসিয়া আছেন।

"দাক্ষায়ণী একবারেই তাঁহার সম্মুখে যাইয়া হাঁটু গাড়িয়া প্রণাম করিল। তিনি আমাদের গৃহপ্রবেশ দেখিতে পান নাই; প্রণামকালে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া বৃশ্চিকদষ্টের মত যেন শিহরিয়া উঠিলেন। দাক্ষায়ণীকে প্রতিপ্রণাম করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন—'কি করিলে মা! আমি যে তোমাদের দাস।'

"দাক্ষায়ণী উত্তর করিল—'কেন, ঠাকুরমা যে আপনাকে প্রণাম করেন।'

"তাঁর কাছে আমি নমস্য হইতে পারি। কিন্তু তোমার সঙ্গে ত আমার সে সম্পর্ক নয়। তুমি বেটী যে আমার ইষ্টের মূর্ত্তি। গুরুদেবের আশীর্ব্বাদী ফুল কি কেহ পায়ের কাছে পড়িতে দেয়?'

"দাক্ষায়ণী এ কথার উত্তর না দিয়া বলিল,—'বাবার মুখে আপনার কথা শুনিয়াছিলাম। এ নন্দীগ্রামের কথাও তিনি আমাকে শুনাইয়াছিলেন। আপনার নাম শুনিতেই বুঝিয়াছিলাম, সেই আপনি।'

"ঠাকুরপুত্রের মুখে যখন আমার কথা, নন্দীগ্রামের কথা শুনিয়াছিলে, তখন এখানে আসিয়া আমার তত্ত্ব লও নাই কেন?"

"দাক্ষায়ণী উত্তর করিল না। ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন—'বোধ হয় মনে করিয়াছিলে, বুড়া মরিয়াছে। গুরুপুত্রের সঙ্গে প্রায় পাঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে দেখা। তখন তিনি যুবা। আমি কিন্তু সে সময় সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ। তুমি আমার মৃত্যুই স্থির করিয়াছিলে—কেমন?'

"দাক্ষায়ণী বলিল,—'না।'

"আমি বাঁচিয়া আছি, তুমি জানিতে?'

"বাবার মুখে শুনিয়াছি।'

"তাও শুনিয়াছ?'

"দাক্ষায়ণী উত্তর করিল না। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'তা হইলে, তাঁর প্রতিশ্রুতির কথাও শুনিয়াছ?'

"শুনিয়াছি। বাবা বলিয়াছেন, আপনার দেহরক্ষার সময়ে তাঁহাকে দেখা দিতে হইবে।'

"তা'হলে তাঁর শ্রীচরণ-দর্শন আমার ভাগ্যে আছে?'

"দাক্ষায়ণী উত্তর করিল না। ব্রাহ্মণ উত্তর শুনিতে আর একবার জেদ করিলেন। দাক্ষায়ণী শুধু তাঁর মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

"বলিস আর না বলিস্—মা, তুই সত্যব্রতের কন্যা—তোর নিশ্চল চক্ষুতারকাই আমাকে উত্তর দিয়াছে। আমি ভাগ্যবান তোর সম্মুখে

মরিলেও ইষ্টদর্শন করিতে-করিতে আমায় মরা হইবে। এখন বুঝিলাম, কাশী গঙ্গায় ভাসিয়া নন্দীগ্রামে আসিয়া লাগিয়াছে।'

"ব্রাহ্মণ এইবার দাক্ষায়ণীর নন্দীগ্রামে আগমনের নানা আধ্যাত্মিক কারণ নির্ণয় করিতে আরম্ভ করিলেন। দাক্ষায়ণী বসিয়া-বসিয়া শুনিতে লাগিল। আমি সে সকল কথার মধ্যে কেবল এইটিই বুঝিলাম, দেওয়ানজীর মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী জানিয়াই যেন অন্তর্য্যামী গুরু সত্যরক্ষার্থ তাঁহার কন্যারূপিণী ইষ্টমূর্ত্তিকে নন্দীগ্রামে প্রেরণ করিয়াছেন।

"ইহার পরেই ব্রাহ্মণ দাক্ষায়ণীর ঠাকুরপূজার কথা তুলিলেন। বলিলেন,—'শুনিলাম, তুমি নাকি মা, শালগ্রাম-শিলায় নারায়ণের অর্চ্চনা কর?'

"দাক্ষায়ণী কোনও উত্তর না করিয়া, প্রথমে আমার মুখের পানে চাহিল। আমি বিস্ময়বিমুগ্ধের মত তাহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলাম। তাহার মধ্যে অনেক কথা আমার না শুনাই কর্ত্তব্য ছিল। দাক্ষায়ণীর দৃষ্টি যেই চোখে পড়িল, অমনি আমার চমক ভাঙিল।

"দেওয়ানজীও তাহার দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, 'বাহিরের কেহ এখন যাহাতে এখানে প্রবেশ করিতে না পারে, সেই-জন্য মা, বাহিরে গিয়া তোমাকে একটু প্রহরীর কার্য্য করিতে হইবে। যদি—রাণীও আসিতে চান, তাঁহাকেও নিষেধ করিবে।'

"তাঁহার আদেশের মর্ম্ম বুঝিতে আমার বাকি রহিল না। আমারও সেখানে থাকা কর্ত্তব্য নয়, বুঝিয়া তাঁহার আদেশমাত্র আমি সেস্থান ত্যাগ করিলাম।

"মাঝে দালানে পা দিয়াই যা দেখিলাম, তাহাতে আমার বিস্ময়ের

অবধি রহিল না। সেই প্রশস্ত দালান একেবারে রমণী-মণ্ডলীতে ভরিয়া গিয়াছে। বাহিরের বারান্দার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম। সেখানে দ্বার অবরোধ করিয়া পুরুষেরা দাঁড়াইয়া আছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে এত লোকসমাগম, অথচ ঘরের ভিতর হইতে তাহার বিন্দুবিসর্গও আমরা জানিতে পারি নাই। যে সামান্যমাত্র কথোপকথনের শব্দ আমি শুনিয়াছিলাম, দেওয়ানজীর এক হুঙ্কারেই তাহা নিস্তব্ধ হইয়াছে।

"দালানের ভিতরে ইতিমধ্যে একটা গালিচা পাতা হইয়াছে। সে স্থানের জন্য নিত্য যে আলোর বন্দোবস্ত ছিল, তাহা ছাড়া আরও দুই তিনটা আলো দালানের কোণে কোণে বসান হইয়াছে। বাহিরেও আলোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমরা ভিতর হইতে এ সব কিছুই জানিতে পারি নাই, নিঃশব্দে কখন এ কায হইয়া গিয়াছে।

"সকলেই একরূপ নিস্তব্ধ। মধ্যস্থলে ঠাকুরমা ও নন্দরাণী। তাঁহাদের ঘেরিয়া মহিলামণ্ডলী বসিয়াছে। তাঁহারা উভয়েও নিস্তব্ধ। এতক্ষণ এরূপ নীরবে স্ত্রীলোকদের বসিয়া থাকিতে আমি আর কখনও দেখি নাই।

"এই সকল দেখিয়া দেওয়ানজীর শাসন-শক্তিকে মনে-মনে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। নন্দরাণী অপর দিকে মুখ ফিরাইয়াই বসিয়াছিল। দেখিয়া বুঝিলাম, তাহারা সকলে দেওয়ানজীর পুনরাদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে।

"আমি আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া ঘরের দ্বার অবরোধ করিয়া বসিলাম। আমার উপস্থিতি একমাত্র ললিতা ছাড়া, ঘরের অন্য কেহ দেখিতে পাইল না। অথবা দেখিয়াও দেখিল না।

বেশিক্ষণ আমাকে বসিতে হইল না। দেওয়ানজীর পরিবারসম্বন্ধে এক-আধটা কথা ললিতার কাছে জানিবার জন্য চুপিচুপি যেই তাঁহাকে বলিতে যাইতেছি, অমনি পিছন দিক হইতে দেওয়ানজী দাক্ষায়ণীকে লইয়া দালানের ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

"প্রবেশ করিয়াই ব্রাহ্মণ বহির্দ্দিকে লক্ষ্য করিয়া কাহাকে ডাকিলেন, 'চন্দ্রনাথ!' বাহির হইতে সসম্ভ্রমের উত্তর উঠিল; এবং একজন প্রৌঢ় গৌরবর্ণ সুন্দর পুরুষ দ্বারসমীপে উপস্থিত হইলেন। গৃহমধ্যস্থ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একটা মৃদু চমক-চাঞ্চল্য যেন একদিক হইতে অপর দিকে মুহূর্ত্তের মধ্যে বহিয়া গেল।

"ব্রাহ্মণ বহিঃস্থ পুরুষটীকে বলিলেন,—"এই তোমার কুলের ইষ্টদেবী। পুত্র-পৌত্রাদি লইয়া ইঁহাকে দর্শন কর।'

এই বলিয়াই তিনি ললিতাকে একটা আলো লইয়া দাক্ষায়ণীর মুখের কাছে ধরিতে বলিলেন। ললিতা আদেশমত কার্য্য করিল। আলোক-প্রতিফলিত সে অপূর্ব্ব মুখ-সৌন্দর্য্য মহিলামণ্ডলীর দৃষ্টি অবলম্বনে যেন তাহাদের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিল। একটা সমবেত দীর্ঘশ্বাসে ঘরটা ভরিয়া গেল।

"ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া, যে যার নিজ স্থান হইতে, দাক্ষায়ণীকে প্রণাম করিতে বলিলেন।

"চারিদিক হইতে প্রণামের ধূম পড়িয়া গেল। বালক, বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা—এক ঠাকুরমা ছাড়া যে যেখানে ছিল, সকলেই দাক্ষায়ণীর সম্মুখে মস্তক ভূমি-সংলগ্ন করিল। আমিই বা বাকি থাকি কেন? আমিও সেই পার্ব্বতী-প্রতিষ্ঠার শুভক্ষণে উমারাণীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম।

"বাহিরে পুরুষেরাও নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া দাক্ষায়ণীকে প্রণাম করিল। সর্ব্বশেষে ব্রাহ্মণ সর্ব্বসমক্ষে দাক্ষায়ণীকে আর একবার প্রণাম করিলেন। ললিতাও আমার হাতে আলো দিয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গেই মস্তক ভূমিসংলগ্ন করিল।

"এইবারে পরিচয়ের পালা পড়িল। দেওয়ানজীর বৃদ্ধ পুত্র, প্রৌঢ়-পৌত্র, যুবা প্রপৌত্র ও প্রপৌত্র-বধূর ক্রোড়স্থ শিশু-প্রপৌত্র-পুত্র আজ সেখানে উপস্থিত হইয়াছে। এদিকে পুত্রবধূ, পৌত্রী, প্রপৌত্রী প্রভৃতি তাঁহাদের স্বামী—যে যার আয়তি, ও দীর্ঘায়ু লইয়া ব্রাহ্মণের পুণ্যের সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছে।

"অপর দিকে নন্দরাণীর সংসার—তাহার পুত্র কন্যা, জামাতা, তাহার সংসারে প্রতিপালিত আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে ছিল, দেওয়ানজী আজ সকলকে ধরিয়া আনিয়াছেন।

"সেই সকল একত্র করিয়া ঠাকুরমার উদ্দেশে ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—'মা এই সমস্ত তোমার। আজ সকলকে অঙ্গীকার করিয়া আমা-দিগকে তোমার সংসারের অঙ্গীভূত করিয়া লও।'

"ঠাকুরমা মূর্চ্ছিতপ্রায়া ও পতনোন্মুখী হইলেন। নন্দরাণী তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণের কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নাই। তিনি আপনার মনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—'নাই কেবল তোমার পুত্রবধূ। ব্রাহ্মণী একটিমাত্র পুত্র আমাকে দান করিয়া প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গে গিয়াছেন। পুত্রের বয়স তখন সবেমাত্র ছয় মাস। মা, আজ এই পূর্ণানন্দে কেবল তোমার পুত্রবধূর অভাব অনুভব করিয়া মলিন হইতেছি। তা' তোমার পুত্রবধূর ভাগ্য দুই দিকেই নাই। আমি কুলীন। বহুবিবাহ করিতে পারিতাম। কিন্তু

করি নাই। গুরুদেবকে পুত্রের কোষ্ঠী দেখাইয়াছিলাম। দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, এই এক পুত্রেই আমার বংশরক্ষা হইবে।'

"বংশরক্ষার জন্যই বিবাহ। গুরুবাক্য আমি বেদবাক্য মনে করিতাম। তাঁহার মুখে কোষ্ঠীর ফল শুনিয়া আর বিবাহ করি নাই। তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমি পাঁচ পুরুষ লইয়া জীবন উপভোগ করিতেছি। আমার নাতীর নাতী হইয়াছে। স্বর্গে বাতী জ্বলিয়াছে।'

"এই কথা বলিয়াই ব্রাহ্মণ নন্দরাণীকে সম্বোধন করিলেন—'রাণী, পুত্র-কন্যা-জামাতা লইয়া এইবারে একবার আমার সম্মুখে দাঁড়াও।'

"পিতামহী ইতিমধ্যে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন। তিনি নন্দরাণীকে বলিলেন,—'যাও মা, নারায়ণের আদেশ পালন কর।'

"স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অল্পবয়স্কারা ভিতরের বারান্দার দিকে চলিয়া গেল। সকলে থাকিলে সেখানে ব্রজমোহন ও হরেন্দ্রের দাঁড়াইবার পর্য্যন্ত স্থান থাকিত না। হরেন্দ্রের হাত ধরিয়া ব্রজমোহন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

"পুত্রকন্যা ও জামাতাকে সঙ্গে লইয়া নন্দরাণী সাষ্টাঙ্গে দেওয়ানজীর পাদমূলে প্রণতা হইল।

"তাঁহারা সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলে ব্রাহ্মণ আবার বলিতে লাগিলেন—'হাঁ মা! যে দিন তিন বৎসরের ললিতাকে কোলে করিয়া তোমার স্বামী, আর ছয়মাসের হরেন্দ্রকে কোলে লইয়া আমি তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলাম, সে দিন কি তোমার মনে আছে?'

"নন্দরাণী অবনত-মস্তকে মৃদুস্বরে বলিল,—'সে দিন ইহজন্মে ভুলিব না।'

"তোমার স্বামী কি বলিয়াছিলেন, স্মরণ আছে?'

"আপনার ঋণ শোধ হইবে না।'

"তোমাদের এ ঐশ্বর্য্য-লোভে চারিদিক হইতে 'পরমাত্মীয়' এই নন্দীগ্রামে জড় হইয়াছিল। আমি সে সকল শকুনি-গৃধিনীর লালসা পূর্ণ হইতে দিই নাই। আমি জীবিত থাকিতে এ পুণ্যের সংসারে ভূতপ্রেতের নৃত্য হইবে? মা, আমি তাহা কল্পনাতেও সহ্য করিতে পারি নাই। আমি নিজে ঘর-ঘর অনুসন্ধান করিয়া এ গৃহের লক্ষ্মী আনিয়াছি।'

"অশ্রুপূর্ণ নয়নে নন্দরাণী বলিল,—"আমি যে বাবা, আপনার কন্যা।'"

"হাঁ! আমার কন্যার স্থান পূরণ করিতেই তোমাকে আনিয়াছিলাম। তা সে অভাব আমার পূর্ণ হইয়াছে। তোমাকে পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমি দৌহিত্র-দৌহিত্রী পাইয়াছি। আমার নিজের দেশ হইতে ব্রজমোহনকে ধরিয়া আনিয়াছি। তোমাকে ও তোমার পুত্রকন্যা জামাতাকে লইয়া আমার পূর্ণ সংসার। এই অভাব মোচন করিতে আমাকে দেশবাসীর বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল। তবু আমি টলি নাই। কেন টলি নাই জান?'

"নন্দরাণী এ কথার কোনও উত্তর দিল না। আমরা সকলেই তাঁহার এই অদ্ভুত কাহিনী শুনিতে লাগিলাম।

"দেওয়ানজী বলিতে লাগিলেন—'এইবারে বলিবার সময় আসিয়াছে। ঠিক সেই সময়ে দ্রাবিড় হইতে বেদ-বেদান্ত সঙ্গে করিয়া আমার ব্যাসতুল্য গুরুপুত্র গৃহে ফিরিবার মুখে আমার বাড়ীতে পদধূলি দিয়াছিলেন। তৎ-পূর্ব্বে তাঁহাকে আমি দেখি নাই। সুন্দর দেবমূর্ত্তি যুবাপুরুষ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। দেখিবামাত্র আমার অন্তরের অন্তর হইতে ধ্বনি উঠিয়াছিল যে, আমার ইষ্ট নবকলেবর ধরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।'

"আমাকে পরিচয় দিবার প্রয়োজন না থাকিলেও তিনি শিষ্টাচারের বশবর্ত্তী হইয়া পরিচয় দিলেন। শেষে বলিলেন, 'পিতৃনির্দ্দেশে তিনি আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন।'

"তাঁহার সেবান্তে রাজাবাবুর বংশরক্ষার্থ আমি তাঁহার শরণাপন্ন হই। তিনি তোমার স্বামীর ঠিকুজি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র-যোগ আছে।'—এইবারে বুঝিতে পারিতেছ কি মা?"

"নন্দরাণী বলিল,—'তাঁহার আশীর্ব্বাদেই বংশরক্ষা হইয়াছে।'

"হাঁ আমি তাঁর চরণ দুটী জড়াইয়া ধরি। অনুনয়ে প্রীত নারায়ণ আমার কামনা-পূরণের আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন,—'লোকনাথ! তোমার এই অসামান্য প্রভুভক্তি হইতেই সুফল ফলিবে। রাজাবাবুর সন্তান হইবে। তুমি তাঁহার জন্য লক্ষণযুক্তা পাত্রীর অন্বেষণ করিতে পার।'

"এই আমার গূহ্য ইতিহাস।—মা! গুরু শুধু আশীর্ব্বাদ করেন নাই। আজ তোমার কাছে তোমার পুণ্যের সাক্ষী পাঠাইয়াছেন।'

"নন্দরাণী আবার একবার ব্রাহ্মণের পদতলে পতিত হইল।

"এইবারে ব্রাহ্মণ হরেন্দ্র-নারায়ণকে সম্বোধন করিলেন। সে কি গুরুগম্ভীর স্বর। সমস্ত ঘরটা তিন চারিবার কাঁপিয়াও যেন নিরস্ত হইল না। আমরা সকলেই বুঝি সেই সঙ্গে কাঁপিয়া উঠিলাম। 'হরেন্দ্র নারায়ণ!' বালক করজোড়ে বৃদ্ধের সম্মুখে দাঁড়াইল। বৃদ্ধ বলিলেন— 'রাজাবাবুর পুত্র বলিয়া পরিচয় দিবার তোমার সময় আসিয়াছে।'—'কি করিতে হইবে অনুমতি করুন।' 'আমার গুরু দরিদ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া এক 'বাবু' তাঁহার বড়ই অপমান করিয়াছে। তিনি হাকিম। যেখানে পাও, যে অবস্থায় পাও, তাহার পুত্রকে যদি তুলিয়া আনিতে পার—'

"হরেন্দ্রনারায়ণ ব্রাহ্মণের কথা শেষ হইতে দিল না, বলিল—'যথা আজ্ঞা। আনিতে চলিলাম।' বালক বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া, চক্ষের নিমেষে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

(৪৯)

আমার বক্তব্য, এইবারে শেষে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বারো বৎসরের আমি, এই আখ্যায়িকার নায়ক। দশ বৎসরের বালিকা নায়িকা। বৃদ্ধকালে, বাংলার এই নব সভ্যতার যুগের 'আমি' ইহার কথক। এ যুগের উপন্যাসের যাহা মজ্জা, সেই নায়ক-নায়িকার যৌবন-সম্পদ ইহাতে নাই। নাই ইহাতে যুবজনসুলভ বিভ্রান্ত প্রেমের ব্যাকুলতার তরঙ্গ। নির্ব্বাত-প্রদেশের নবখনিতা সরসীবক্ষে সুনিদ্রিত বারিপ্রান্তরবৎ ইহা শান্ত —নিস্তব্ধ। ইহার উপরে জলজ কুসুমলতার পত্রচিহ্ন পর্য্যন্ত বিদ্যমান নাই। সাধারণ দ্রষ্টার চোখে এ দৃশ্য ত প্রাণহীন! আজিও পর্য্যন্ত শারদ চন্দ্রমার—মধুর কৌমুদীর আবর্ত্ত লইয়া—ইহার বক্ষে লীলা করিবার অবসর হয় নাই। যে প্রেমের মাধুর্য্য আমি নিজেই উপলব্ধি করিতে পারি নাই, তাহা অপরকে শুনাইয়া কি প্রীতি দান করিব? তথাপি কেন বলিতেছি? বিবাহে যৌননির্ব্বাচন-সমর্থনের যুগে একটা বাল্যবিবাহের কথা লইয়া এতটা বাগাড়ম্বর কেন? সে অন্ধকারময় যুগ ত বহুদিন হইল চলিয়া গিয়াছে! সংস্কারকের উচ্চ চীৎকারেও যে কার্য্য সাধিত হয় নাই, বরকর্ত্তার কৃপায় তাহা ত অনেকদিন পূর্ব্বে নিষ্পন্ন হইয়াছে! পাশ্চাত্য শিক্ষার সমস্ত গৌরব এখন 'কিশোরী' কন্যার পিতৃদত্ত একটি থলিয়ার ভিতরে আবদ্ধ। অন্তর্নিবদ্ধ কুসুমরাশির সৌরভে এখন সমস্ত বঙ্গভূমি

আমোদিত। কৈফিয়ত দিবার কিছুই নাই। তবে সুখের কথা, অনাদি-কাল হইতে এইরূপ কতকগুলা 'কেন' যুগান্ত বহিয়া ভাসিয়া আসিতেছে। আজিও পর্য্যন্ত তাহাদের যোগ্য উত্তর মিলে নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজবাড়ীর তোরণমুখে যেই আমার শিবিকা প্রবেশ করিল, অমনি অগণ্য বাদ্যভাণ্ড গগনভেদী আরাবে আমাকে আহ্বান করিল। ইহার পরেই আমি বহু-ভৃত্য-কর্ম্মচারী-বেষ্টিত রাজপুত্রের অভ্যর্থনা পাইলাম। রাণীর কোলে উঠিলাম। তৎপরে বহু রমণীর হুলুধ্বনির আবরণে সধবা ব্রাহ্মণ-মহিলামণ্ডলীপরিবৃত হইয়া আমি পিতা-মহীর সমীপে নীত হইলাম।

যে বাড়ীতে আমরা প্রবেশ করিলাম, সেটা ব্রজমোহন বাবুর বাসের জন্য স্বল্প দিন হইল, প্রস্তুত হইয়াছে। এখনও তিনি এখানে পরিবার লইয়া প্রবেশ করেন নাই। দয়াদিদির অনুপস্থিতিতে পিতামহী ও দাক্ষায়ণীকে এই গৃহেই আনা হইয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত অন্যের অব্যবহৃত এই সুন্দর অট্টালিকাতেই আমার পুনর্ব্বিবাহের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুনর্ব্বিবাহ বলিতেছি কেন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি হুগলীর বকুলতলের সেই বিবাহ কথা আমার পিতামহীর কর্ণে বরাবরই কেমন একটা আষাঢ়ে গল্পের মত লাগিতেছিল। তিনি সমস্ত ঘটনা দয়াদিদির মুখে শুনিয়াও শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের উপর তাঁহার বলবতী শ্রদ্ধা থাকিলেও, আমার বিবাহটাকে প্রকৃত বিবাহ বলিয়া বুঝিতে তাঁহার মনে কেমন একটা সঙ্কোচ উপস্থিত হইত। শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহবিষয়ে স্ত্রী-আচার বলিয়া কতকগুলা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার আছে। আমার বিবাহে সেগুলার একটারও ত অনুষ্ঠান হয় নাই।

আলিপনা-দেওয়া পিঁড়ির উপর দাঁড় করাইয়া, বরণডালা সাজাইয়া, সধবাদিগের বরবধূকে বরণ করা হয় নাই। তার পর, এ বিবাহে না হইয়াছে বাসর জাগরণ, না হইয়াছে শুভলগ্নে ফুলশয্যায় বরবধূর মিলন। এ সকল মাঙ্গল্য কর্ম্মের যখন একটাও হয় নাই, তখন মহিলাদিগের চোখে এ বিবাহ সংস্কার যে পূর্ণাঙ্গ হয় নাই, তাহা সুনিশ্চিত। এই জন্য নন্দীগ্রামে আমার উপস্থিতির পূর্ব্বে পিতামহীর ইচ্ছায়, রাণী এই অনুষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে তাঁহার দ্বারপণ্ডিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কিন্তু সার্ব্বভৌম মহাশয়ের দানকার্য্য অশাস্ত্রীয় বলিতে সাহসী হন নাই। তবে স্ত্রী-আচারগুলি সম্পূর্ণ করিতে কাহারও মতদ্বৈধ ছিল না।

পিতামহীর সহিত সাক্ষাতের কথা বলিয়া আর সময় অতিবাহিত করিব না। সেই রাত্রিতেই দাক্ষায়ণীর সঙ্গে আমার মিলন ঘটিল। ইহাকে পুনর্ম্মিলন বলিতে পারিলাম না। কেন না, ইহার পূর্ব্বে যে দুইবার তাহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা কোনও ক্রমে মিলন-পদবাচ্য নহে। এই আমাদের প্রথম মিলন। বিবাহের উৎসবান্তে এই আমরা সর্ব্বপ্রথম উভয়ে উভয়ের পার্শ্বে বসিবার অধিকার পাইয়াছি। উভয়ে উভয়ের মুখ নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু কই, উভয়ের এই প্রকৃত প্রথম-দর্শনে আমাদের মধ্যে কেহই ত তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলাম না! দাক্ষায়ণী আমার মুখের পানে চাহিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। সে নীরব অশ্রুবর্ষণ আমি ভিন্ন আর কেহ কি দেখিতে পাইল না? তবে তাহারা আমাদিগকে পরস্পরের পার্শ্বগত দেখিয়া উল্লাসে এত শঙ্খধ্বনি করিল কেন? পিতামহীও কি দেখিতে পাইলেন না? তবে তিনি

আমাদিগের অবস্থার দিকে লক্ষ্য না করিয়া নন্দরাণীকে এত আশীর্ব্বাদ করিলেন কেন? বনভোজনের দিবসে যে ক্ষুদ্র বালিকাকে আমি সঞ্চরণশীল পুষ্পগুচ্ছের মত দেখিয়াছি, এ দাক্ষায়ণী ত সে দাক্ষায়ণী নয়! দাক্ষায়ণীর অশ্রুসিক্ত চক্ষু হইতে কেমন একটা দীপ্তি বাহির হইতেছিল। প্রতি অশ্রুবিন্দুতে খণ্ডিত হইয়া সে দীপ্তি যেন এক-একটি সূচীর আকারে আমার চক্ষুতারকা বিদ্ধ করিতে ছুটিয়া আসিল। হায়, তখন ত বুঝি নাই, ভূত-ভবিষ্যতের সঞ্চিত ও সঞ্চয়নীয় তীব্র অভিমান এক-একটি অশ্রুবিন্দুতে নিবদ্ধ হইয়া, আমাকে দেখিয়াই আত্মহত্যার জন্য যেন বালিকার গণ্ডে আছাড় খাইতেছে! সে মুখ কিছুক্ষণের জন্য দেখিলে বুঝি বালিকার মুখে হাসি আসিত। কিন্তু আমি শিহরিলাম। কি যেন একটা মর্ম্মজড়ানো ভয় আমার চক্ষু নিমীলিত করিয়া দিল।

আমাকে দেখিবার জন্য সেখানে বহু স্ত্রীলোক সমবেত হইয়াছিল। তাহারা সকলে আগ্রহের সহিত বর-বধূর মিলন নিরীক্ষণ করিতেছিল। পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপে স্বাভাবিকী লজ্জাবশে বধূই সর্ব্বাগ্রে নয়ন নিমীলিত করে। এ ক্ষেত্রে কার্য্য বিপরীত হইল দেখিয়া, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

(৫০)

ক্রমান্বয়ে তিন দিন ধরিয়া আমার এই অভিনব বিবাহের উৎসব চলিল। মূল্যবান্ পট্টবস্ত্রে ও রত্নালঙ্কারে আমাদিগের উভয়কে সাজাইয়া—রাসলীলায় বালক-বালিকার উপরে রামসীতার আরোপ করিয়া, ভক্তবৃন্দ যেরূপ অর্চ্চনা করে,—লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বাসে ইহারা আমাদের সেইরূপ অর্চ্চনা

করিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে দাক্ষায়ণীকে যেরূপটি দেখিয়াছিলাম, এখন সে তাহা হইতে অনেক বড় হইয়াছে। আমি কিন্তু সেইরূপই আছি। বরং হুগলীতে অবস্থানকালীন আমার অসুখের জন্য আমি এখন অপেক্ষাকৃত কৃশ হইয়াছি। দাক্ষায়ণী মাথায় আমার সমান দাঁড়াইয়াছে। উচ্চতার সম্বন্ধ লইয়া বাসরগৃহে মহিলামণ্ডলী অনেক কৌতুককথার অবতারণা করিয়াছিলেন। বর বড় না কনে বড়? তাঁহাদিগের বিচারে লক্ষ্মীই "নারায়ণ" অপেক্ষা উচ্চতার অধিকার লাভ করিয়াছিল।

শুধু আমাদের পূজা করিয়া রাণী ক্ষান্ত হন নাই। তিনি এ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও দরিদ্র-নারায়ণগণের পূজা-উপচারাদিরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমাকে যে উপায়ে আনা হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। কিন্তু তাহার জন্য কাহারও উৎসাহের হানি হয় নাই। পিতামহী নিজে কতকটা নিরুৎসাহ হইলেও, রাণীর উৎসাহে বাধা দেন নাই। তিনি পূর্ব্ব হইতেই স্রোতে একরূপ গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। দয়াদিদির উল্লাস বিষাদ কিছুই বুঝিতে পারি নাই। মায়ের কোল হইতে আমি বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছি; এই জন্য দিদি সর্ব্বক্ষণ আমাকে সুখী রাখিবার জন্য ব্যস্ত ছিল। কিসে আমার স্বাস্থ্য বজায় থাকে, এই জন্য মায়ের হৃদয় লইয়া দেবী সর্ব্বদা আমাকে হৃদয়ের ব্যাকুল স্নেহ দিয়া আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। রমণীগণের উৎসাহে, দিদির স্নেহে ও পিতামহীর অস্তিত্বে আমার মানসিক উদ্বেগ অনেকটা প্রশমিত হইলেও, ভয়টা একেবারে বিদূরিত হয় নাই। এত উল্লাসের মধ্যেও থাকিয়া থাকিয়া আমার গা'টা কেমন ছম্‌ছম্ করিত। দয়াদিদি তাহা কতকটা বুঝিয়াছিল। বুঝিয়া দুই-একবার নির্জ্জনে সে সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিল। আমি উত্তর দিতে পারি নাই।

ভয়—কিসের ভয়? এ কয়দিনের মধ্যে আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও দাক্ষায়ণীর সহিত একান্তে বসিতে পারি নাই। ফুলশয্যার পূর্ব্বে নবোঢ়া বধূর সহিত স্বামীর একান্তে অবস্থান আচারবিরুদ্ধ। এ কয়দিন আমি রাত্রিকালে দিদির কাছেই শয়ন করিয়াছি। দাক্ষায়ণীর সহিত এ পর্য্যন্ত আমার একটিও কথা হয় নাই। দিবসের অধিকাংশ সময় সে রমণী-মণ্ডলীর মধ্যে অবস্থান করে, আমি ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বালকগণ-পরিবৃত হইয়া রাজবাড়ীর নানাস্থানে বিচরণ করি। পিতামহী কিংবা দিদি অথবা অন্য কেহ আমার কাছে দাক্ষায়ণীসম্বন্ধে কোনও কথা উত্থাপন করে নাই। উত্থাপন করিবার কথাই বা কি ছিল? বালক বর, বালিকা ক'নে—পুতুলখেলার মত একটা কৌতুককর ঘটনা। সকলে আমোদ লইয়াই ব্যস্ত। আমাদের তখনকার পরস্পরাশ্রয় ভাববন্ধনের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার তাহাদের কাহারও অবসর ছিল না।

তবে বাড়ীর ভিতরে যাতায়াতের সময়ে মাঝে-মাঝে দাক্ষায়ণীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। প্রতিবারেই সাক্ষাতের সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে হইয়াছিল, নির্ণিমেষনেত্রে আমার মুখের পানে চাহিয়া, আমার সমস্ত রূপটা যেন নিঙাড়িয়া, ছাঁকিয়া, পিপাসিতা দাক্ষায়ণী চক্ষু দিয়া আমাকে পান করিতেছে। দেখিবামাত্র একটা মৃদু শিহরণ আমার হৃদয়ের সঙ্গে কি-যেন একটু ইঙ্গিত করিয়া চলিয়া যাইত। বালিকার সঙ্গে আমার পরবর্ত্তী-কালের জীবনের সম্বন্ধ কি সেই ইঙ্গিতের ভিতর দিয়া কাতরতা প্রকাশ করিতেছিল?

এই তিন দিবসে বিবাহের যেগুলা লৌকিক অনুষ্ঠান, তাহা একরূপ নিষ্পন্ন হইয়াছিল। বাকী ছিল, শুধু 'ফুলশয্যা'। চতুর্থ রাত্রিতে

তাহাও নিষ্পন্ন হইত, কেবল হরেন্দ্র নারায়ণের জন্য তাহা হইয়া উঠিল না।

এই কয়দিনে হরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে আমি সুপরিচিত হইয়াছি। নন্দী-গ্রামে অনেক প্রিয় সঙ্গের মধ্যে তাহারই সঙ্গ আমার সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয় হইয়াছে। এরূপ শিষ্ট ও প্রিয়দর্শন বালক আমি এ বয়স পর্য্যন্ত অতি অল্পই দেখিয়াছি। যখন তাহার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ, তখন তাহার বয়স উনিশ বৎসর। এই কৈশোর-যৌবনের সন্ধিমুখে কৈশোর এখনও তাহার অধিকার অল্পই পরিত্যাগ করিয়াছে। বর্ণ অনতি-উজ্জ্বল শ্যাম। দেখিতে অনেকটা ললিতারই মত। পুরুষের বেশ এবং গোঁফের ঈষৎ চিহ্ন বিদ্যমান না থাকিলে তাহাকে আমার ললিতা বলিয়াই ভ্রম হইত। কণ্ঠস্বর ললিতারই মত, মুখের স্মিত-বিকাশ ললিতারই মত, উচ্চহাস্য ললিতার হাসির সঙ্গে একসুরে বিধাতা যেন বাঁধিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই বালকই সিংহবিক্রমে আমার শক্তিমান্ হাকিম পিতার কাছ হইতে আমাকে তুলিয়া আনিয়াছে। সে রাত্রিতে সে কিন্তু আমাকে দেখা দেয় নাই।

তাহাকে দেখিয়া, তাহার কথা শুনিয়া, প্রথম আলাপেই তাহার প্রতি আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে আমার অপেক্ষা সাত বৎসরের বড় হইলেও আমরা উভয়েই একশ্রেণীর পড়া পড়িতাম। সুতরাং অতি সহ-জেই আমাদের উভয়ের মধ্যে সখ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সত্য কথা বলিতে কি, রাণী যদি দাক্ষায়ণীর সহিত আমার মিলনের জন্য আগ্রহ না দেখাইয়া, তাহার পুত্রের সহিত আমার ভালবাসার বন্ধন দৃঢ়তর করিতে সাহায্য করিত, তাহা হইলে আমি বোধ হয়, অধিক সুখী হইতাম।

পূর্ব্বের কোনও ব্যবহৃত পালঙ্কে আমাকে শুইতে দিবে না বলিয়া, হরেন্দ্র আমার ফুলশয্যার জন্য একটি হস্তিদন্তখচিত পালঙ্ক নির্ম্মাণের আদেশ দিয়াছিল। সহস্র চেষ্টাতেও কারুকরেরা চারি দিনের ভিতরে তাহা তৈয়ারী করিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রধানতঃ এই কারণ। এতদ্ভিন্ন আর একটা কারণ ফুলশয্যায় বরবধূ-মিলনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ব্রজমোহন ও গণেশ খুড়া পিতাকে আনিতে গিয়াছে, তাহারা আজিও ফিরে নাই। চতুর্থ দিবসের প্রারম্ভেই ব্রজমোহন বাবুর নিকট হইতে টেলিগ্রাম আসিল। তাহাতে জানা গেল, তিনি আমার পিতা ও মাতাকে সঙ্গে লইয়া দুই-একদিনের মধ্যেই নন্দীগ্রামে আসিতেছেন। পিতার ছুটী ফুরাইয়াছে, সুতরাং আবার কিছু দিনের জন্য তাঁহাকে ছুটি লইতে হইবে। সেইজন্য তাঁহাদের আসিতে দুই একদিনের বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। তাঁহাদের আগমন-অপেক্ষায় রাণী উৎসবের এই শেষাংশটুকু বাকি রাখিয়া দিলেন।

চতুর্থ দিবস আমি একরূপ হরেন্দ্রর সঙ্গেই অতিবাহিত করিলাম। সারা নন্দীগ্রাম ও তাহার উপকণ্ঠের নানাস্থান তাহার সঙ্গে পরিভ্রমণ করিলাম। পঞ্চম দিবসের প্রভাতে সংবাদ আসিল, পিতা ও মাতা 'জামাই' বাবুর সঙ্গে তমলুকে পৌঁছিয়াছেন। আহার ও কিয়ৎক্ষণের জন্য বিশ্রাম গ্রহণের পর সেইদিনেই তাঁহারা তমলুক পরিত্যাগ করিবেন। সেই দিনটি শুভকার্য্যের পক্ষে প্রশস্ত জানিয়া, আর সন্ধ্যার পূর্ব্বে যেমন করিয়াই হউক তাঁহারা গ্রামে পৌঁছিতে পারিবেন ইহা নিশ্চয় বুঝিয়া, সেই দিনেই নন্দরাণী 'ফুলশয্যা' উৎসবের আদেশ দিলেন। সমস্ত দিনটা

বেশ নিরুপদ্রবেই কাটিয়া গেল। কিন্তু সন্ধ্যা আসিতে-না-আসিতে ঝড়ের সঙ্গে প্রবলবেগে বৃষ্টি আসিল। মাস শ্রাবণ। কিন্তু বর্ষা এ বৎসর আসিতে কিছু বিলম্ব করিয়াছে। পূর্ব্ব হইতে জানিয়াই সে যেন আমার ফুলশয্যা দেখার অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। আজ উৎসবের দিনে সে দাক্ষায়ণীর সহিত আমার মিলন দেখিতে আসিল।

যতক্ষণ পারিলেন, রাণী তাঁহার জামাতা ও আমার পিতামাতার আগমনের অপেক্ষা করিলেন। আটটা, নয়টা, দশটা বাজিয়া গেল; ইঁহারা কেহই আসিলেন না; কোনও একটা লোক দিয়াও সংবাদ পাঠাইলেন না। অগত্যা তাঁহাদের আগমনের অপেক্ষা না করিয়া রাণী আমাদের শয্যা মিলনের ব্যবস্থা করিলেন।

যেমন বড় ঘর, তেমনি তাহা অপূর্ব্বরূপে সাজানো। নন্দীগ্রামে আসিয়া ইহার পূর্ব্বে যদি আমি রাজবাড়ীর নাচঘর ও হরেন্দ্রনারায়ণের শয়নঘর না দেখিতাম, তাহা হইলে বলিতাম, এমন ঘর ও তাহার ভিতরের এত বড় পালঙ্ক আমি আর কখনও দেখি নাই। আমি কেন, আমার পূর্ব্বে আমাদের চাল-কলা-বাঁধা বামুনের ঘরের কেহ কখনও এরূপ ঘর দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। ঘরের মেঝে মার্ব্বল-পাথর দিয়া বাঁধানো। দেওয়াল নানাবর্ণ চিত্রে শোভিত। ঘরের ভিতরে পাঁচটি ঝাড় ঝুলিতেছিল;—চারিটি চারি কোণে, একটি মধ্যে। মধ্যেরটি অপর চারিটি হইতে অনেক বড়। সকলগুলিতেই বাতির আলো দেওয়া হইয়াছিল। নানাবর্ণের লণ্ঠনের মধ্য দিয়া সেগুলি সমস্ত ঘরটিকে এক অপূর্ব্ব মিশ্রবর্ণের আলোকে পূর্ণ করিয়াছিল।

সেই সুন্দর সজ্জিত ঘর আজ আবার নানাবর্ণের ফুলে অপূর্ব্বরূপে

সজ্জিত হইয়াছে। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া যে দিকে চাই, সেই দিকেই দেখি ফুল—কেবল ফুল। ফুলের মালা, ফুলের গাছ, ফুলের লতা, ফুলের স্তবক, ফুলের আসন—ফুল ফুলকে মাথায় করিয়াছে, ফুল ফুলকে বাহুপাশে জড়াইয়াছে। পুষ্পরচিত নানাবিধ পশুপক্ষী আগ্রহের সহিত যেন আজ আমার এই পুষ্পনন্দনে প্রবেশের অপেক্ষা করিতেছিল। অসংখ্য মহিলাপরিবৃত হইয়া নানা রত্নালঙ্কারে ও পুষ্পহারে সজ্জিত আমি সেই গৃহমধ্যে নীত হইলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পালঙ্কও প্রকাণ্ড। রাণী আমাকে কোলে লইয়া তিনটি বনাতে মোড়া কাঠের সিঁড়ি বহিয়া সেই পালঙ্কের উপর বসাইয়া দিল। ইহার অল্পক্ষণ পরেই ঠিক আমারই মত করিয়া, বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইয়া, কতকগুলি বালিকা ও কিশোরী দাক্ষায়ণীকে সেই ঘরে লইয়া আসিল। দয়াদিদি তাহাকে কোলে তুলিয়া, রাণীরই মত সিঁড়িতে উঠিয়া আমার পার্শ্বে বসাইয়া দিল।

শয্যার উপর অতি সুন্দর মখমলের আস্তরণ। তাহার উপর মখমলের তাকিয়া ও বালিস। আতর-গোলাপে সেগুলা যেন ডুবানো হইয়াছে।

তাহার উপরে আমাদিগের দুই জনকে বসাইয়া নারীগণ হুলু ও শঙ্খধ্বনির সঙ্গে রাশি-রাশি পুষ্পনিক্ষেপে আমাদের যেন পুষ্পরাশিতে আবৃত করিয়া ফেলিল। সর্ব্বশেষে উভয়কে সচন্দন পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া রমণীগণ গৃহ পরিত্যাগ করিল।

পিতামহীও এ দৃশ্য দেখিবার লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। পিতামাতার আগমনের সংবাদ পাইয়া আজ তাঁহার এই আনন্দোৎসবে যোগ দিতে উৎসাহ হইয়াছে।

প্রকাণ্ড ঘরের ভিতরে আমরা দুইটি বালকবালিকা। বাহিরে ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি পড়িতেছে। শুধু তাই নয়, বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার শুভাগমনে উল্লসিত অগণ্য ভেকের কলরবে সেই প্রান্তরময় সমস্ত দেশটা মুখরিত হইয়াছে।

পাছে আমরা ভয় পাই, এইজন্য গৃহত্যাগের পূর্ব্বে ঠাকুরমা আমাদিগকে অভয়-বাক্যে আশ্বাসিত করিলেন। শেষে বলিলেন—"দয়াময়ী দালানের ঘরের দ্বারের পার্শ্বেই শুইয়া থাকিবে। যখন তোমাদের কোন কিছুর প্রয়োজনবোধ হইবে, তখনি তাহাকে ডাকিও। ডাকিলেই সে তোমাদের কাছে উপস্থিত হইবে।"

(৫১)

মনোভবের চোখে যাহারা পুত্তলিকার মত, ফুলবাণ যাহাদিগের কুসুমকোমল অঙ্গে সোৎসাহে পুলক তুলিতে আসিয়া রুদ্ধ অবসাদে প্রয়োগকর্ত্তার কাছে ফিরিয়া যায়, এমন দুইটি বালক-বালিকার প্রেমের কথা শুনিতে তোমাদের মধ্যে কেহ কি উৎকর্ণ হইয়া আছ? যিনি আছেন, তাঁহাকে আমি এই দূরদেশ হইতে প্রণাম করি। শুনিতে যাঁহাদের অভিরুচি নাই, তাঁহাদের নিকট হইতে সসম্ভ্রমে আমি বিদায় গ্রহণ করি। যে কামগন্ধহীন শয্যাবিলাসের কথা—জীবনের এই সীমান্তে অবস্থিত, আমারই পক্ষে স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে, তাহা তোমাদিগকে কি এমন বচনবিন্যাসে বুঝাইতে পারিব? কবি যে তুলিকায় কিশোরীস্বরূপ রজকিনীর কামগন্ধহীন রূপ অঙ্কিত করিয়াছেন, সংসারান্ধকারে পথভ্রান্ত ও অপহৃত-সর্ব্বস্ব হীন আমি সে তুলিকা কোথায় পাইব। কোথায় পাইব-

সেই তুলিকা, যাহার মুখে পিকতানরণবাস্ত-ঝঙ্কৃত রতিরণরঙ্গভূমি বৃন্দাবনশ্রী উথলিয়া উঠিয়াছে ? সেই জরজরচন্দন বিপুলপুলক ফুলবাণ; সেই হুঁহুমণি-কিঙ্কিণী, হুঁহু নূপুরধ্বনি, অঙ্গদবলয় নিশান; সেই হুঁহু ভুজপাশ বেড়ি হুঁহুজন-বন্ধন-দর্শনক্ষম চক্ষু যাঁহার নাই, তিনি মুদ্রিতনয়নে কিয়ৎক্ষণের জন্য অবসর গ্রহণ করুন। ইহা সেই বাঙ্গলার বাল্যবিবাহ-যুগের শিশু-দম্পতির প্রথমমিলন-চিত্রের একাংশ। সেকালে ইহাতে বিশেষত্ব কিছুই ছিল না। এখন ইহা শিক্ষিত-শিক্ষিতার হাস্যোদ্দীপক।

বহুক্ষণ উভয়ে নীরবে পাশাপাশি বসিয়া রহিলাম। অন্যদিন হইলে সে সময় আমি ঘোর নিদ্রায় অচেতন রহিতাম। সে দিনও ঘুম পাইলে শয়ন করিতাম। কিন্তু কিছুতেই আমার ঘুম আসিতেছিল না। বধূ আমার পার্শ্বে ছিল বলিয়া যে জাগিয়াছিলাম, সে কথা আমি বলিতে পারি না। কেন না, এ সময়ের মধ্যে দুই একবার তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়াছিলাম। কত রকমের কি যেন চিন্তা আসিয়া মাঝে-মাঝে আমার হৃদয় অধিকার করিতেছিল। রমণীগণ চলিয়া যাইবার পর বোধ হয়, একটিবারের জন্যও দাক্ষায়ণীর মুখের প্লানে চাহি নাই। চাহিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কেমন একটা বিষম লজ্জা আমার চক্ষু অবনত করিয়া রাখিয়াছিল। চোখ তুলিবার প্রাক্কালেই আমার মনে হইতেছিল, চোখ তুলিলেই দাক্ষায়ণী চক্ষুতারকা অবলম্বনে আমার ভিতরে প্রবেশ করিবে। আর সেখানে নিশ্চিন্ত বসিয়া আমার সমস্ত রূপটা পান করিয়া লইবে।

রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি ও বায়ুর বেগ বর্দ্ধিত হইতেছিল।—ঝম্-ঝম্-ঝম্। এখন এই বৃদ্ধকালে মনে হইতেছে, বুঝি সে সময় তরুশিরে বস্তশিখণ্ডী রোল তুলিয়াছিল। সেই কেকারবনিনাদিত কাননদেশে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী

ডাহুক ও কোকিল বুঝি তাহাদের স্বরলহরী কণ্ঠভাণ্ডারে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। বুঝি 'কেকা'র সঙ্গে মত্ত দাহুরিবোলমিশ্রিত কোকিলকুহর ও ডাহুকীর গর্জ্জনও আমি সে রাত্রিতে শুনিতে পাইয়াছিলাম। 'পালঙ্কে শয়ন-রঙ্গে বিগলিত-চীর-অঙ্গে' সুনিদ্রিতা ও সুনিদ্রিতের মধুময় স্বপ্ন দেখিবার এমন যোগ্য সময়ে আমরা দুইটিতে চুপ করিয়া পাশাপাশি বসিয়া ছিলাম। ঝম্-ঝম্-ঝম্—কোথায় উল্লাসে আমাদের অঙ্গ শিহরিবে, তাহা না হইয়া বোধ হয়, আজ গা ছম্‌ছম্ করিতেছে!

অনেকক্ষণ পরে দাক্ষায়ণী প্রথমে কথা কহিল। বলিল—"আর বসিয়া আছ কেন? রাত্রি অনেক হইয়াছে।"

নীরবতার এইরূপ অভাবনীয় ভঙ্গে আমি প্রথমটা শিহরিয়া উঠিলাম। আমি অন্যমনস্কে তাহার মুখের পানে চাহিলাম।

দাক্ষায়ণী আবার বলিল—"রাত্রি জাগিলে অসুখ করিতে পারে। তুমি শোও।"

আমি বলিলাম—"তুমি শোও না কেন?"

"তুমি না শুইলে আমি কেমন করিয়া শুইব?"

"কেন, এত বড় খাটের উপর এত জায়গা, আমি কি তোমাকে নিষেধ করিয়াছি?"

"নিষেধ করিয়াছ বই কি!"

"বাঃ! কখন নিষেধ করিলাম! আমি ত এর পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে একটিও কথা কহি নাই!"

"তাইতেই নিষেধ করিয়াছ। তুমি স্বামী, আমি স্ত্রী। তুমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে, তোমার আগে আমার কি বিশ্রাম লইতে আছে!

আছে কি না আছে, আর কে খোঁজ করে! বসিয়া-বসিয়া আমার গা ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছে। দাক্ষায়ণীর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে আমার ভয় ভাঙ্গিয়াছে। আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া শয়ন করিলাম। তথাপি দাক্ষায়ণী বসিয়া রহিল। আগে বরং একটু গা-ঘেঁসিয়া বসিয়াছিল, এখন আমার নিকট হইতে সরিয়া পদপ্রান্তে বসিল। আমি বলিলাম—"কই, শুইলে না!"

"তুমি ত কই আমাকে শু'তে বলিলে না!"—এই বলিয়া দাক্ষায়ণী মৃদুকরপল্লবে—থাক্, এ 'সম্মানে সম্মানের' যুগে রমণীর এ বিপর্য্যয় অসম্মান লইয়া আর বাড়াবাড়ি করিব না। আমি কিছুক্ষণ নীরব রহিলাম। কি মধুর করস্পর্শ! আমি চোখ বুজিয়া দাক্ষায়ণীর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথাটা ভাবিয়া দেখিলাম। স্বামী ও স্ত্রী! বার-দুইচার কথাটা মনে মনে তোলাপাড়া করিতে করিতে কি এক অননুভূতপূর্ব্ব মধুর ভাব আমার হৃদয়মধ্যে সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অতি মৃদু করস্পর্শ চরণতল হইতে অতি মৃদু তরঙ্গ তুলিয়া, ধীরে-ধীরে রোমাঞ্চের বেষ্টনীমধ্যে সেই প্রদীপ্ত ভাব আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। ক্ষণেকের মধ্যে আমার মনে হইল, দাক্ষায়ণীর মত আপনার জন জগতে বুঝি আমার আর নাই। মনে হইল, তার সঙ্গে যেন কতকালের পরিচয়। পরিচয় যেন কোন স্বপ্নের দেশে লুকাইয়া ছিল। হুগলীর সেই তরুতলে ব্রাহ্মণের মন্ত্রপূত হইয়া তাহা বাস্তব জগতে ভাসিয়া উঠিয়াছে। পাছে আবার সে পরিচয় হারাইয়া যায়, তাই দাক্ষায়ণী সাতপাকের বেড়ায় তাকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়াছে। মনে হইবার সঙ্গে-সঙ্গে, কিয়ৎক্ষণের জন্য পিতামাতার মমতা আমার চোখে ক্ষীণরূপা হইয়া গেল। যদি সেই সময় তাঁহারা আসিয়া আমাকে

একদিকে আকর্ষণ করিতেন, আর দাক্ষায়ণী অপরদিকে টানিত, আমি বোধ হয়, দাক্ষায়ণীর দিকে ঢলিয়া পড়িতাম।

এই বুঝি সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া! ক্ষণকালের জন্য ক্ষুদ্র বালিকার আয়ত্তে পড়িয়া ক্ষুদ্র বালকের মনের যদি এইরূপ অবস্থা হয়, তখন বহুদিনের একত্র সহবাসে মানুষ যখন সর্ব্বপ্রকারে পূর্ণাবয়বার আয়ত্তে পতিত হয়, তখন তার কি অবস্থা, ইহা সহজেই অনুমেয়। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আমি দাক্ষায়ণীকে শয়নের অনুরোধ করিলাম। দাক্ষায়ণী অনুরোধ রাখিল। আমার পার্শ্বে না আসিয়া সে আমার পায়ের কাছেই মাথা রাখিয়া শয়ন করিল।

আমি বলিলাম—"তুমি ওখানে শুইলে কেন, আমার পাশে এসো।"

দাক্ষায়ণী বলিল—"কেন, তোমার কি ভয় করিতেছে?" ঠিক এমনি সময়ে আমাদের রহস্যালাপ শুনিবার লোভে উনপঞ্চাশ বায়ু যেন একসঙ্গে বাতায়নপথ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল। তাহাদের উৎ-পীড়নে বাতায়ন-ছিদ্রগুলা সমস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। শুনিয়া বাস্তবিকই আমার ভয় হইল। কিন্তু সে ভয় আমি দাক্ষায়ণীকে বুঝিতে দিলাম না। আমি প্রত্যুত্তরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার কি ভয় হইতেছে না?" বলিয়াই আমি তাহার হাত ধরিবার জন্য উঠিয়া বসিলাম।

আমি উঠিতে দাক্ষায়ণীও উঠিল; আমার প্রসারিত হস্ত দেখিয়া আমার পার্শ্বে আসিল; আমার মুখের পানে কোমল দৃষ্টিতে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"আমি তোমার কাছে রহিয়াছি। আমার ভয় হইবে কেন?"

এই কয়বার তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, কিন্তু একটিবারের জন্যও তাহার হাসিমুখ দেখি নাই। বকুলতলে আধা-অন্ধকারে আধা-ঘুম-জড়ানো চোখে তাহার মুখই ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই। আমলকী-বৃক্ষতলে সংসারে একান্ত অনভিজ্ঞা শব্দার্থজ্ঞানলেশশূন্যা একটি শিশু-কুমারীর উদাসদৃষ্টি দেখিয়াছিলাম মাত্র। এ পাঁচ দিনের ভিতরে একদিন মাত্র তাহাকে কেবল কাঁদিতে দেখিয়াছি। আর কয়টা দিন ভয়ে ভয়ে,—ঠিক দেখিয়াছি কি না বলিতে পারি না। আজ প্রথম দেখিলাম। দেখিবামাত্র কেমন যেন এক আবেশকর মোহে আবৃত হইলাম। কি মিষ্ট মধু হইতেও সুমধুর হাসি! সে লাবণ্যপুরসদৃশ বদনের সেই অতুল স্মিত-মাধুর্য্যটুকু কুড়াইয়া লইবার জন্য আমার হস্ত আপনা-আপনি উঠিয়া অতি ধীরে তাহার চিবুক স্পর্শ করিল। স্পর্শের সঙ্গে-সঙ্গে বালিকার মুখ আবার ম্লান হইয়া গেল। দেখিতে-দেখিতে চক্ষু জলে ভরিল, এবং তাহাদের একটি হইতে একবিন্দু উষ্ণ অশ্রু আমার করতলে পতিত হইল। আমার হাত কি যেন এক চৌর্য্যবৃত্তি করিতে গিয়াছিল। উষ্ণ-অশ্রু-প্রহারে ভীত হইয়া সে আবার চোরেরই মত পলাইয়া আসিয়াছে!

দাক্ষায়ণী আমার সেই হাত ধরিল, করপল্লব দিয়া মৃদু পীড়িত করিল এবং বলিল—"তুমি কি মনে করিয়াছ, আমি তোমার উপর রাগ করিয়া কাঁদিলাম?"

"তুমি কাঁদিলে কেন?"

"একটা কথা আমার মনে পড়িয়া গেল।"

"সেদিনও আমাকে দেখিয়াই তুমি কাঁদিয়াছিলে।"

"সেদিনও এই কথাটা মনে পড়িয়াছিল।"

"সেটা কি কথা?" "শুনিবে?"

এই বলিয়া দাক্ষায়ণী যে দিকে দালান, সেই দিকের জানালার দিকে চাহিল। সেই দিকে চাহিয়া-চাহিয়াই বলিল—"থাক্, ইহার পরে বলিব।"

তাহার কথা শেষ হইতে-না-হইতেই জানালার খড়খড়ি সহসা সশব্দে নড়িয়া উঠিল!

দুষ্ট মেয়েগুলা যে আড়ি পাতিয়া খড়খড়ির ভিতর দিয়া আমাদের দেখিতেছিল, তাহা আমরা কেহই বুঝিতে পারি নাই। দাক্ষায়ণীর সহিত কথায় আমি তন্ময় হইয়াছিলাম—স্থান-কাল সমস্তই মুহূর্তের জন্য ভুলিয়াছিলাম। সেইজন্য শব্দটা আমার কানে বিষম বেগে আঘাত করিল। ভয়ে ব্যাকুল হইয়া আমি দুই বাহু দিয়া দাক্ষায়ণীকে আঁকাড়িয়া ধরিলাম। বালিকা আমার ভারে শয্যার উপর পড়িয়া গেল। আমিও সঙ্গে-সঙ্গে পড়িয়া গেলাম। শয্যায় নিক্ষিপ্ত ফুলরাশি আমাদিগের ভার সহিতে অক্ষম বলিয়াই যেন আপনা-আপনি শয্যার চারিপার্শ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িল।

আমাদের তদবস্থ দেখিয়া মেয়েগুলা খিলখিল করিয়া হাসিল। ঝিমি-ঝিমি বর্ষণ-শব্দ, সোঁ-সোঁ ঝটিকার শব্দ, সেই সঙ্গে মেয়েগুলার সমবেত হাস্যরব, সবগুলা একত্র মিশিয়া প্রেতিনীর বিকট সানুনাসিক স্বরে পরিণত হইল। অতি ভয়ে সবলে আমি আমার বক্ষ দাক্ষায়ণীর বক্ষে আবদ্ধ করিলাম। অমনি তাহার বক্ষসংলগ্ন শিলাবৎ কি একটা কঠিন পদার্থে আমার বক্ষ বিষম আহত হইল। বেদনায় মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া মৃদু আর্তনাদে আমি শয্যার উপর ঢলিয়া পড়িলাম। মর্মাহতার মত বালিকা শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। ঈষদুচ্চকণ্ঠে দয়াদিদিকে ডাকিল—"দিদি, বাহিরে আছ?"

তাহার কথা শুনিবামাত্র দয়াদিদি দ্বার মুক্ত করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দিদি মনে করিয়াছিল, আমরা বুঝি ভয় পাইয়াছি ; তাই আমাদের উভয়কে আশ্বাস দিয়া কহিল, "ভয় কি ! দুষ্ট মেয়েগুলা গোলমাল করিয়া তোমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত দিয়াছে। আমি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছি। তোমরা নির্ভয়ে ঘুমাও, আমি সারারাত্রি দ্বার আগুলিয়া বসিয়া রহিলাম।"

দাক্ষায়ণী বলিল—"ভয় নয়।"

দয়াদিদি সবিস্ময়ে বলিল—"তবে কি? কি জন্য ডাকিলে, বল। আমি এখনি তাহা করিতেছি।"

"তুমি ইঁহার শুশ্রূষা কর।"

"কেন, ভাইয়ের কি হইয়াছে?"

"আঘাত লাগিয়াছে।"

"সে কি ! এর মধ্যে আঘাত কেমন করিয়া লাগিল !"

এই বলিয়া দয়াদিদি সিঁড়ি বাহিয়া পালঙ্কের ধারে দাঁড়াইল ; এবং আমাকে শয্যা হইতে টানিয়া কোলে তুলিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়, কেমন করিয়া, কিসের আঘাত লাগিল?" তখনও বুকে বেদনা ছিল। তবে বেদনার অনেক উপশম হইয়াছে। কিন্তু কি যেন কিসের লজ্জা আসিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিল। আমি দিদির কথার উত্তর দিলাম না।

দাক্ষায়ণী আমার হইয়া উত্তর দিল। যেমন করিয়া আমি আঘাত পাইয়াছি, বালিকা সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক দয়াদিদির কাছে বর্ণনা করিল।

সমস্ত কথা শুনিয়া দিদি আমার বক্ষে আঘাতের স্থান নির্ণয় করিবার জন্য দুই-চারিটা প্রশ্ন করিল। আমি তাহাকে বলিলাম—"আঘাত লাগিয়াছে, এ কথা তোমাকে কে বলিল ?"

"আমিই বলিতেছি।" এই কথা বলিয়াই বালিকা তাহার বক্ষের বসন উন্মুক্ত করিল। তখন দেখিলাম, গলদেশ হইতে লম্বিত, মুক্তাহার-বেষ্টিত একটি কাপড়ের পুঁটুলি তাহার বক্ষে সংলগ্ন রহিয়াছে।

দাক্ষায়ণী পুঁটুলিটি কণ্ঠ হইতে উন্মুক্ত করিল। বিছানায় সেটিকে রাখিয়া অধোমুখে আমাদের সম্মুখেই সেটিকে খুলিতে বসিল।

দয়াদিদি বলিল—"বুঝিয়াছি। আর উহাকে খুলিয়া দেখাইতে হইবে না। রাত্রি অধিক হইয়াছে—শয়ন কর।"

দাক্ষায়ণী কথা শুনিল না। পুঁটুলির ভিতর হইতে ক্ষুদ্র সুগোল এক শিলাখণ্ড বাহির করিল। সেটিকে আমার চোখের কাছে ধরিয়া বলিল—"এটিকে চিনিতে পার ?"

আমি শিলাখণ্ড দেখিয়াই তাহা কি, এবং কেমন করিয়া তাহার হাতে গিয়াছে, বুঝিলাম। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও উত্তর না করিয়া বলিলাম,—"আমার কিছুই লাগে নাই।"

"খুব লাগিয়াছে। সত্য বলিতে ভয় পাইতেছ কেন? যদি না লাগিল, তবে কাঁদিয়া উঠিলে কেন ?"

আমি দিদির কোল হইতে মাথা তুলিয়া দাক্ষায়ণীর মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। তাহার সম্মুখে দ্বিতীয়বার মিথ্যা কহিতে আমার সাহস হইল না।

দাক্ষায়ণী শিলাখণ্ড আমার চোখের কাছে তুলিয়া ধরিল; এবং বলিল—"ভাল করিয়া দেখ না! চিনিতে পারিতেছ না ?"

আমি বলিলাম —"এ সেই নারায়ণ পাথর।"

"সেই পাথর। তোমারই হাত হইতে ইহাকে লইয়াছিলাম। বাবার আদেশে ইহাকে তোমার নামে পূজা করিয়াছিলাম। আজ এ তোমার বুকে ব্যথা দিয়াছে। এতদিনের সেবাতেও যখন ইহাকে আমি কোমল করিতে পারিলাম না, তখন তোমার সামগ্রী তুমিই ফিরাইয়া লও।"

"আমি ইহা লইয়া কি করিব ?"

"পূজা করিতে হয় পূজা করিবে, না হয় যেখান হইতে ইহাকে পাইয়াছিলাম, সেই আমাদের গ্রামের 'কাশ্যপ' গঙ্গায় ইহাকে বিসর্জ্জন দিবে।"

"আমি লইব না। তোমার বাবা তোমাকে দিয়াছিলেন। ফিরাইয়া দিতে হয়, তাঁহাকেই দিয়ো।"

আর কোনও কথা না কহিয়া বালিকা শিলাখণ্ডকে আবার পুঁটুলির ভিতর পূরিতে বসিল।

দয়াদিদি বলিল, "হাঁ ভাই, তা হইলে তোমারও ত বুকে লাগিয়াছে।"

দাক্ষায়ণী উত্তর করিল না—মাথাও তুলিল না। কিন্তু বোধ হইল, ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে।

পুঁটুলি বাঁধিয়া এবার সে আর তাকে গলায় তুলিল না। মাথার বালিসের একপ্রান্তে রাখিয়া দিল।

দয়াদিদি দাক্ষায়ণীর হাত ধরিয়া তাহাকে আমার পার্শ্বে শয়নের জন্য অনুরোধ করিল। বলিল—"পাগলিনি! রাত্রিশেষ হইতে চলিল। একটু ঘুমাও।

এই বলিয়াই দিদি পালঙ্কের উপর উঠিল, এবং দাক্ষায়ণীকে ধরিয়া আমার বাহু-উপাধানে তাহার মাথা রাখিয়া শোয়াইল। আমার অপর

হস্তটি দিদি তাহার গলদেশে বিন্যস্ত করিল, এবং তাহার বামহস্ত আমার গলদেশে জড়াইয়া দিল। তার পর পদপ্রান্তে বসিয়া আমাদের উভয়ের সেবায় প্রবৃত্ত হইল।

শয়নের সঙ্গে সঙ্গেই দাক্ষায়ণী চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিল। সেই নীলবর্ণ মেঘসদৃশ মখমলের বালিসে অর্দ্ধ-লুক্কায়িত-অর্দ্ধ প্রকাশিত মুখচন্দ্রমা দেখিতে দেখিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সেদিন ঘোর ঘুমে আমি আচ্ছন্ন হইয়াছিলাম। রাত্রির ভিতরে কত কি কাণ্ড ঘটিয়াছে, আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। যেমন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা প্রায় ছয়টা। রাত্রির সঙ্গেসঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। রৌদ্র উঠিয়াছিল। ঘরের একটা মুক্ত বাতায়নের পথ দিয়া রৌদ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার কতকগুলা রশ্মি মাঝের ঝাড়ের কলমের উপর পড়িয়াছিল। জাগিয়াই আমার মনে হইল, আমি দেশে আমার পিতামহীর ঘরে তাঁহার তক্তপোষের উপরেই শয়ন করিয়া আছি। কিন্তু ঘরটি যেন আজ কেমন কেমন দেখাইতেছে। শয্যার উপর ফুলগুলা তখনও গন্ধসম্ভার হৃদয়ে পূরিয়া আমার দৃষ্টির অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের উপরে ঘূর্ণ্যমাণ ঝাড়ের কলম হইতে বিশ্লিষ্ট সূর্য্যরশ্মি পতিত হইতেছিল। দেখিয়া আমার মনে হইল, ফুলগুলা যেন নানাবর্ণের পরিচ্ছদ পরিয়া আমার শয্যার উপর খেলিয়া বেড়াইতেছে। আমি উঠিয়া বসিলাম ও চারিধারে চাহিলাম। দেখি, ঘরের দেওয়ালেও বিচিত্র বর্ণরাজি লুকোচুরি খেলিতেছে। একবার কোথা হইতে যেন দেওয়ালের উপর ঝাঁপ খাইতে-ছিল, আবার দেখিতে দেখিতে কেমন করিয়া কোথায় যাইয়া মিলাইতে-ছিল। অর্দ্ধ-স্বপ্ন-সম বাল্যজীবন—তাহাকে দেখিয়া নৃত্যশীলা মুক্তকুন্তলা

লীলাময়ী অনঙ্গমঞ্জরী! আঁখি তখনও স্বর্গের ছবি দেখার অধিকার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয় নাই, সুতরাং সে সময়ের চিত্তের প্রতিকৃতি কল্পনার শত উপাদান দিয়াও আমি এখন অঙ্কিত করিতে অক্ষম। সেই মধুময় জীবনাংশের কোন মধুময় দিবসের কোন মধুময়ী চিত্রলেখা এখনও যদি তোমাদের কাহারও অপাঙ্গভ্রষ্ট না হইয়া থাকে, সেইটিকে মনে জাগাইয়া আমার তদানীন্তন মনের অবস্থার সঙ্গে মিলাইয়া লও?

বাস্তবিক, কিছুক্ষণের জন্য আমি জাগিয়া ঘুমাইতে লাগিলাম। সকলই বিচিত্র দেখিতেছি, অথচ ঠাকুরমার ঘরের ভ্রম আমার মন হইতে দূর হইতেছে না। আমি ভাবিতেছি, ঠাকুরমার ঘরটা আজ এমন ধারা করিতেছে কেন? ঠাকুরমা কি ঘর লইয়া কোন দূরদেশে চলিয়া যাই-তেছে? তখন পল্লীবাসী গৃহস্থের প্রত্যেকেরই ঘরে কড়ি-দিয়া-বাঁধানো দুই-একটা আস্‌বাব থাকিত। পিতামহীর ঘরেও সেইরূপ দুইএকটা ছিল। কড়ির আলনা, আলনার উভয় প্রান্তে দোদুল্যমান কড়ির ঝালর, কড়ির ঝাঁপি, নানাবর্ণের সুগ্রথিত কড়ির ধারি-বাঁধা ছবির আকারের 'শ্রী'— এইরূপ অনেক-প্রকারের বস্তু আমার পিতামহীর গৃহের শ্রীসম্পাদন করিত। বাঙ্গলার এই পয়সার যুগে সে কড়ির মাহাত্ম্য বুঝাইবার উপায় নাই। কড়ি কোথা হইতে আসে, আমি একবার পিতামহীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, উহারা বরুণ-রাজার বাগান হইতে আসে। আজ তাহারা নবজীবনে উজ্জীবিত হইয়া নানাবিধ বর্ণরঞ্জনে, নাচিতে নাচিতে ঠাকুরমার ঘরখানিকে লীলাগৃহে পরিণত করিয়াছে।

দেখিতে-দেখিতে সূর্য্যরশ্মি বাতায়নপথ পরিত্যাগ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বর্ণলীলা অদৃশ্য হইল। চমক ভাঙ্গার মত চারিদিক্ চাহিয়া আমি ডাকিলাম—"মা!"

ঘুম আমার আপনি ভাঙ্গে নাই; পিতামহীর ডাকে ভাঙ্গিয়াছে। তিনি পালঙ্ক হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, একরূপ দ্বারের নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন। আমার কথা শুনিবামাত্র তিনি উত্তর দিলেন। তার পর পালঙ্কের ধারে আসিয়া আমাকে কোলে লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন। বলিলেন—"বেলা অনেক হইয়াছে, উঠিয়া এস।"

আমি ত অনেকক্ষণ উঠিয়াছি। তবে তিনি আমাকে উঠাইতে আসিয়া, আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া, গৃহের এক পার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইয়া ছিলেন কেন? এ মরীচিকার সৌন্দর্য্য তাঁহাকেও কি মুগ্ধ করিয়াছিল?

পিতামহীর কোলে উঠিতে উঠিতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাঁ মা! আমাদের সে কড়ির ঝাঁপি?"

পিতামহী আমার মনের অবস্থা বোধ হয় বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ঈষৎ রহস্যের ভাবে উত্তর করিলেন—"তোমার দয়া দিদি তাহাকে লইয়া গিয়াছে।"

"কেন লইয়া গেল?"

"দেওয়ানজীকে দেখাইবার জন্য।"

"দেওয়ানজী কে মা?"

"যিনি তোমার হারানো ঝাঁপি কুড়াইয়া আনিয়াছেন। বস্ত্রালঙ্কারে সাজানো ঝাঁপি কেমন দেখায়, একবারমাত্র দেখিয়া তিনি আমাদের সামগ্রী আবার আমাদের ফিরাই দিবেন।"

আমি সে কথা বুঝিলাম না—বুঝিবার প্রয়াসও পাইলাম না। পিতামহীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাঁ মা! আমাদের ঘরটা এমন হইয়া গেল কেন?"

এইবার তিনি আমার অবস্থা বুঝিলেন। পূর্ব্বেও দুই একবার আমার এইরূপ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন—"আগে মুখে চোখে জল দাও, তার পর সব বলিতেছি।"

আমাকে কোলে তুলিয়া যেই পিতামহী বাহিরে আসিবার জন্য দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইয়াছেন, অমনি দাক্ষায়ণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

তাহাকে দেখিবামাত্র পিতামহী বলিয়া উঠিলেন—"এই যে ভাই তোমার কড়ির ঝাঁপি ফিরিয়া আসিতেছে।"

এতক্ষণ পরে আমার ঘুমের ঘোর কাটিল। পূর্ব্বরাত্রির সমস্ত ঘটনা এক মুহূর্ত্তে স্মৃতিপথে সমুদিত হইল।

কিন্তু এ কি রকম দাক্ষায়ণী! তাহার রাত্রির সেই বেশপরিপাট্য, দেহের সেই রত্নালঙ্কার, ঐশ্বর্য্য—কোথায় গেল? পরিধানে একখানি লালপেড়ে শাড়ী, হাতে দুগাছি শাঁখার বালা, কপালে রক্তধূসর টিপ, মাথায় ঝুঁটি—রাত্রি প্রভাত না হইতেই তাহাকে এমন করিয়া কে সাজাইল?

পিতামহী একটি কথা কহিয়াই চুপ করিয়াছিলেন। বালিকা অতর্কিত ভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এইজন্য তিনি তার বেশান্তর-গ্রহণ প্রথমটা লক্ষ্য করেন নাই। এখন বুঝিয়া বুঝি তিনি নীরব হইয়াছেন। কোন অনতিপ্রচ্ছন্ন বিপদ বুঝি তাঁহার চক্ষে পতিত হইয়াছে।

দাক্ষায়ণীকে পালঙ্কের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। বালিকা ধীরে-ধীরে নিকটে আসিল। পিতামহীকে, ও বোধ হয়, সেই সঙ্গে আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। প্রণামান্তে যেই বালিকা দাঁড়াইয়াছে, অমনি বাতায়নের কোন ছিদ্র দিয়া পুনঃপ্রবিষ্ট সূর্য্যরশ্মি

ঝাড়ের কলমে পতিত ও প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত বর্ণরাশি তাহার মুখের উপর নিক্ষেপ করিল। সেই সপ্তবর্ণরঞ্জিত সপ্তাশ্বের অন্তর্দ্দগ্ধা সাবিত্রীমুখকান্তি আজিও আমার মনে পড়ে! আর মনে পড়ে, আমার মুখে নিবদ্ধদৃষ্টি সেই দু'টি ডাগর চক্ষু হইতে সহসাবিনিঃসৃত গণ্ডে পতিত দুইটি অশ্রুবিন্দু।

দাক্ষায়ণী বলিল—"ঠাকুর-মা! বাবা ও মা আসিয়াছেন!"

পিতামহী মনে করিলেন, আমার পিতা ও মাতা আসিয়াছেন। আমরা সকলেই পূর্ব্বদিন হইতে তাঁহাদেরই আগমনের প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। হিন্দুকুলবধূ শ্বশুর-গৃহে আসিলে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকেও পিতৃ-মাতৃ-সম্বোধনে অভিহিত করিয়া থাকে।

তথাপি, কেন জানি না, পিতামহী দাক্ষায়ণীকে প্রশ্ন করিলেন—"বাবা ও মা? তোমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী কি আসিয়াছেন?"

দাক্ষায়ণীকে আর উত্তর করিতে হইল না। পিতামহীর প্রশ্নশেষে সার্ব্বভৌম ও তৎপত্নী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

(৫৩)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার নিদ্রার অবসরে সেই বাড়ীতে অনেক কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। আমাদিগের ফুলশয্যার উৎসব-উপলক্ষে রাণী গ্রামস্থ মহিলাগণের জন্য ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। দেওয়ানজীর পরিবারবর্গও সেই সঙ্গে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে ভোজে বসিয়াছেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, দেওয়ানজী সহসা দারুণ পীড়িত হইয়াছেন। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্রেই তাঁহারা সকলেই যথাসম্ভব সত্বর সে স্থান

হইতে প্রস্থান করিলেন, আহার শেষ করিতে তাঁহাদের কেহই অবসর পান নাই। ক্ষণপূর্ব্বের আনন্দপূর্ণ গৃহ সহসা বিষাদে আচ্ছন্ন হইল, বিশেষতঃ রাণীর মনোবেদনার সীমা রহিল না। তথাপি তিনি আমাদের দুইজনকে এ দুঃসংবাদের কথা জানিতে দেন নাই, উৎসবও রহিত করেন নাই। উৎসব-শেষে তিনি ললিতাকে সঙ্গে লইয়া দেওয়ানজীকে দেখিতে চলিয়া গেলেন। এক এক করিয়া প্রায় সমস্ত স্ত্রীলোক সে গৃহ পরিত্যাগ করিল।

রাত্রির শেষযামে দেওয়ানজীর পীড়া সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল। মৃত্যু আসন্ন জানিয়া তিনি গুরুপৌত্রী দাক্ষায়ণীকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহারই ইচ্ছামত দয়াদিদি ঘুমন্ত দাক্ষায়ণীকে আমার পার্শ্ব হইতে তুলিয়া দেওয়ানজীর সেই দুই ক্রোশ দূরের হলদীনদীতীরস্থ বাটীতে লইয়া গিয়াছে। ঘরে শুধু রহিলেন, মর্ম্মাহতা পিতামহী, আর ঘোর নিদ্রায় অভিভূত আমি। পিতামহীরও তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমি নিদ্রিত দেখিয়া, অথবা দেওয়ানজী আমাকে দেখিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন নাই বলিয়া, তিনি আমাকে আগুলিয়া বসিয়া রহিলেন।

ব্রাহ্মণদম্পতি যখন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখনও দেওয়ানজীর গৃহ হইতে কেহ ফিরে নাই। আমাদিগের পরিচর্য্যার জন্য রাণী যে দুই-একজন ঝিকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহারা সারারাত্রির পরিশ্রমের পর বাড়ীর কোনও একস্থানে মৃতের মত ঘুমাইতেছিল। সুতরাং প্রকৃত-পক্ষে সেই অট্টালিকার ভিতরে সেই সময়ে আমরা পাঁচজন ভিন্ন আর কেহ ছিল না। দাক্ষায়ণী কর্ত্তৃক অর্চ্চিত শিলাখণ্ডের যদি শ্রবণ-শক্তি থাকে, তাহা হইলে সেইটি ভিন্ন, আমাদের মধ্যে সেই সময় যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, আর কাহারও তাহা শুনিবার ভাগ্য হয় নাই।

ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই একবার চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন,—"তাই ত মা, এ কোন্ গন্ধর্বগৃহে আমার কন্যাকে লইয়া আসিয়াছ!"

পিতামহী এ কথার কোনও উত্তর না করিয়া আমাকে কোলে হইতে নামাইলেন, এবং তাঁহাদের উভয়কে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে আদেশ করিলেন। আমি তাঁহাদের প্রণাম করিলাম। তাঁহারাও আমার পিতামহীকে প্রণাম করিলেন।

পিতামহী বলিলেন—"তাই ত ঠাকুর, আপনাকে দেখিবার ত প্রত্যাশা করি নাই। কোথা হইতে কেমন করিয়া আপনারা এখানে আসিলেন? আর দাক্ষায়ণীর সঙ্গেই বা কেমন করিয়া আপনাদের সাক্ষাৎ হইল?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"ইহাদের দেওয়ানের মুখে সংবাদ পাইয়া আসিয়াছি। ভাগ্যে আসিয়াছিলাম, নহিলে লোকনাথের সঙ্গে আমার দেখা হইত না। তাঁর মৃত্যুকালে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম। মধ্যের কতকগুলা সাংসারিক দুর্ঘটনায় আমি তাঁহাকে ভুলিয়াছিলাম। নারায়ণের কৃপায় আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা হইয়াছে।"

পিতামহী। দেওয়ানজী কি তবে জীবিত নাই?

ব্রাহ্মণ। না, তিনি শেষরাত্রে দেহরক্ষা করিয়াছেন।

কথা শুনিবামাত্র পিতামহীর চক্ষে জল আসিল। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন—"তিনি জীবনে যথেষ্ট ভোগ করিয়া, তাঁহার গুরুর পুত্র, পুত্রবধূ ও পৌত্রীকে দেখিতে-দেখিতে সজ্ঞানে ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন। আপনি তাঁহার জন্য শোক করিবেন না। আমি তাঁহার পরিবারবর্গকে শোক করিতে নিষেধ করিয়াছি।"

পিতামহী তাঁহাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিতে দাক্ষায়ণীকে আদেশ করিলেন। বলিলেন—"নাত্-বৌ! দেওয়ানজীকে দেখিবার জন্য এ বাড়ী একরূপ জনশূন্য হইয়াছে। তুমিই ভাই এখন এ ঘরের গৃহিণী। আসন ও পা-ধুইবার জল দিয়া তুমিই তোমার পিতামাতার শুশ্রূষা কর। আমার দেওয়া জল ত তোমার বাবা লইবেন না।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"না মা, জল দিবার প্রয়োজন নাই; আমরা বসিব না।"

পিতামহী ঈষৎ ব্যাকুলতার সহিত বলিয়া উঠিলেন—"বসিবেন না! তা কি হইতে পারে!"

হিন্দু কন্যাদানের পর জামাতৃগৃহে অন্ন গ্রহণ করেন না। কেহ একেবারেই করেন না, কেহ দৌহিত্র হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত করেন না। এখন শিক্ষিতের মধ্যে এ প্রথার অনেকটা বিলোপ হইয়াছে। কিন্তু সে কালের প্রত্যেক হিন্দু ধর্ম্মজ্ঞানে এ প্রথার পালন করিত। পিতামহী অবশ্যই জানিতেন। সেই জন্য তিনি বলিতে লাগিলেন—"অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণের জন্যও আপনাদের বসিতে হইবে। বহুদিন আপনাদের ছাড়িয়া আসিয়াছি। একত্র বসিয়া আপনাদের সঙ্গে গোটাদুই কথা কহিয়া জীবন চরিতার্থ করি।"

এই কথা বলিয়াই পিতামহী দাক্ষায়ণীকে আসন আনিতে পুনরাদেশ করিলেন। বালিকা নড়িল না। সে কেমন এক রহস্যময় দৃষ্টিতে তাহার পিতার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। ব্রাহ্মণ যেন কি কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন। ব্রাহ্মণী তাহা দেখিলেন। তিনি পিতামহীকে বলিলেন—"মা! আমরা দাক্ষায়ণীকে লইতে আসিয়াছি।"

থার ভাবে পিতামহী তাঁহাদের আগমনের অর্থ কতকটা
পারিলেন। ব্রাহ্মণ-দম্পতির দর্শনজনিত তাঁহার প্রফুল্লতা
চ বিনষ্ট হইয়া গেল। তিনি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
য়া যাইবেন?" এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিতে
াপনাদের বস্তু আপনাদের ফিরাইয়া দিতে অনেক দিন
সঙ্কল্প জাগিয়াছিল। ধন্য আপনারা—আপনাদের হৃদয়বল
আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আপনাদিগের
য। দাক্ষায়ণীর অতুলনীয় ভক্তিভাবপূর্ণ সেবায় আমি
ালিয়াছিলাম; পথে আমি সংসার কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম।
। আগমনে আমার কুলও ধন্য হইয়াছে। তথাপি ঠাকুর,
ঙ্গে আনিয়া পথে একটি দিনের জন্যও সুস্থ হইতে পারি
় পাঠাইবার সুযোগ হয় নাই বলিয়া পাঠাই নাই। এতদিন
য়াছে। আমি আপনিই পাঠাইতাম। আপনাদের এখানে
না।"
ারে বলিলেন—"আপনার সেবার জন্যই কন্যাকে নিযুক্ত
আপনি যতদিন জীবিত রহিতেন, ততদিন ইহাকে
মাদের প্রয়োজন থাকিত না। আপনার সেবায় দাক্ষায়ণীর
াত হইত, তাহা হইলে আমাদের সুখের অবধি থাকিত না।"
ত আসিয়াছেন কেন? আমি ত এখনও মরি নাই।"
াপনি যে পৌত্রবধূর সেবায় পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না?"
মন্নীর মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া হরিহরকে আনাইয়াছে।
ৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছে।"

"আপনার মত না থাকিলে তাঁহার আনাইতে সাহস হইত না।"

পিতামহী নিরুত্তর; মাথা হেঁট করিয়া তিনি কি যেন এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন—"মা! যে দিন স্ত্রী, কন্যা, গণেশ ও আপনাকে সঙ্গে লইয়া হুগলীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম, সে দিনের কথা স্মরণ করুন। চোরের মত যে সময় আমি আপনার এই পৌত্রকে আনাইয়া ইহাকে কন্যা সম্প্রদান করি, তখন উহাদের মধ্যে কায়-সম্বন্ধের আশা রাখি নাই। স্বধর্ম্মচ্যুত শ্বশুরের ঘর দাক্ষায়ণী করিবে, এ আশাকেও আমি পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। আপদ্ধর্ম্মবশে শাস্ত্রের অনুজ্ঞা অবস্থার অনুযায়ী যথাসাধ্য পালন করিয়া আমি কন্যাদান করিয়াছিলাম। বিধাতার ইচ্ছায়, এক নারায়ণ ও একটি সাধ্বী তন্তুবায়-কন্যা ভিন্ন আর কেহ সে বিবাহের সাক্ষী রহিল না। আপনারা সেখানে উপস্থিত থাকিয়াও সে বিবাহোৎসব দেখিতে পাইলেন না। সমাজের অলক্ষ্যে এ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং এ কন্যাকে সমাজমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আমি সমাজের উপর অত্যাচার করিব না।"

ব্রাহ্মণী বলিলেন—"আপনার সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া আমরা স্বামী ও স্ত্রীতে সুখী হইয়াছিলাম। আমাদের দুর্ভাগ্য, সে সুখও আমাদের রহিল না।"

এতক্ষণ পরে পিতামহী বলিলেন—"আমিও গৃহে ফিরিব না। এখান হইতে কাশী যাইবার মনন করিয়াছি। তবে দাক্ষায়ণীকে আমার কাছে রাখুন না কেন? যে ক'টা দিন্ বাঁচিব, একমাত্র উহাকেই আমি সঙ্গে রাখিব। মৃত্যুকালে উহারই কোলে মাথা রাখিয়া মরিব।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"মা! মমতাবশে আপনার সঙ্কল্পচ্যুতি ঘটিয়াছে।

ভাব ভাঙ্গিয়াছে। আর ত কন্যাকে আপনার কাছে রাখিতে সাহস করি না।"

"এখনি লইয়া যাইবেন ?"

"বিলম্বে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা।"

"আমার পুত্র, পুত্রবধূ আসিতেছে। হতভাগ্যেরা একবারের জন্যও কি এ মুখ দেখিতে পাইবে না ?"—এই বলিয়াই পিতামহী দাক্ষায়ণীর চিবুক ধারণ করিলেন। আমি দেখিলাম, তাঁহার হাত কাঁপিতেছে। কঠোর ব্রাহ্মণ কিন্তু অটলভাবে উত্তর করিলেন,—"দেখার সম্ভবনা ত দেখিতেছি না। আমরা স্বামী ও স্ত্রীতে তীর্থভ্রমণ-সঙ্কল্পে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছি। অবশ্য ফিরিব না, এরূপ সঙ্কল্প করি নাই। তবে দেশে ফিরিতে আর বড় অভিরুচি নাই।"

"এই ক্ষুদ্র বালিকাকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ঘুরিবেন ?"

"কি করিব মা—ইহাকে কার কাছে রাখিয়া যাইব ? দেশের অবস্থার দিন দিন যেরূপ প্রবলবেগে পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, তাহাতে বালিকাকে এখানে রাখিতে আমার সাহস হয় না। বরং অন্যদেশে ব্রহ্মচারিণীর মর্য্যাদা থাকিবে।"

এই বলিয়াই ব্রাহ্মণ দাক্ষায়ণীকে বলিলেন—"দাক্ষায়ণি ! শালগ্রামশিলা কোথায় রাখিয়াছ, লইয়া আইস।" পিতার আদেশমাত্রেই সে সিঁড়ি বাহিয়া পালঙ্কের উপর উঠিল এবং শয্যার উপর হামাগুড়ি দিয়া মাথার বালিসের নিম্নে যেখানে পুঁটুলিটি রাখিয়াছিল, সেখান হইতে সেটিকে লইয়া পিতার হস্তে অর্পণ করিল।

শান্ত পিতামহী এবারে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইলেন। ক্ষুব্ধ কেন, ক্রুদ্ধ

হইলেন। বলিলেন—"দেখুন ঠাকুর, আপনি পরম পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। আমি জ্ঞানহীনা স্ত্রীলোক। তথাপি আমার মনে হয়, আপনি যেরূপ সত্যরক্ষার জেদ দেখাইতেছেন, এতটা জেদ এ কলিকালের মানুষের শোভা পায় না।" ব্রাহ্মণ নিরুত্তর রহিলেন। পিতামহী বলিতে লাগিলেন—"অবশ্য, আমার হতভাগ্য পুত্রের কাজ, মানুষ যে, সে কখন ভাল বলিবে না। কিন্তু আপনাকেও লোকে নিন্দা করিবে। আমি ইঁহাকে কুলবধূ বলিয়া গ্রহণ করিলাম; আমার আত্মীয়, স্বজন, জ্ঞাতি সকলেই গ্রহণ করিল; পুত্রও পুত্রবধূ বালিকাকে ঘরে আবাহন করিবার জন্য আসিতেছে, এমন সময়ে আপনি কন্যাকে লইয়া সকলের মর্ম্মে আঘাত করিতেছেন। ব্রাহ্মণ! আপনার এ কাজকে কেহ ভাল বলিবে না।"

সস্মিত-মুখে ব্রাহ্মণ বলিলেন—"তা জানি। নিন্দা করিবে কেন, এখনি দেশের লোক নিন্দা করিতেছে। অন্যের কথা কেন, জ্ঞাতিবর্গে করিতেছে। বিশেষতঃ দস্যুতা অবলম্বনে হরিহরকে আনিবার পর হইতে—" ব্রাহ্মণ কথা শেষ করিতে না করিতে পিতামহী বলিয়া উঠিলেন—"অঘোরনাথ কি সেজন্য আপনাকে কিছু বলিয়াছে?"

"যদি কিছু বলে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম-রহস্যে একান্ত অনভিজ্ঞ বালকের কথায় আমি কান দিব কেন? আপনাদের সকলের নিদারুণ মর্ম্মপীড়ার কারণ হইব জানিয়াও আমি আমার কন্যাকে, এই অপূর্ব্ব উৎসব-মুখে লইতে আসিয়াছি। আমার এই পত্নী কোনও রকমে দেহে জীবন ধরিয়া আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তথাপি কন্যাকে লইয়া যাইব। মা! এ বয়স পর্য্যন্ত আমি সত্যভ্রষ্ট হই নাই। আপনার পুত্রের মনোগত ভাব যখন বুঝিতে পারিলাম, যখন বুঝিলাম, আমার কন্যাকে

পুত্রবধূ করা এই বালকের মাতা-পিতার অভিপ্রায় নয়, তখন সত্যরক্ষার জন্য নারায়ণের কাছে প্রার্থনা করিলাম। বলিলাম, ঠাকুর! রামসেবকের পৌত্রকে এই বালিকা-দানের অধিকার প্রদান কর। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, দানান্তে কন্যাকে চিরব্রহ্মচারিণী-ব্রতে দীক্ষিতা করিব।"

পিতামহী। তাহা আমি জানিতাম না।

ব্রাহ্মণ। বালিকার ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষার সাহায্য করিতে এখনও যদি আপনার সাহস থাকে, বলুন মা, আমি এ কন্যা আবার আপনার হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া যাই।

এ কথার উত্তর পিতামহী সহজে দিতে পারিলেন না। তিনি একবার আমার পানে চাহিলেন। আমার মুখ দেখিয়া কি যেন বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার চোখের দিকে একবার চাহিলাম; তার পর দাক্ষায়ণীর মুখের পানে চাহিলাম। সেও আমার মুখের পানে স্থিরনেত্রে চাহিল। আমি কিন্তু তাহার চোখে চোখ রাখিতে পারিলাম না; মুখ ফিরাইলাম। সর্ব্বশেষে ব্রাহ্মণের মুখের পানে চাহিলাম। তাঁহার দৃষ্টি চোখে পড়িবামাত্র আমার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল।

কে তাহাতে কি বুঝিল, জানি না। পিতামহী এইবারে বলিলেন— "ব্রাহ্মণ! আপনার কন্যাকে লইয়া যান।"

"আপনার এ পৌত্রে ব্রাহ্মণযোগ্য বহু সুলক্ষণ বিদ্যমান ছিল। কন্যার মুখে রাত্রির ঘটনা শুনিয়া, আর এখন দেখিয়া বুঝিলাম, তাহার হানি ঘটিয়াছে। অভয়, সত্ত্ব, সংশুদ্ধি ব্রাহ্মণের চিরন্তন সম্পত্তি। পিতা-মাতার কর্ম্মদোষে বালক সে সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। তুমি কারে বলে,

ব্রাহ্মণ-বালক পূর্ব্বে জানিত না। সেই ভয় ভারে-ভারে এই বালককে অবলম্বন করিয়াছে।"

এই কথা বলিয়াই ব্রাহ্মণ দাক্ষায়ণীর হাত ধরিলেন; এবং তাহাকে বিষম ব্যাকুলভাবে পিতামহীর পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করিলেন। দাক্ষায়ণী পিতামহীর পায়ে মাথা লুটাইল, পদধূলি গ্রহণ করিল। তাহার পর [illegible] পায়ে মাথা রাখিয়া—বারংবার, বারংবার বারংবার—পা দুটা মস্তক দ্বারা আঘাত করিল। তার পর তাহার মায়ের হাত হইতে একটি পুঁটুলিভরা রাণীর দেওয়া সমস্ত অলঙ্কার আমার পায়ের কাছে রাখিয়া, আমাদের কাহাকেও কোনও কথা কহিবার অবকাশ না দিয়া, কেহ না-আসিতে-আসিতে, চোখের পলক ফেলিতে-না-ফেলিতে, মায়ের হাত ধরিয়া ছায়ামূর্ত্তির মত দাক্ষায়ণী সেই 'গন্ধর্ব্ব-গৃহ' মধ্যেই যেন মিলাইয়া গেল।

৫৪

আমি সেই বয়সে স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ যতটুকু বুঝিবার, বুঝিয়া দাক্ষায়ণীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে-সঙ্গে পিতামহীকে ব্যাকুলভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছি। পিতামহী দুই হস্ত আমার মস্তকে স্থাপিত করিয়া, নিরাশ, নিস্পন্দ, প্রাণহীন মর্ম্মরমূর্ত্তির মত দ্বারের দিকে শুষ্ক চক্ষু দু'টি স্থাপিত করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এমন সময়ে বাহিরে নারীকণ্ঠ হইতে করুণ ক্রন্দন-শব্দ উত্থিত হইল।

শুনিবামাত্র পিতামহীর চোখের পলক পড়িল। তিনি মস্তক অবনত করিলেন। কল্যাণাশ্রয় দু'টি করপল্লব আমার মাথা হইতে যেন ঝরিয়া পড়িল। আমি উর্দ্ধনেত্রে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়াছিলাম। আমার চোখে চোখ পড়িতেই তিনি বলিলেন—"আমাকে জড়াইয়া, আর মুখের

পানে চাহিয়া লাভ কি হরিহর? তাহার পরিবর্ত্তে এই সমস্ত অলঙ্কার উঠাইয়া লও। দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিছু দিতে পারিবে না জানিয়া তোমার পিতামাতা তাহার কন্যাকে গ্রহণ করে নাই। অর্থই তোমাদের সর্ব্বস্ব বুঝিয়া সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যা তোমাকে এই মূল্যবান অলঙ্কার উপহার দিয়াছে; দিয়া, তাহার মূল্যহীন প্রাণ আজ পথের ধূলায় মিশাইতে চলিয়াছে। তোমার আবার বউ হইবে, ভাবনা কি! তোমার মা আসিলে এই অলঙ্কার তাহার হাতে ধরিয়া দিয়ো। যখন তার মনোমত পুত্রবধূ ঘরে আসিবে, তখন সে এই অলঙ্কারে তাহাকে সাজাইয়া দিবে।"

বলিতে বলিতে পিতামহী অলঙ্কারের পুঁটুলিটি তুলিয়া আমার হাতে দিলেন। পুঁটুলি আমার হাত হইতে পড়িয়া গেল। তথাপি তিনি নিরস্ত হইলেন না। সেটাকে আবার তুলিয়া তিনি আমার পরিধেয় বস্ত্রপ্রান্তে বাঁধিয়া দিলেন। ইহার মধ্যে বাহির আবার নিস্তব্ধ হইয়াছে। পিতামহী বন্ধনকার্য্য শেষ করিয়া, উদ্দেশে দয়াদিদিকে সম্বোধন করিলেন—"দয়া আছিস্?"

দয়াদিদি আপনা-আপনিই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। চৌকাঠে পা দিয়াই দিদি বলিল—"আমি ত আছি এবং থাকিব। তুমিও আছ?"

"আমিই বা থাকিব না কেন?"

"না ঠাকুরমা, সে দিন তোমাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া তোমার মুখে জল দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম, আজ তোমার মরণ দেখিতে ব্যাকুল হইয়া আসিতেছি। ঠাকুরমা! পুত্র ও পুত্রবধূ আসিতে না আসিতে যদি মরিতে পার, তা হ'লে বুঝিব, এখনও তুমি ভাগ্যবতী।"

পিতামহী দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন—"মরণকে ডাকিয়া আত্মহত্যা

করিব কেন? ইচ্ছা করি আর নাই করি, সে ত একদিন আপনিই আসিবে।"

মৃত্যু আপনিই আসিল—সেই দিনেই পিতামহীকে লইতে আসিল, আঘাতের পর আঘাতে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার দুর্ব্বল দেহ জীর্ণ হইয়াছিল। আজ দুর্য্যোধনের ন্যায় হর্ষ-বিষাদে তাঁহার হৃদয় চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সেই দিন বিকালে পিতা ও মাতা আসিলেন। তাঁহারা সময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। পারেন নাই কেন? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর, ভাগ্য—আমার ভাগ্য, পিতামহীর ভাগ্য, তাঁহাদেরও ভাগ্য। আমাদের পূর্ব্বজীবন ও পরজীবনের সন্ধিক্ষণে এই যে একটা অন্ধকার-প্রলিপ্ত কাল-স্তর শৈলপ্রাচীরের মত ব্যবধান রহিয়া গেল, যুগবাহী ঝঞ্চাও তাহাকে ভাঙ্গিতে সমর্থ হইবে না। পিতার তমলুকে উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া মহকুমার হাকিম সপরিবারে ব্রজবাবুর বাসায় আসিয়া তাঁহাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পিতা সে অনুরোধ এড়াইতে পারেন নাই। উপরোধে পড়িয়া নন্দীগ্রামে পৌছিতে তাঁহার বিলম্ব হইয়া গেল। পৌছিয়া অবস্থা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তিনি একা পিতামহীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মা আসিতে সাহস করিলেন না। রাণী কর্ত্তৃক সম্যক্ অভ্যর্থিত হইয়া তিনি রাজবাড়ীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মাতা ও পুত্র উভয়েরই দুর্ভাগ্য, এতকাল কেহ কাহারও কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। পিতামহীর সহিত যখন পিতার প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তখন আমি পিতামহীর কাছে বসিয়া। পিতা ও মাতাকে দেখিবার আকুল আগ্রহ সত্ত্বেও পিতামহী আমাকে ঘর ছাড়িয়া

তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেন নাই—ধরিয়া তাঁহার কাছেই আমাকে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন।

দয়াদিদি প্রত্যুদ্গমন করিয়া পিতাকে পিতামহীর সমীপে উপস্থিত করিল; এবং তাঁহাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

পিতা আসিলেন, পিতামহীকে প্রণাম করিলেন। তার পর ঈষৎ হাস্যের সহিত তাঁহাকে বলিলেন—"সেকালের বামুনগুলো, শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ না বুঝিয়া শুধু শব্দার্থ লইয়াই পাগল। বহুদিনের বৃথা কঠোরতায় সার্ব্বভৌমের মস্তিষ্কবিকার ঘটিয়াছে বুঝিয়াই আমি তাঁহার অসংযত উপরোধ রক্ষা করিতে চাহি নাই। তাহার কন্যার সহিত হরিহরের বিবাহ দিব না, এ অভিপ্রায় আমার আদৌ ছিল না। পাগলের ভাব বুঝিতে না পারিয়া মা নিজেও অপদস্থ হইলে, আমাকেও দেশে-বিদেশে যার তার কাছে অপদস্থ করিলে।"

পিতামহী বলিলেন—"শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ তুমিই বুঝি একায়ত্ত করিয়াছ? তুমি কি আমাকে তিরস্কার করিতে আসিয়াছ, অঘোরনাথ?"

পিতা উত্তর করিলেন না। তাঁহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। পিতামহী বলিতে লাগিলেন—ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাসে তাঁহার স্বর স্পন্দিত হইতে লাগিল—"ভিখারী-ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহে কিছু দিতে পারিবে না জানিয়া স্ত্রীর পরামর্শে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি সত্যকে পদদলিত করিয়াছিস্। তোর কর্ত্তব্যজ্ঞানকেও ধিক্, তোর শাস্ত্রের মর্ম্মার্থবোধকেও ধিক্। বাল্যবিবাহে আপত্তিই যদি তোর অছিলা ছিল, সে কথা বলিলে বালিকার মা জগদ্ধাত্রীর মত তার কন্যাকে বারো বৎসর তার নিজের কাছে ধরিয়া রাখিত। আমাকে বলিলে আমি ধরিয়া রাখিতাম।

বায়োবৃৎসর পরে তোদের মত হাকিম-হাকিমনীর পরিবর্তে আমার ঘরে লক্ষীনারায়ণের প্রতিষ্ঠা হইত। যাক্—তোদের সমস্ত আপদ্ মিটিয়া গিয়াছে—এই তোদের পুত্র নে। আর—" এই বলিয়া পিতামহী দাক্ষায়ণীদত্ত গহনার পুঁটুলিটি বাহির করিলেন। সেটিকে রুদ্ধবাক্, নিস্পন্দ পিতার সম্মুখে রাখিয়া বলিতে লাগিলেন—"এই নে। অর্থই তোদের একমাত্র সার-সম্পত্তি জানিয়া আমার কুললক্ষ্মী তোর পুত্রকে এই রত্ন-অলঙ্কার উপঢৌকন দিয়া গিয়াছে। নে হতভাগ্য, তুলিয়া নে। তোদের বুধদিকের মধ্যে এখনও এমন ধনবান্ কেহ হয় নাই, যে এত মূল্যবান্ যৌতুক দিয়া তোর পুত্রকে কন্যাদান করিতে পারে। আর—আর—এরূপ পুত্রবধূ—" বলিতে বলিতে বার দুইতিন দাক্ষায়ণীর নাম করিয়া পিতামহী মূর্চ্ছিতা হইলেন।

অনুতাপবিদগ্ধ পিতা তাঁহার পদপ্রান্তে মাথা দিয়া পড়িলেন। গলদশ্রুলোচনে বলিতে লাগিলেন—"মা! উঠ—নরাধমকে তিরস্কারের এখনও শেষ হয় নাই। আমার মৃত্যু-আশীর্ব্বাদ কর।"

পিতামহীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল না। আমিও পিতার সঙ্গে তাঁহার পা দু'টি জড়াইয়া 'মা—মা' বলিয়া চীৎকার করিলাম, দয়াদিদি 'ঠাকুরমা' বলিয়া করুণকণ্ঠে তাঁহাকে কত সম্বোধন করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। পিতামহী উত্তর দিলেন না।

রাত্রি প্রভাত না হইতেই পিতামহী দেহত্যাগ করিলেন। বহু সেবিকার উপস্থিতি সত্ত্বেও মা সারারাত্রি পিতামহীর শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। চিকিৎসকে তাঁহার সংজ্ঞা ফিরাইবার বহু চেষ্টা করিয়াছিল। সমস্তই বৃথা হইল।